রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

নবম ভাগ　　　　প্রথম সংখ্যা

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, পত্রিকা[illegible]।

—•—

রঙ্গপুর।

(রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়
কাব্যতীর্থ-কবিরঞ্জন সহকারীসম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত)

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ সম্পূর্ণ দায়ী)

সূচী

কলিকাতা

৯, কাঁটাপুকুর বাইলেন বাগবাজার,
বিশ্বকোষ প্রেস
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্রদ্বারা মুদ্রিত।
১৩২১ বঙ্গাব্দ।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।]　　　　[ডাকমাশুল ।৵০ আনা।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণ বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে
এই পত্রিকা পাইবেন।

☞ কোনও সদস্যের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে অগৌণে জানাইবেন।

রঙ্গপুর-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী।

১। চণ্ডিকাবিজয়। (মহাকাব্য)

রঙ্গপুরের কবি দ্বিজ কমললোচন কৃত শক্তিবিষয়ক আদিগ্রন্থ।

ডিমাই ৮ পেজী আকারের প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ এই সুবৃহৎ উপাদেয় সটীক গ্রন্থের অর্দ্ধমূল্য—কাগজের মলাট ৷৹ আনা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই করা ৸৹ আনা। যাঁহাদের আবশ্যক হইবে পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হইয়া থাকে।

২। আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্ট।

কোচবিহারাধিপতির ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয়ের সঙ্কলিত "আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্ট" নামক একখানি অভিনব স্মৃতিগ্রন্থ তৎপৌত্র শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন বক্সী মহাশয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন এম, এ মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই সভা হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। সভ্যেতর ব্যক্তিগণের পক্ষে মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

৩। গৌড়ের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। (হিন্দুরাজত্ব)

মালদহের সুযোগ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্কলিত, এই ইতিহাসগ্রন্থ সভার গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য কাগজের মলাট ৸৹ এবং সুন্দর বাঁধাই করা ১৲ টাকা।

৪। রঙ্গপুরের ইতিহাস, প্রথম ভাগ (যন্ত্রস্থ)

রঙ্গপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্যে এই গ্রন্থ সভা হইতে সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত ও সভ্যগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। ১৯১০-১১খৃঃ অব্দে এই গ্রন্থের মুদ্রণব্যয় মধ্যে প্রাগুক্ত বোর্ড ৫০০ পাঁচশত টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এই গ্রন্থে রঙ্গপুরের যাবতীয় পুরাতত্ত্ব ও কৃষিবাণিজ্যাদির বিবরণ চিত্রাদি সহ প্রকাশিত হইবে।

৫। বগুড়া—সেরপুরের ইতিহাস।

বঙ্গের সুলেখক শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ৷৹ আট আনা মাত্র।

৬। সঙ্গীতপুষ্পাঞ্জলি।

বগুড়ার ভক্তকবি সাধকাগ্রগণ্য স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের অপ্রকাশিত সাধনসঙ্গীতগুলি সংগৃহীত হইয়া তাঁহার দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভক্তকবি ও তাঁহার সঙ্গীতের পরিচয় বঙ্গবাসীমাত্রেরই অবিদিত নাই। আশা করি, কবিবরের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ ও তাঁহার পরিবারবর্গের সাহায্যকল্পে প্রত্যেকেই নগদমূল্য ৷৹ আনা মাত্র দিয়া এই গ্রন্থ-খানি ক্রয় করিবেন।

৭। বগুড়ার ইতিহাস। (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল মহাশয়ের রচিত, এই গ্রন্থে সমগ্র বগুড়ার যাবতীয় বিবরণ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বিস্তৃতভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। মূল্য ৸৹ ও ১৷৹, এই সভার সভ্যগণের পক্ষে ।৵৹ ও ॥৵৹ আনা মাত্র।

৮। পালিপ্রকাশ—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী প্রণীত।

মূল্য ২৸৹, বাঁধান ৩৲ টাকা; প্রবেশক, পালি পাঠাবলী ও শব্দকোষ সহ, পালিশিক্ষার উপযোগী উৎকৃষ্ট ও সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রায় সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

৯। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ (আদিকাণ্ড)

উত্তরবঙ্গের এই সুবৃহৎ রামায়ণ দিঘাপতিয়ার সুযোগ্য সাহিত্যসেবী রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম, এ মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে ও গৌড়ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদকতায় বিশ্বকোষযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। কেবল আদিকাণ্ডই রয়েল আটপেজী আকারে ৩৫ ফর্ম্মায় সমাপ্ত হইয়াছে। সভ্যগণ বিনামূল্যে পাইবেন। সভ্যেতর ব্যক্তির পক্ষে আদিকাণ্ডের মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

অষ্টম ভাগ

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত

রঙ্গপুর

১৩২০ বঙ্গাব্দ

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

৯, কাঁটাপুকুর বাইলেন, বাগ্‌বাজার,

বিশ্বকোষ প্রেসে

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্রদ্বারা মুদ্রিত।

অষ্টম ভাগ পত্রিকার পৃষ্ঠা

সুচী

পরিশিষ্ট

১১। গীতাবিন্দু—বালক শিল্পীর চিত্রিত, সমূল পদ্যানুবাদ; মূল্য ১৲ টাকা, নমুনা ৶১০। রবীন্দ্র—"আপনার অনুবাদে যথেষ্ট গুণপণা।" ভারতী—"মূলের সৌন্দর্য্য ও তেজ উভয়ই সংরক্ষিত। গুরুদাস-লাইব্রেরী।

১২। নদীয়া-মাধুরীতে শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলা সরলভাষায় লিখিত। "এই গ্রন্থের বর্ণে বর্ণে অমিয় নিঝরে"। (শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা)। মূল্য ৸৶০ আনা। শ্রীকামদাচরণ ব্যানার্জ্জি। শ্রীগৌরাঙ্গ-সমিতি, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া—ত্রিপুরা।

১২। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ—(সচিত্র) উৎকৃষ্ট কাগজে লাল কালিতে জয়দেবকৃত মূল; পূজারি গোস্বামীর টীকা, পাঠান্তর ও কাল কালিতে সুমধুর পদ্যানুবাদ; বিস্তৃত ব্যাখ্যা; ১১২ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকায় জীবনী ও সমালোচনা সম্বলিত। শ্রেষ্ঠ সমালোচকগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্করণ বলিয়া প্রশংসিত। মূল্য ১।০ টাকা। সিল্কের বাঁধাই ২৲ টাকা। গুরুদাস-লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

১৪। পর্ণপুট ও কিসলয়—বঙ্গের জনপ্রিয় কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের সর্ব্বজনপ্রশংসিত কাব্যদ্বয়। মূল্য যথাক্রমে ১৲ টাকা ও ।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, পোঃ উলীপুর (রঙ্গপুর)।

১৫। "সম্ভোল বারাহিন"—মূল্য ৵০; "দালায়েলে কাফিফি রদ্দেলা মজহাবি"—মূল্য ৵০, "ইষ্টদেব"—মূল্য ৵০, "স্ত্রী-স্বাধীনতা"—মূল্য /০, "মহম্মদী লাঠি"—মূল্য ।০ আনা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। মোঃ মহম্মদ আলি, পোঃ মহীপুর, কোলকন্দ, রঙ্গপুর।

১৬। "অঞ্জলি"—স্বর্গীয়া কবি চারুহাসিনী দেবী প্রণীত কাব্যগ্রন্থ মূল্য ১৲টাকা। ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা মেসার্স চক্রবর্ত্তী এণ্ড চাটার্জ্জি পুস্তক-বিক্রেতার নিকট প্রাপ্তব্য।

১৭। স্বর্গীয় জানকীনাথ পাল বি, এল্ শাস্ত্রী বাচস্পতি বিরচিত "শ্রীশ্রীরাসলীলা" গ্রন্থকারের গবেষণা-পূর্ণ বিস্তৃত ভূমিকা, তাৎপর্য্য, বঙ্গানুবাদ, অন্বয় ও মণিপ্রভা নাম্নী অভিনব টীকাযুক্ত রাসপঞ্চাধ্যায়ের সহিত একত্রে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ স্থলে ৸০, "শ্রীনিত্যানন্দ-চরিত" ১ম খণ্ড ১২২পৃঃ মূল্য ।০ স্থলে ।০, ২য় খণ্ড ২১৮ পৃঃ ১৲ স্থলে ৸০, ৩য় খণ্ড ২৪০ পৃঃ ১ স্থলে ৸০, একত্রে ১।০; "যুগধর্ম্ম" ২১৮ পৃঃ ১।০ স্থলে ॥০ আনা। শ্রীবসন্ত-কুমারী পাল, নওপাড়া, পোষ্ট সোণারপুর (ফরিদপুর)।

১৮। "শ্রীরামচরিত" শ্রীঅন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের চরিত্রের সমালোচনা, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই সমপাঠ্য। মূল্য ৸০ মাত্র। কলিকাতা এস্, কে, লাহিড়ীর দোকানে পাওয়া যায়।

১৯। প্রতিষ্ঠাবান কবি শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত গ্রন্থাবলী—

১। "কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক" (কাব্য) এই গ্রন্থে আদর্শ পিতা, আদর্শ মাতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ দম্পতি ও আদর্শ বীর-চরিত্র চিত্রিত। কবির অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সামগ্রী। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ১৲এক টাকা। ২। "বঙ্গের কলঙ্ক"—(কাব্য) "অতি উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ" (সার কে, জি, গুপ্ত)। "কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম" (বাবু সারদাচরণ মিত্র) উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ৸০ বার আনা। ৩। "রাণী দুর্গাবতী" (ঐতিহাসিক কাব্য—বঙ্গের ডিরেক্টার বাহাদুরের অনুমোদিত) সম্রাট আকবর ও রাণী দুর্গাবতীর আদর্শচরিত্র এই গ্রন্থে চিত্রিত। প্রত্যেক বাঙ্গালীর এই বই পড়া উচিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ৸০ আনা। ৪। কুলীন বামন (সামাজিক প্রহসন)—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কুলীন সমাজের নিখুঁত চিত্র এই গ্রন্থে অঙ্কিত মূল্য ।০ চারি আনা। ৫। নলোপাখ্যান—মূল্য ॥০ আট আনা। ৬। কৌরব-কলঙ্ক—মূল্য আট আনা। ৭। পার্থ-পরাক্রম—মূল্য ।০ আনা।

কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গুরুদাস লাইব্রেরী ও ঢাকার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

অসমীয়া গ্রন্থ-বিবরণ।

৬। হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান।

শঙ্করদেবের লিখিত 'হরিশ্চন্দ্র' উপাখ্যানটি তাঁহার প্রাথমিক রচনা বলিয়া একরূপ স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে অনেকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে *। রাজা হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তৃক রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তদুপলক্ষে বিশ্বামিত্র ঋষিকে সমগ্র রাজ্য দান ও আত্মবিক্রয় দ্বারা দক্ষিণার অর্থ সংগ্রহ, এই সকল কার্য্যই এই উপাখ্যানে প্রকৃতিপুঞ্জ সহ হরিশ্চন্দ্রের সপরিবারে স্বর্গারোহণের হেতুভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু—

মন্ত্র তন্ত্র যজ্ঞ যত তপ তীর্থ কোটি শত
হরি নাম অধিক সবাতে। (কীর্ত্তন ৪৭৬ পৃঃ)

ইহাই উত্তরকালে শঙ্করদেব ও তদ্ভক্তগণ কর্ত্তৃক উদ্গীত হইয়াছিল। প্রাথমিক রচনা বা চবালর (ছাওয়ালের) বাণী হইলেও এই পুঁথিতে শঙ্করদেব আপনাকে 'কবি' বলিয়া একটি ভণিতাতে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :—

হরির চরণ সেবি কৃষ্ণর কিঙ্কর কবি
ছবী বন্ধে রচিলা পয়ার। (১৭৬)

মুদ্রাঙ্কণ কালে প্রাচীন পুঁথি কতদূর সংশোধিত হইয়াছে জানি না, কিন্তু যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা শঙ্করদেবের লেখনীর অনুপযুক্ত হয় নাই। প্রধানতঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে উপাখ্যানাংশ গৃহীত হইলেও নানা বর্ণ ও অলঙ্কারের সংযোগে এই করুণরসাত্মক উপাখ্যান অতি লোকমনোহর হইয়াছে। কথিত আছে এই পুঁথির পদ গাইয়া গোপাল নামক

---

* 'হরিশ্চন্দ্র' উপাখ্যানের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে ছয় শতেরও অধিক পদ ছিল। সংশোধিত মুদ্রিত গ্রন্থে ৫১২টি পদ আছে। ৬০৪ সংখ্যক পদটি এই :—

চবালর বাণি, হেন মনে জানি,
মনে হৈবা পরিতোষ।

১৩১১ সালের কার্ত্তিক মাসের 'প্রদীপে' শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শঙ্করদেবের এক ভক্ত স্বল্লায়াসে প্রচুর ভিক্ষা সংগ্রহ করিত। এই গ্রন্থে তৎকাল-প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—

হরিশ্চন্দ্র নৃপতির রাজস্থয় শুনি।
অযোধ্যাক আসি সবে ভরিলা ব্রাহ্মণী॥
অশেষ সেবকে দেই ভোজন সম্ভৃত।
দধি মধু মোদক ভুঞ্জন্ত পঞ্চামৃত॥
ঘৃত লাড়ু পরমান্ন ভুঞ্জি গণ্ডগোল।
ঘন ক্ষীর খান্তে—যেন পেট ভৈল ধোল॥
তথাপি বোলন্ত মোক আর কিছু লাগে।
উপস্থি পাএ৺ যাকে তথাপিতো মাগে॥
কতো পঞ্চামৃত খুজিলন্ত খাইবো বুলি।
মুখত ন যাই চাই থাকে হাত তুলি॥
বিধিক স্মরি মর্ম্ম করন্ত ব্রাহ্মণ।
এড়িয়ো নোথন্ত যেন কৃপণর ধন॥
থাওন্তে থাওন্তে কতো পাইলে গল মান।
বস্ত্র আনি যাচন্ত নে দেন্ত সমিধান।

স্থানে স্থানে বিশ্বামিত্র ঋষির প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত দেখিতে পাওয়া যায় :—

পরম আক্রোশি ঋষি অল্প ক্ষমা নাই।
বাকলি পিন্ধায়া বস্ত্র লৈলা সোলোকাই॥
দেখি ঋষি খঙ্গে খেদি গৈলা আগ বাঢ়ি
ভূমিত পেলাই অলঙ্কার লৈলা কাঢ়ি॥
দেখি শৈব্যা আপনি কাঢ়ন্ত অলঙ্কার।
দেখিয়া ক্রন্দন করে অবোধ কুমার॥

অন্যত্র—

বিশ্বামিত্র দেখে পাছে মূৰ্চ্ছা গৈয়া পরি আছে
মহারাজা ভার্য্যার সহিত॥
বিমূৰ্চ্ছিত দেখি আতি, দক্ষিণা হেরাইল বুলি
বসিলন্ত অধোমুখ করি।
মুখ নাহি উঠি যান্ত নিহালি নিহালি কান্ত
জানো রাজা আছে ছল ধরি॥
কান্ধে ঘট করি আনি মাথাত ঢালন্ত পাণি
উঠ উঠ হরিশ্চন্দ্র রাই।
দিয়া ধন দক্ষিণার কান্ধর গুচায়ো ভার
ধরুয়ার কৈতো সুখ নাই।

শ্রীশঙ্করদেব আমরণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি সসম্ভ্রম ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তৎকালীন পুরোহিতকুলের অসংযত অর্থলালসা তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় মুদ্রিত ছিল এবং তাঁহাকে ধর্ম্মাচরণ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য করিতে উদ্বোধিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। উত্তরকালে তিনি অনেক উগ্র মূর্ত্তি ব্রাহ্মণকে—অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া ভাগবতাদি ভক্তি-শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন।

৭। ধোলর * উৎপত্তি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা মৃদঙ্গের বোল শুনিলেই অজ্ঞান হন। 'শ্রীখোল' নাম উচ্চারণ করিতেই অনেকে ভাবে গদ্‌গদ হইয়া পড়েন। আসামে মৃদঙ্গের তাদৃশ প্রচলন নাই। 'শ্রীধোল' তৎস্থান অধিকার করিয়া আছেন। ধলসত্রের শ্রীযুক্ত তীর্থনাথ গোস্বামী 'ধুলিয়া' ও 'বায়েন' সকলের আদরের ধন "ধোলর উৎপত্তি" মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা অনেকটা তর্জ্জা লড়াইএর অনুরূপ। প্রথমে একজন 'ধুলিয়া' ঈশ্বর বন্দনা ও দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করিয়া অন্য 'ধুলিয়া'কে 'বান্ধনি' দিবে। তৎপর অন্য ধুলিয়া যথারীতি বন্দনাদি করিয়া ঐ সকল 'বান্ধনি' খুলিবে ; যথা :—

(বান্ধনি)

আসিয়া সভাত থিয় ভৈলা ধুলিয়া পুতাই।
কান্ধত কাঠ গরুচাল লৈ বড় ধুলিয়া বোলাই॥
কানত ধোলর ভার তুমি কেনেকৈ পালা।
কাহার আজ্ঞাত তুমি ধুলিয়া গোট ভৈলা।
এই ভূমিত কেনেকৈ দিবলৈ পালা পাও।
উপজিল পৃথিবী তার কোন বাপ মাও॥
উপজিল পৃথিবী কোণে কাটে নাই।
সেই কাছি খনি কার ঘরে বিচারিলে পাই॥

উপজিল পৃথিবী দিন কি রাতি।
উপজিল পৃথিবী চিত নে কাতি॥

তৎপর পৃথিবীতে কি প্রকারে চাম গাছের উৎপত্তি হইল? সেই গাছের টুকরা কুন্দাইয়া কে ধোল গড়িল? কোথায় গরুর জন্ম হইল? কখন মৃত্যু হইল? কে ছাল তুলিল? কে ধোল ছাইল? লা হেঙ্গুল নীল হরিতাল কোথায় উৎপন্ন হইল? কে উহা বাটিয়া ধোলের 'রং' করিল? বাঁশ কোথায় জন্মিল? কে উহার কতটুকু কাটিয়া ধোলের 'সারি' গড়িল? ইত্যাদি বহু প্রশ্ন। নিম্নলিখিত পদগুলিতে উপরোক্ত 'বান্ধনি' খোলা হইতেছে যথা :—

নজনাই বোলে কাঠ গরু ছালর ভার।
জ্ঞানী সকলে বোলে তাক মালা রত্ন সার ;
যাক বোলে মহাদেউর কণ্ঠর মুণ্ডমালা।
ধোলর ভার ভৈল আসি তারে এক কলা॥
বিষ্ণু গুরুর আজ্ঞাত ধোলর ভার লৈলো।
সেই দিনার হস্তে ধুলিয়া গোট ভৈলো॥
পূর্ব্বত আছিল মাত্র আদি নিরঞ্জন।
সৃষ্টি নোহান্ত ঈশ্বরক ন করে শোভন॥
শূন্য দেখি পৃথিবী স্রজিবে মন ভৈলা।
ঈশ্বরর কটাক্ষে বাসে প্রকৃতি স্রজিলা॥

সেই প্রকৃতির সঙ্গে প্রভো করিলা বিহার।
প্রসবিলা দেবী ডিম্ব বৃহৎ আকার॥
সেই ডিম্ব নিয়া মহাজলত পেলাইলা।
তান হস্তে ব্রহ্ম বিরাট জন্ম ভৈলা॥

*　　*　　*

চিতকৈ পৃথিবী বারাহে আনিলে উধাই।
হাতে কাছি ধরি ব্রহ্মা কাটিলেক নাই॥
মহাধর্ম্মে কাছি ভৈলা সুদর্শন চক্রে ধার।
বাসুকী ভৈলন্ত বিরী অনন্তে নালতি তার॥

* আসাম অঞ্চলে 'ড' ও 'ট' বর্গের পরস্পর স্বাধীন বিনিময় দেখা যায় ; সুতরাং 'ধোল' যে আমাদের "ঢোল" তাহা অনায়াসেই অনুমেয়। সম্পাদক।

পৃথিবীর জন্ম কৈলো জন্ম পটলক চাই।
সন্ত সাধুর ঘরত সেই কাছি বিচারিলে পাই॥
নাই চন্দ্র সূর্য্যর প্রকাশ সি বেলাত।
সেই সময়ে পৃথিবী খানি ভৈলা জাত॥
* * *
গোলোকর ছাম গুতি কৃষ্ণে দিলে ব্রহ্মার হাতত।
ব্রহ্মায়ে অর্পিলে গুতি ঋষি নারদত॥
সেই ছাম গুতি নি পৃথিবীত পছাই।
শেহ নিশা দুই পাতি ছাম গজিয়া গলাই॥

অনন্তর আট ফনায়ে আটোটা সিপা।
নববিধ ভক্তিয়ে নটা ডাল ধরে ছাম জোপা॥
পারিষদে পাত ভৈলা পার্ব্বতী বাকলি ছাল।
ভক্তির পূর্ণ রসে ছাম গছ জানা সর্ব্বকাল॥
মহাধর্ম্মে আসি ভৈলা ছামর মাজে সার।
বিশ্বকর্ম্মায় কাটি কানত ললে ভার॥
শুকমল বাহৈ'য়ে খোল করিলে গঠন।
অনন্তর লাল বীজে চারিতি বরণ॥
ইত্যাদি—

এই সকল প্রশ্ন ও উত্তর কিরূপ বাক্‌চাতুরীপূর্ণ সরস ও সর্ব্বজনভোগ্য তাহা মূল পদ-গুলি গীত না হইলে সম্যক্ উপলব্ধ হয় না। আমরা মূল পুঁথিখানি পাঠ করিয়াই মুগ্ধ হইয়াছি। খোলের সহিত রাগ সহকারে গীত হইলে এই 'বান্ধনি' ও 'মেলনি'গুলি যে অতিশয় শ্রুতিসুখকর ও প্রাণস্পর্শী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকেই মনে করেন যে শঙ্করদেবের পর আসামের সঙ্গীত ও কাব্য শাস্ত্রে নূতনত্ব বিকশিত হয় নাই। এরূপ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক এই "খোলর উৎপত্তি"ই তাহার একটি প্রমাণ। 'খোলর উৎপত্তির' ন্যায় গ্রামে গ্রামে কাব্যরসাস্বাদের জন্য অদ্যাপি যে সকল ভাওনা (যাত্রা), বহুয়ার গীত (ভাটের কবিতা) ইত্যাদি হইয়া থাকে, ঐ গুলির সংগ্রহ করা জাতীয় সাহিত্যের হিসাবে অতি আবশ্যক। বলা বাহুল্য যে বঙ্গদেশের ন্যায় আসামেও গ্রাম্য গীতি ও ছড়া প্রভৃতি নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অনাদৃত। এখন ভাটের কবিতা বা বহুয়ার গীত গাহিয়া পেট চালান দায়; সুতরাং সমাজে ঐ শ্রেণীর কাব্যামোদি লোক ক্রমেই বিরল হইয়া পড়িতেছে। ঐ সকল গ্রাম্য কবিররচিত যাহা কিছু এখনও আছে উহা সংগৃহীত ও মুদ্রিত না হইলে অসমীয় জাতীয় সাহিত্যের প্রভূত ক্ষতি হইবে।

৮। সীতা-স্বয়ম্বর নাটক।

শঙ্করদেব অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়া ভাবনা প্রবর্ত্তন করেন। 'সীতা-স্বয়ম্বর' তদ্রচিত একখানি অতি উৎকৃষ্ট নাটক। ইহা রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজ বা দেওয়ান চিলারায়ের অনুমতি ক্রমে রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল। যথা :—

রামক পরম ভকতি রস জান।
শ্রীশুক্লধ্বজ নৃপতি প্রধান।
রামক বিজয় করায়ত নাট।
মিলব তাহে বৈকুণ্ঠক বাট॥

নাটকের রচনা ও অভিনয়ের প্রণালী প্রদর্শনের জন্য কিঞ্চিত উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্লোক। কৃপাময়ঃ প্রভু রামঃ
দৃষ্ট্বা সীতাং সশঙ্কিতাং।
চকার সগুণং তূর্ণং,—
লীলয়াজগরং ধনুঃ॥

সূত্রধর। সে কৃপাময় রামচন্দ্র সীতাকে সকরুণ ভাব পেক্ষিয়ে তৎকালে ধনুত গুণ লগাবল, সে ঈশ্বর পুরুষ রামচন্দ্র হাস হাস কর্ণমানে টানি ধনুষ্টঙ্কার কয়ল। ঠাঙ্কার শবদে মধ্যস্থানে ভাগন। পচার ছিন্তি পড়ল যৈসে বজ্রপাত ভেল। রামক মহা মহিমা পেক্ষিয়ে সীতা ধনুভঙ্গ দেখি আনন্দে মগন হুয়া যেসে শ্রীরামক মাথে কুসুমমালা দিয়ে স্বামী বরল তা দেখহ শুনহ নিরন্তরে হরি হরি বোল হরি।

গীত।

রাগ মাহুর—যোতী মান।
আনন্দে রাজনন্দিনী হাসে।
রামক পাশে চলে লয় লাসে॥
পদ। স্বামীক মাথে মালা পরিধাই।
করু পরণাম পায়ে পড়ি মাই॥
ধরি রমণী রামে হাসি তোলে।
স্বামীক কামিনী আঞ্চলে ঢুলে॥

সূত্রধার। আহে সামাজিক লোক! সীতা স্বামীক পায়ে ধরিয়ে কর্পূর তাম্বুল যোগাই রহল। তদনন্তরে রাজা সব শোকে কোপে মোহিত হুয়া ধনু শর ধরিয়ে রামক পরম দর্প কয়ে বোলল।

রাজা সব বোল।

অয়ে কাহার ছবাল। অঃ হামার বিবাহের কন্যা ওতি নিয়া যায়! হামো সব রাজাক ধিক্ ধিক্।

সূত্রধার। ওহি বুলি ধর মার রোল বহুত করল।

শ্লোক।

শ্রুত্বা কোলাহলং রাজ্ঞাং
সীতা ভয়মুপাগতা।
রুরোদ চাতিসন্তপ্তা
পতিং পশ্যতি দুঃখিতা॥

সূত্রধার। ইত্যাদি—

অদ্যাপি আসামে গ্রামে গ্রামে এই সকল ভাবনা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে বিপুল সমা-রোহ হয়। ভাবনাতে অভিনেতৃদের সাজ সজ্জার অনেক উৎকর্ষ হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব রচিত নাটকগুলির ভাষাদির বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। শিক্ষিত সমাজে আধুনিক রীত্যনুযায়ী ও ভাষায় থিয়েটার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য প্রণালীতে অসমীয়া নাটক রচিত ও অভিনীত

হইতেছে। কিন্তু অদ্যাপি গ্রামে ভাবনা দেখিতে ও শুনিতে লোকের আগ্রহ ও উল্লাস হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই।

৯। বড় গীত।

অধিকাংশ মহাপুরুষ মাধবদেবের রচিত। শঙ্কর দেবের রচিত কয়েকটি সহ প্রায় ২০০ বড় গীত উদ্ধৃত করিয়া তেজপুরের প্রসিদ্ধ অসমীয়া পুঁথি প্রকাশক শ্রীযুক্ত হরবিলাস আগরওয়ালা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল বড় গীত বৈষ্ণবেরা প্রাত্যাহিক নাম-প্রসঙ্গে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। নূতন বড় গীত রচিত হইলেও শঙ্কর-মাধব রচিত বড় গীতের ন্যায় আদৃত হয় না। এই সকল গীতে ব্রজবুলি ভাষার মিশ্রণ অধিক। ব্রজবুলি ভারতের সর্ব্বত্র বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ প্রীতিকর। শঙ্করদেব রচিত একটি প্রসিদ্ধ বড় গীত এই :—

রাগ ধনশ্রী।

মন মেরি রাম চরণহি লাগু।
তই দেখনা অন্তক আগু॥ ধ্রু

মন আয়ু ক্ষণে ক্ষণে টুটে দেখ প্রাণ কোন দিনে ছুটে
মন কাল অজগরে গিলে জান তিলেকে মরণ মিলে।
মন নিশ্চয় পতন কায়া তই রাম ভজ তেজি মায়া
রে মন ই সব বিষয় ধান্ধা কেনে দেখি নে দেখস্ আন্ধা
মন জানিয়া শঙ্করে কহে দেখ রাম বিনে গতি নহে॥

মহাপুরুষ মাধবদেব রচিত বহু বড় গীতের মধ্যে কয়েকটি গোষ্ঠ-বিষয়ক। দুই চারিটিতে শ্রীমতী রাধারও উল্লেখ আছে। শঙ্কর-মাধবের অমৃতনিস্যন্দিনী লেখনীমুখে যে সকল বড় গীত লিখিত হইয়াছে উহাদের প্রশংসাবাদ নিষ্প্রয়োজন। ৪০০ বৎসরের পুরাতন গীতগুলি এখনও অবিকৃত রহিয়াছে। ভাষার সরলতা, ভাবের উচ্চতা এবং ঐ গীত-গুলির প্রাণস্পর্শী আন্তরিকতাই যে উহাদের সুদীর্ঘ জীবনের কারণ, একথা বলাই বাহুল্য। মহাপুরুষ মাধবদেব রচিত একটি বড় গীত উদ্ধৃত করিয়া অদ্যকার প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম।

রাগ আশোয়ারী।

কৈছে গোবিন্দ সেবহোঁ তোই।
চঞ্চল মন মেরি থির নাহি হোই॥ ধ্রু॥
যৈচে পঙ্কজদলগত নীর।
বিষয় লুবুধ মন তৈছে অস্থির।
ছোড়ি পামর মতি রতি তুয়া পায়।
রূপ রস পরশ শবদ গন্ধে ধায়॥
কহয় মাধব হরি করু মেরি দয়া।
চরণে শরণ লেহোঁ ছোড়হ মায়া॥

শ্রীউমেশচন্দ্র দে।

উদ্ভিদ তাহার উপকরণ ও বর্দ্ধন।

চতুর্থ প্রকরণ।

(১৩২০, ২য় সংখ্যার শেষাংশ।)

ক্ষুদ্রায়তন বাগানে প্রত্যেক শস্যের প্রধান বা মুখ্য উপাদান সাররূপে পঞ্চ বর্ষকাল ব্যবহার করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইতেছে।

প্রতি একর ভূমিতে

	সার কর্ত্তৃক প্রদত্ত	ফসল কর্ত্তৃক গৃহীত	ভূমির ক্ষতি	ভূমির লাভ
	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
যবক্ষারজান	২৭৪	২৫৯	...	১৫
প্রস্ফুরিকাম্ল	৫৩	৫৯	৬	,,
পোটাস	৮৩	১১৮	৩৫	,,
চূণ	১৩৭	১২৩	১৪	

এইরূপ ভাবে সার কিছুদিন ব্যবহার করিলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হইবে না। ঐ হিসাবে ফসলের খড়, ভূসী বা খোসা ইত্যাদি সমস্ত বিক্রীত বা স্থানান্তরিত করা হইবে ধরা হইয়াছে; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইবে না। সর্ষপের গাছ বা গুল্ম এবং খোসা বা ভূসীর বাজারে দর নাই। তাহা কোন অবস্থাতেই বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ঐ সর্ষপের খোসা এবং গুল্ম ভস্ম ভূমিতে ছড়াইয়া দিলে উপরি উক্ত হিসাবে পোটাস্ এবং প্রস্ফুরিকাম্ল সম্বন্ধে জমির যে ক্ষতি হইতেছিল, তাহা পূরণ হইয়াও অতিরিক্ত হইবে। সর্ষপের খোসা এবং গুল্ম যাহার বাজারে কোন মূল্য নাই, ভূমির উর্ব্বরতা বিধান জন্য তাহা অত্যন্ত মূল্যবান্। নিম্নে সংশোধিত হিসাব দেওয়া হইল। এই হিসাবে খোসা এবং গুল্ম পোড়াইয়া ভূমিতে দেওয়ার অবস্থা ধরা হইল।

সংশোধিত হিসাব।

	সার কর্ত্তৃক প্রদত্ত	শস্য কর্ত্তৃক গৃহীত	জমির ক্ষতি	জমির লাভ
	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
যবক্ষারজান	২৭৪	২৬০	...	১৪
প্রস্ফুরিকাম্ল	৫৩	৪৮	...	৫
পোটাস্	৮৩	৩৯	...	৪৪
চূণ	১৩৭	১৬	...	১২০

এই উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে. শস্য কর্ত্তৃক ভূমি হইতে যত পদার্থ গৃহীত হয় তাহা সমস্তই বাহিরে গিয়া জমির ক্ষতির কারণ হয় না। শস্যেতর পদার্থ যাহা বিক্রয় হয় না, তাহা সারস্তূপে গিয়া পুনরায় জমিতে প্রত্যর্পিত হয়।

এই হিসাবে আবাদ কার্য্যে যে পশু ব্যবহার হইবে, তাহার বিষয় কিছু বিবেচনা করা হয় নাই। যদি কেবল যন্ত্রশক্তি বা মনুষ্যশক্তিতে আবাদ হয়, অথবা গোধূমের খড় বিক্রয় না হয়, তাহা হইলে সর্ষপের ন্যায় গোধূমের খড় ও ভূসিও সারে পরিণত করিতে হইবে। এই খড় ভূসী পোড়াইয়া তাহার ভস্ম অথবা তাহা পচাইয়াও সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। পোড়াইলে ঐ খড় ভূসীতে নিহিত যবক্ষারজান পদার্থ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, এবং তাহার স্থলে এমনিক সালফেড অথবা সোডিক নাইট্রেট মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া জমিতে দিতে হইবে। পচাইতে হইলে গোধূমের খড় ও ভূসী এবং সর্ষপের গুল্ম ও খোসা উপর্য্যুপরি স্তরে স্তরে বিছাইয়া কয়েক মণ সরিষার খৈলগোলা-জল ছিটাইয়া ঐ খড়ের স্তূপকে ভিজাইতে হইবে। খড়ে এই জল গোময়স্তূপে গোমূত্রের ন্যায় কার্য্য করিবে এবং অতি সত্বর সমস্ত খড়স্তূপটি পচিয়া যাইবে। ৩।৪ দিন পরে স্তূপের মধ্যস্থলে ৫০।৬০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (১২২ হইতে ১৪০০ ফারেনহিট্) উত্তাপ হইবে। ১৫।২০ দিনের মধ্যে ঐ খড়ের আঁশাল ভাগ সমস্ত নষ্ট হইয়া কর্দ্দমবৎ "খামার বাড়ীর" সারের আকার ধারণ করিবে। খড় পচাইলে তাহার পরিমাণ অথবা আয়তন বৃদ্ধি হওয়ায়, জমিতে বহন করিতে কিছু ব্যয় হইবে। যাহা হউক পোড়াইলে যে পরিমাণ যবক্ষারজানের ক্ষতি হইবে ও তাহা পূরণ করিতে যে পরিমাণ এমনিক্ সল্ফেট অথবা সোডিক নাইট্রেট ক্রয় করিতে যত মূল্য লাগিবে, খড় পচান ইত্যাদি ও বহন ব্যয়ের সহিত তুলনা করিয়া কৃষক যথাভিরুচি করিতে পারে। পশুদ্বারা মাঠে হলচালন প্রভৃতি কার্য্য আমাদের দেশের সাধারণ পদ্ধতি। ইহাতে ব্যবহৃত পশুর মলমূত্রাদি সার পদার্থ অবশ্যই পাওয়া যায়। এই সার আর কিছুই নহে. কেবল খড়ঘাস ইত্যাদি উদ্ভিদ্ পদার্থ, ঐ পশু যাহা আহার করে, তাহারই পরিপাক ঘটিত রূপান্তরমাত্র। সারস্তূপের মূল্য ও তাহাতে যে যবক্ষারজান, পোটাস্ ক্যাল্‌সিক ফস্ফেট্ এবং চূণ থাকে তাহার জন্য জমির আয় ব্যয় এবং লাভ লোকসানের হিসাব আর দেখাইবার প্রয়োজন নাই। ইহা নানা অবস্থার উপর নির্ভর করে। কৃষক তাহার খড়, শস্য ইত্যাদির কি পরিমাণ বিক্রয় করিবে এবং জমিতে প্রদানার্থ কি পরিমাণ রক্ষা করিবে তাহা বিবেচনা করিয়া সে স্বয়ং যাহাতে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারে, তজ্জন্য অতঃপর কতকগুলি শস্য তালিকা দেওয়া হইবে। রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিয়া কৃষিকার্য্য করিলে কি লাভ হইতে পারে, তাহার আলোচনা নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। কৃষিস্থানের অবস্থা, মজুরের মূল্য ও স্বচ্ছলতা এবং কৃষিপদ্ধতির প্রকার এই সমস্ত নিশ্চিত ভাবে না জানিলে কোন প্রকার হিসাব দেওয়া যাইতে পারে না। যাহা হউক, এই সমস্ত পরিবর্ত্তনশীল বিষয়ের হিসাব কৃষকের নিজের উপর রাখিয়া এস্থলে উদাহরণ স্বরূপে কেবল উৎপন্ন দ্রব্যের এবং সারের সম্ভবপর মূল্যের একটি হিসাব দেওয়া হইল।

পূর্ব্বোক্ত বিথেলক্রম কৃষিক্ষেত্রে ২৭৫ একর ভূমির ১৭৫ একর পশুচারণার্থ এবং ১২৫ একর মাত্র আবাদের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। এই খামারের ১৪০০ পাউণ্ড=২১০০০৲ টাকা মূলধন ছিল। "খামার বাড়ী" সারের দ্বারা আবাদের ফল নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

খামার বাড়ীর সারে আবাদ।

	যত একর আবাদ	উৎপন্ন ফসল প্রতি একর		সমষ্টি		আনুমানিক মূল্য		
		টন	হন্দর	টন	হন্দর	পা.	শি.	পে.
আলু	১৭½	৪	১৮	৮৫	১৫	১৫২	০	০ = ২১১০৲
বীটমূল	৭১½	১০	১০	৭৮	১৫	৫০	১১	৩ = ৭৫৮।৶০
গোধূম (শস্য)	৫০	২০ বুশেল			১০০০বুশেল	২৮৮	১৬	০ = ৪৩৩২৲
,, (খড়)	০	`	৬	৬৫	০	৬৪	১৭	৭ = ৯৭৩৶০
ক্লোভার ঘাস	২৫	২	৭	৫৮	১৫	১২৭	১১	৩ = ১৯১৪৲
জই (শস্য)	২৫	৩৪ বুশেল	•	৮৫০বুশেল	...	১২০	০	০ = ১৮০০৲
ঐ (খড়)	...	...	১৫	১৮	১৫	১৪	১৯	২ = ২২৪।৵০
					সমষ্টি	৮২০	১৬	০ — ১২৩১২৲

কিন্তু পরে প্রতি একরে ১ পাউণ্ড, ১৮ শি, ৪ পে = ২৮৷৵০ আনা, অর্থাৎ বিঘা প্রতি কিঞ্চিদধিক ৯৲ টাকা ব্যয় করিয়া, অর্থাৎ সমস্ত খামারের জন্য ২৪০ পাউণ্ড = ৩৬০০৲ টাকা অতিরিক্ত খরচ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ১২৩১২৲ টাকা মূল্যের ফসলের স্থলে ১৮৮১০৷৵০ আনা মূল্যের ফসল উৎপন্ন, অর্থাৎ ৩৬০০৲ টাকা অতিরিক্ত খরচ করিয়া, ৬৪৯৮৷৵০ অতিরিক্ত মূল্যের ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল যথা—

খামার বাড়ীর সার এবং রাসায়নিক সারযোগে আবাদ

	যত একর আবাদ	উৎপন্ন ফসল প্রতি একর		সমষ্টি		আনুমানিক মূল্য		
		টন	হন্দর	টন	হন্দর	পা.	শি.	পে.
আলু	১৭½	৮	...	১৪০	...	২৫২	০	০ = ৩৭৮০৲
বীটমূল	৭১½	১৬	...	১২০	...	৭৬	১৬	০ = ১১৫২৲
গোধূম (শস্য)	৫০	৩৩বুশেল		১৬৫০বুশেল		৪৬৮	০	০ = ৭০২০৲
,, (খড়)	...	১	১৬	৯০	০	৯০	০	০ = ১৯৫০৲
ক্লোভার ঘাস	২৫	৩	৪	৮০	০	১৭৬	০	০ = ২৬৪০৲
জই (শস্য)	২৫	৫০ বুশেল		১২৫০বুশেল		১৭১	৫	০ = ২৫৬৮৷৵০
,, (খড়)	...	১	...	২৫	...	২০	০	০ = ৩০০৲
					সমষ্টি	১২৫৪	১	০ = ১৮৮১০৷৵০

মূলধন ১৪২০ পাউণ্ড, ২১৩০৲ টাকা ছিল, তাহাকে ১৬৪০ পাউণ্ড=২৪৬০০৲ টাকাতে উন্নীত করিয়া লাভ তিন গুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু এই লাভও ঠিক নহে।

নিম্নলিখিত হিসাবের তুলনায় এই উৎপন্ন শতকরা ২০ অংশ কম হইয়াছিল—

জনৈক প্রসিদ্ধ কৃষক তাহার খামারের রাসায়নিক সার সহযোগে নিম্নলিখিত হিসাবে ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—

১৮৬৫ খৃঃ	গোধূম	৪৪ বুশেল প্রতি একর
১৮৬৬ খৃঃ	কোলজা	৩৬ ” ” ”
১৮৬৭ ”	বসন্ত কালীয় গোধূম	৩৭ ” ” ”
১৮৬৭ ”	বীট মূল	২৪ টন ” ” ”

রাসায়নিক সার প্রয়োগে বিথেলক্রম খামারের আবাদের ১২৫ একর ভূমি হইতে যে লাভ ব্যতীত ঐ খামারে আবশ্যকীয় সার প্রাপ্তি জন্য যত সংখ্যক পশুপালন করিতে হইত, তাহাদিগের আহারের জন্য ঐ খামারের মোট ২৭৫ একর ভূমির অবশিষ্ট ১৫০ একরই পশুচারণ জন্য রাখিতে হইয়াছিল, এবং তাহাতে একর প্রতি ১ টন ১২ হন্দর হইতে ২ টন ঘাস জন্মিত। ঘাসের জন্য ভূমিতেও উপযুক্ত সার প্রয়োগ করিলে ৪০, ৫০ একর পশুচারণ ভূমিতে একর প্রতি ন্যূনকল্পে ৩ টন ৪ হন্দর ঘাস জন্মাইয়া অবশিষ্ট জমিতে মূল্যবান ফসল জন্মান যাইতে পারিত। শিম্বজাতীয় উদ্ভিদ্ বায়ু হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করে। তজ্জাতীয় লুসারেন ঘাস বায়ু হইতে একর প্রতি ২৬৪ হইতে ৩৫২ পাউণ্ড যবক্ষারজান গ্রহণ করে। এই ঘাস পশুচারণ ভূমিতে জন্মাইলে মূল্যবান যবক্ষারজানও সংগ্রহ হইতে পারিত। অতএব রাসায়নিক সার ব্যবহারে দুইটি উপকারিতা—(১) ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি (২) পশুচারণ ভূমির পরিমাণ হ্রাস। অথবা প্রয়োজন হইলে শতকরা ত্রিশটি পশু বৃদ্ধি করা যাইত।

যখন কৃষি বিজ্ঞানের উন্নতি এবং উর্ব্বরতা বিষয়ক উপকরণগুলি অজ্ঞাত ছিল, তৎকালে ওদন (cereals) শস্যের জন্য গোময়াদি সার প্রস্তুতের প্রয়োজন হইত। সুতরাং সারের জন্য আবশ্যকাতিরিক্ত পশু রক্ষা এবং তাহাদিগের আহারের জন্য পশুচারণ-ভূমি খামারের জমি অন্ততঃ অর্দ্ধেক রাখিতে হইত, না রাখিলে জমির উর্ব্বরতা হ্রাস হইয়া নানাপ্রকারে লোকসানের আশঙ্কা থাকিত। এই নূতন পদ্ধতি অনুসারে মাঠের অবিক্রীত ঘাস এবং ওদন শস্যের খড় খাওয়াইয়া পশু হইতেই আবশ্যক সার সংগ্রহ হয়।

ঐ সার পচন ক্রিয়া দ্বারা শস্যের গ্রহণ উপযোগী হওয়ার পূর্ব্বে যবক্ষারজানের ⅓ অংশ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় কেবলমাত্র ঐ সার ব্যাবহার করিয়া সন্তোষজনক ফল পাওয়া অসম্ভব জন্য তাহাতে উর্ব্বরতাবিধায়ক যে পদার্থ থাকিত তাহা রাসায়নিক সারযোগে দ্বিগুণিত করা হইত। এই রাসায়নিক সারে প্রাপ্ত বালিতে ৩টি ধাতব পদার্থ মিশাইলে যবক্ষার-জানঘটিত পদার্থ আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিবে। ইহা দ্বারা গোধূম অতি সত্বর বৃদ্ধি পাইবে এবং যে পরিমাণ যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ থাকিবে, সেই অনুপাতে তাহার বৃদ্ধি এবং পরিমাণের আধিক্য জন্য উহা উদ্ভিদ্ গ্রহণোপযোগী হইতে বিলম্ব হইবে। উহাতে শতকরা ৯৫ ভাগ অঙ্গারঘটিত পদার্থ থাকায় ঐ সারের ক্রিয়া ঐ সারের প্রাক্ পচনসাপেক্ষ। এইজন্য গোময়াদি

সারকে উপার্জ্জিত ধনবৎ গণ্য করা যাইতে পারে। কেবল গোময়াদি সারে কখনও প্রচুর ফসল হইতে পারে না। কারণ উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী পদার্থ তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ থাকে না। কিন্তু ঐ সারের সহিত ফসলের আবশ্যকীয় বিশেষতঃ মুখ্য উপকরণ মিশাইলে প্রচুর ফসল পাইয়া লাভবান্ হওয়া যায়।

রাসায়নিক সার ব্যবহার সময়ে স্মরণ রাখিতে হইবে যে গোধূম আদি ওদন শস্যে, তৃণজাতীয় শস্যে এবং বীটমূল প্রভৃতি শস্যে যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ, শিম্বী-জাতীয় শস্যে পটাস্ এবং শালগম ইক্ষু প্রভৃতি শস্যের ফসফেট প্রধান বা মুখ্য উপকরণ লুসারেণ (ঘাস বিশেষ) ফসলের জন্য কোন প্রকার যবক্ষারজানঘটিত সারের প্রয়োজন নাই; কেবল মাত্র ধাতব পদার্থ ৩টি সার দিলেই, পূর্ণ ফসল পাওয়া যায়। আলু এবং মসিনা (তিসি) ফসলের জন্য ঐ ধাতব পদার্থ তিনটির সহিত অল্প পরিমাণ যবক্ষারজান-ঘটিত পদার্থ যোগ প্রয়োজন। এই নিয়ম সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া যে ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে তাহার প্রকৃতি লক্ষ্য রাখিয়া, প্রয়োজন মত সারের ব্যবস্থা বিচক্ষণ কৃষক সহজেই করিতে পারে। প্রচুর শস্য উৎপাদন জন্য জমিতে প্রচুর সার দেওয়া যথেষ্ট নহে। জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা যাহাতে কোনপ্রকারে হ্রাস বা নষ্ট না হয় তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রাসায়নিক সার দ্বারা একই জমি চাষের তুল্য কৃতকার্য্যতার সহিত আবাদ করিতে দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন—(১) ফসল কর্ত্তৃক জমি যে পরিমাণ ক্যালসিক, ফস্ফেট, পটাস এবং চূণ গৃহীত হইবে তাহা হইতে ঐ তিন পদার্থ অধিক পরিমাণে জমিতে দিতে হইবে।

(২) যে পরিমাণ যবক্ষারজান ফসল কর্ত্তৃক গৃহীত হয় তাহার অর্দ্ধ জমিতে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। অর্দ্ধ বলিবার অর্থ এই যে কোন কোন শস্য যথা আলু, তিসি প্রভৃতি উদ্ভিদ্ জমি হইতে অল্প যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া থাকে, আবার লুসারেণ, ক্লোভার ইত্যাদি জাতীয় ঘাস, মটর, কলাই ইত্যাদি শিম্বীজাতীয় (Leguminous) শস্য জমি হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করে না। বায়ু হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করে আবার গোধূম বীটমূল ও ফলজাতীয় শস্য মৃত্তিকা হইতে প্রভূত পরিমাণ যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া থাকে। ফসল জমি হইতে যে পরিমাণ ক্যালসিক ফসপেট, পোটাস্ এবং চূণ গ্রহণ করিবে, তাহা হইতে অধিক দিতে হইবে; কারণ ঐ তিনটি ধাতব উপকরণ, ফসল জমি হইতেই গ্রহণ করে। ফসল জমি হইতে ঐ তিনটি পদার্থ যে পরিমাণ গ্রহণ করিয়াছে কেবল মাত্র সেই ক্ষতি পূরণ করিলে জমির উর্ব্বরতা স্থায়ী থাকিবে না। ঐ সকল ধাতব পদার্থ বৃষ্টির জলে যে পরিমাণ ধৌত হইয়া যায়, জমির উর্ব্বরতা স্থায়ী রাখিতে হইলে সে ক্ষতিও পূরণ করিতে হইবে।

পূর্ব্বে যে সমস্ত সারের সূত্র বা তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে (অতঃপর তালিকা দ্রষ্টব্য) তাহাতে এই দুই বিষয়ের প্রতি কতদূর লক্ষ্য রাখা হইয়াছে তাহা দেখা যাউক—

গোধূম ফসলের আবাদ—(পাশ্চাত্য দেশে গোধূম দুই জাতীয় আছে (১) আমাদের দেশের ন্যায় শরৎ ও বসন্ত কালে আবাদ হয়। শরৎ কালীয় আবাদে একর প্রতি ডাক্তার

ভিলিকৃত সূত্রে পূর্ণাঙ্গ সার ১নং ৫২৮ পা—মূল্য ২ পা ৫ শি ১১ পে=৩৪।৶০ বসন্ত কালীয় আবাদে—কিছু দিবার প্রয়োজন নাই অথবা এমোনিয়াম সলফেট ১৩২ পা=মুল্য ১৮৲ সমষ্টি মূল্য ৫২।৶০ মাত্র। এই সার প্রয়োগে সহজেই একর প্রতি ৩৪ বুশেল অর্থাৎ বিঘাপ্রতি ৭২ মণ গোধূম এবং একর প্রতি ২ টন=৫৪ মণ ১৬ সের খড় পাওয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে যদি সার সহযোগে জমিতে যাহা দেওয়া হইল এবং ফসল সহযোগে জমি হইতে যাহা লওয়া হইল, তাহার হিসাব প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ভূমির লাভ হইয়াছে।

একর প্রতি

	প্রদত্ত সার পাউণ্ড	গৃহীত শস্য পাউণ্ড	জমির লোকসান পাউণ্ড	জমির লাভ পাউণ্ড
যবক্ষারজান ৬১ পাঃ	১২১	১০৪	...	১৭
প্রস্ফুরিকাম্ল ,, ,,	২৬	২২	...	৪
পোটাস্ ,, ,,	৪৪	২৫	..	১৯
চূণ ,, ,,	৩৫	২	...	৩৩

উল্লিখিত হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে রাসায়নিক সারের ব্যবহারে ভবিষ্যতের জন্য কোন প্রকার আশঙ্কা নাই. পাশ্চাত্য দেশে বহু পরীক্ষা দ্বারা ইহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। উপরি লিখিত হিসাবে সমস্ত ফসল (খড় এবং শস্য) স্থানান্তরিত হইবে এবং কোন প্রকারের পশু খামারে থাকিবে না ধরা হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইবে না। আবাদ কার্য্যের জন্য পশু এবং মনুষ্যাদি থাকিবে এবং তাহাদিগের মল মূত্র এবং আবর্জ্জনাদিও জমির অনেক পরিমাণে উর্ব্বরতা সাধন করিবে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের দরিদ্র নিরক্ষর কৃষকগণ জমিতে কোন প্রকার সার দেওয়ার ঔচিত্য বুঝে না জন্য দেয় না অথবা দিতে পারে না। সুতরাং তাহারা যে জমির উৎপাদিকা-শক্তি নষ্ট করিয়া সাধারণের অনিষ্ট করিতেছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

সর্ষপ এবং গোধূম দুইবর্ষ পর্য্যায়ক্রমে সমালোচনার ফল নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। গোধূম ও তাহার খড়; সর্ষপ ও তাহার খোসা গুল্ম ইত্যাদি সমস্তই বিক্রয় করা এবং নিম্নলিখিত হিসাবে সার দেওয়া হইবে।

পথম বৎসর—সর্ষপ ক্যালসিক সুপার ফস্‌ফেট্ ৩৫২ পাউণ্ড, পটাসিক্ নাইট্রেট্ ১৭৬ পাউণ্ড, এমনিক সালফেট্ ২২০ পাউণ্ড, ক্যালসিক সালফেট্ ৩০৮ পাউণ্ড।

দ্বিতীয় বৎসর—গোধূম। এমনিক সালেফট—৩৫২ পাউণ্ড।

উপরিউক্ত সার কর্ত্তৃক ২ বৎসরে ১ একর জমিতে নিম্ন হিসাবে উপাদান চতুষ্টয় দেওয়া হইবে—যবক্ষারজান ১৩৭ পা দ্বিগুণ—২৭৪ পাউণ্ড, ফস্ফারিক এসিড ৫৩ পাউণ্ড, পটাস ৮৩ পাউণ্ড, চূণ ১৭ পাউণ্ড।

সর্ষপ এবং গোধূম ফসল কর্ত্তৃক দুই বৎসরে ভূমি হইতে গৃহীত উপাদানের পরিমাণ যথা—

		পটাস	ফসল পরিমাণ		যবক্ষারজান	ফস্ফরিক এসিড	চূণ
		পাউণ্ড	টন	হন্দর	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
এক ফসল সর্ষপ	গুল্ম	১৪½	২	১¼	৪৭¼	৭	৪৩¼
	খোসা	৬৪½	●	১৮	২২¼	৪	৬●
	শস্য	১৪½	০	১৯	৮৬	২৬¼	৬½
এক ফসল গোধূম	খড়	১২	১	১৫	৩১½	৪½	৮
	ভূষা	১	●	৫½	৬	●	
	শস্য	১১½	১	১½	১৮	●	

নিম্নে আয় ব্যয়ের বিবরণ দেওয়া হইল—

৮৮০ পাউণ্ড স্থলে ৪৪০ পাউণ্ড—মূল্য ১ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৫ পেন্স = ২১।/০ আনা।

দ্বিতীয় বৎসর—গোধূম।

এমনিক্ সলফেট্—১৭৬ পাউণ্ড মূল্য ১ পাউণ্ড ১২ শিলিং = ২৪৲ টাকা।

তৃতীয় বৎসর ক্লোভর (শীম্বজাতীয় ঘাস বিশেষ) ডাক্তার ভিলিকৃত সূত্রের অসম্পূর্ণ সার ৬ নং (অতঃপর তালিকা দেওয়া হইবে)

৮৮০ পাউণ্ড—১পা—১০ শি—১০ পে = ২৩৶০

চতুর্থ বৎসর—গোধূম।

এমনিক্ সাল্‌ফেট্—১৭৬ পাউণ্ড = ১ পা—১২ শি—০ পে = ২৪৲

পঞ্চম বৎসর—জই।

এমমিক্ সালফেট্—২৬৪ পাউণ্ড = ২পা—৮ শি—০ পে = ৩৬৲

পাঁচ বৎসরের সমষ্টি ব্যয়—৮ পা ১১ শি ৩ পে = ১২৮৷৶০

পাঁচ বৎসর একরপ্রতি ব্যয়—৮ পা ১১ শি ৩ পে = ১২৮৷৶০

নূতন প্রতিবৎসর একরপ্রতি গড় ব্যয়—১ পা ১৪ শি ৩ পে ২৫৷৶০ অথবা বিঘা প্রতি ৮৷০

কেবল খামার বাড়ীর সারে আলু প্রতি একরে ৪ টন ১৬ হন্দর = ১৩০৷২ মণ, গোধূম ২০ বুশেল = ১৩/০ মণ, জই ৩১ বুশেল = ২১৷ মণ এবং শুষ্ক ক্লোভার ঘাস ২ টন হিসাবে হইত। রাসায়নিক সার যোগ করাতে একরপ্রতি আলু ৮ টন = ২১৬৷৪ মণ; গোধূম ৩৩ বুশেল = ২১/৮ মণ, জই ৪৯ হইতে ৫৩ বুশেল এবং শুষ্ক ক্লোভার ঘাস ন্যূনকল্পে ৩ টন ৪ হন্দর হইত। এই প্রকার বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সবই এক নিয়মের অধীন, যে সমস্ত নিয়ম বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই কৃষক নিজের সারের সূত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, গোময়াদি সারে যবক্ষারজান, ক্যালসিক ফস্ফেট, পোটাস এবং চূণ এই চারিটি পদার্থ থাকা হেতুই তাহার সারত্ব পাশাপাশি দুই খণ্ড ভূমির এক খানিতে গোময়াদি সার এবং অপর খণ্ড ভূমিতে প্রথম খণ্ড জমিতে প্রদত্ত গোময়াদি সারে যে পরিমাণ ঐ চারিটি পদার্থ আছে, তৎপরিমাণ ঐ চারিটি রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত সার দিয়া কোন ফসল

আবাদ করিলে যে ভূমিখণ্ডে রাসায়নিক সার দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অপর খণ্ড অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফসল হইতে দেখা যায়। এই চারিটি পদার্থের মধ্যে উদ্ভিদ্বিশেষে একটি মুখ্যাঙ্গ, অপর তিনটি আনুসঙ্গিক ;—যথা, যবক্ষারজান গোধূমাদি ওদন শস্যের সারে মুখ্যাঙ্গ, কিন্তু শীম্বজাতীয় (Leguminous) উদ্ভিদের পক্ষে আনুসঙ্গিক অঙ্গ। মুখ্যাঙ্গের মুখ্যত্ব পূর্ণাঙ্গ সারের অপর তিনটি আনুসঙ্গিক উপকরণের বিদ্যমানতার উপর নির্ভর করে। যবক্ষারজান-ঘটিত পদার্থ গোধূমাদি ওদন শস্যের মুখ্যাঙ্গ হইলেও ঐ পদার্থ দিয়া কেবল গোধূম বপন করিলে কোন ফলই হইবে না।

মনুষ্য শক্তির দ্বারা আবাদ কার্য্য হইতে পারে। কিন্তু সুবৃহৎ কৃষিক্ষেত্রে আবাদ ইত্যাদি কার্য্যের জন্য পশুশক্তির ব্যবহার অপরিহার্য্য। এরূপ স্থলে পশ্বাদির মলমূত্রসম্ভূত সার কতক পরিমাণ অবশ্যই প্রতি বৎসর উৎপন্ন হইবে। ইহা নষ্ট না করিয়া ব্যবহারও করিতে হইবে। গোময়াদির সার এবং রাসায়নিক সার একত্র ব্যবহারের ফল পূর্ব্বোক্ত বিথেল ক্রম কৃষিক্ষেত্রের পরীক্ষা হইতে জানা যায়। ঐ ক্ষেত্রে পঞ্চবর্ষব্যাপী শস্য পর্য্যায়ে প্রত্যেক জমিতে ১৬ হইতে ২০ টন "খামার বাড়ীর" সার দেওয়া হইত। ঐ ২০ টন সারে পূর্ণাঙ্গ সারের উপকরণগুলি নিম্নলিখিত হিসাবে থাকিত—

যবক্ষারজান	১৮১	পাউণ্ড	প্রতি	একর
পোটাস্	১৬৪	"	"	"
প্রস্ফুরিকাম্ল	৯৮	"	"	"
চূণ	৩৫২	"	"	"

অধুনা রাসায়নিক সারের ব্যবহারে কৃষিকার্য্য সহজসাধ্য হইয়াছে। ওদন শস্য (cereals) জন্মাইতে হইলে পশুপালন এবং পশুচারণ-ভূমি রক্ষার আর প্রয়োজন নাই। এক্ষণে উর্ব্বরতা বিধায়ক পদার্থগুলি সম্যক্ জানা গিয়াছে। কেবলমাত্র গোময়াদি সারে প্রচুর ফসল পাওয়া যাইতে পারে না। পূর্ব্ব নিয়মে আর কৃষকদিগের চলা উচিত নহে। তাহারা সুবিধা মনে করিলে পশুরক্ষা করিয়া গোময়াদি সার সংগ্রহ করিতে পারে, অথবা তাহাদিগের রাসায়নিক সার ব্যবহাররূপ অতি সহজ পথও আছে। লাভ লোকসান হিসাব করিয়া সার নির্ব্বাচন করা উচিত। কৃষক এখন আর তাহার প্রয়োজনীয় সার স্বয়ং প্রস্তুত করিতে বাধ্য নহে। তাহার কর্ত্তব্য ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে সার দেওয়া। গোময়াদি সারই হউক, অথবা রাসায়নিক সারই হউক, অথবা দুয়ের একত্র সংমিশ্রণই হউক, যাহাতে সুবিধা এবং লাভ, তাহাই প্রদান করা উচিত। কিন্তু সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে—ভূমি হইতে ফসল যে পরিমাণ ফস্‌ফেট, পোটাস্, চূণ গ্রহণ করিবে তাহা হইতে অধিক পরিমাণে ঐ তিন পদার্থ সার সহ ভূমিতে দিতে হইবে। ভূমি হইতে ফসল যে পরিমাণ যবক্ষারজান গ্রহণ করে, সার সহযোগে ঐ পদার্থ তাহার অর্দ্ধেক দিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগে কৃষিকার্য্যের সমস্ত বাধা বা কাঠিন্য অপসৃত হইয়াছে, এক্ষণে কেবল জমিতে হল চালন, ফসলাদি বহনের গাড়ীর এবং আবশ্যকীয় দুগ্ধ এবং মাংসের জন্য প্রয়োজনীয় পশু ভিন্ন অতিরিক্ত পশু রক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই, অথবা পশুরক্ষার প্রয়োজন হইলেও

তাহার জন্য বহু পরিমাণ পশুচারণ মাঠের প্রয়োজন নাই ; কারণ মাঠের ফসল ও ঘাস অন্যান্য ফসলের ন্যায় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ভূমির অভাব এখন আমরা অন্যত্র হইতে সার আনিয়া পূরণ করিতে পারি ; এবং এই সারের প্রকৃতি, উপকরণ এবং পরিমাণ আমরা নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে অবধারণ করিতে সমর্থ ।

যিনি দেশের কল্যাণের জন্য কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া চলেন, তিনিই এই বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিবেন। পূর্ব্বে বর্ত্তমান সময়ের মত পথঘাটের সুবিধা ছিল না, যেখানকার শস্য সেই খানেই বিক্রয় করিতে হইত। এখন স্বাধীন বাণিজ্যের এবং রেল ষ্টীমারের কল্যাণে দেশের শস্য অন্যত্র যাইবার এবং অন্যত্র হইতে দেশে শস্য আসিবার সুবিধা হইয়াছে। এখন আমাদিগকে সমস্ত পৃথিবীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে। এই সংগ্রামে যাহাতে সক্ষম এবং কৃতকার্য্য হইতে পারি, তজ্জন্য সমস্ত ফসলই পূর্ণমাত্রায় জন্মান একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। পুরাতন পদ্ধতিতে ইহা অসম্ভব, কেবলমাত্র রাসায়নিক সারের ব্যবহারেই ইহা সহজসাধ্য হইবে। পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে সারের জন্য যাহা ব্যয় হয়, তাহার উপর বিঘা প্রতি ৯।১০৲ টাকা, অথবা এখন যদি সার সংগ্রহে কিছুই ব্যয় না হয়, তাহা হইলে বিঘা প্রতি ফসল বুঝিয়া ১০।১১৲ টাকা হইতে ১৫।১৬৲ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিলে যে অতিরিক্ত ফসল পাওয়া যাইবে, তাহা সার সংগ্রহে যে ব্যয় হইবে, তাহার দ্বিগুণেরও অধিক, ইহা পরীক্ষিত সত্য। এই বৈজ্ঞানিক সত্য অবলম্বনকরিয়া দেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিলে দেশে অতি শীঘ্রই অপরিমেয় ধান্যোৎপত্তি এবং সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে। উদাসীন থাকিলে দেশের বর্ত্তমান নিত্য দুর্ভিক্ষ এবং "হা অন্ন, হা অন্ন" অবস্থা দুরীভূত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালার দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে

সভাপতির অভিভাষণ।

যেখানে (Muse) মিউসগণ সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন, যেখানে তাঁহারা থাকিতে ভাল বাসিতেন, তাঁহাদের সেই প্রিয় স্থানের নাম যবন ভাষায় 'মুসিয়ম' ছিল। ইঁহারা Zens অর্থাৎ দিব দেবতার কন্যার কন্যা। ইঁহারা ফোয়ারা বা ওগোলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন। গান, কবিতা, নাট্য এ সকলই ফোয়ারার নিকট নির্জ্জন স্থানে ভাল লাগে। মিউসেরা নয় ভগ্নি, ফোয়ারা হইতে তাঁহারা ক্রমে মহাকাব্য, গীতিকাব্য, নাট্য প্রহসন, প্রেমগীতি, স্তবস্তুতি, ইতিহাস জ্যোতিষ ও গান এই সকলের দেবতা হইয়া উঠিলেন। যেখানে এই সকলের চর্চ্চা হইত তাহাকে মুসিয়ম (Museum) বলিত। এখনকার মুসিয়মের সঙ্গে সে মুসিয়মের বড় একটা সম্পর্ক নাই বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যেখানেই কাব্য গান ইতিহাস জ্যোতিষ নাটক প্রভৃতির চর্চ্চা হয় ক্রমে সেইখানেই সকল প্রকার বিদ্যার চর্চ্চা হইয়া থাকে। আরিস্‌টটেল (Aristottle) আলেকসন্দারের গুরু ছিলেন, তাঁহার Museum ছিল, উহাতে সকল বিদ্যার চর্চ্চা হইত। পদার্থবিদ্যার চর্চ্চা তিনি প্রথম আরম্ভ করেন। তাঁহার শিষ্য, নানা দেশ হইতে নানা উপায়ে নানা লোকের দ্বারা নানা প্রকার পদার্থ সংগ্রহ করিয়া দিতেন, তিনি ঘরে বসিয়া সেই গুলি পরীক্ষা করিতেন, তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করিতেন, তাহাদের গুণাগুণ নির্ণয় করিতেন, এইরূপে তিনিই সর্ব্ব প্রথম পদার্থবিদ্যার পুস্তক লিখেন। এই সময় হইতেই Museumএ পদার্থ সংগ্রহ হয়। আলেকজেন্দ্রিয়ায় (Alexandria) একটি প্রকাণ্ড Museum ছিল, সেখানকার পুস্তকালয় উহার একটি অংশ মাত্র। মুসলমানেরা যখন সেই মুসিয়মটি নষ্ট করিয়াছিল তাহার পর ঐ রূপ পদার্থ সংগ্রহ আর বহুকাল ধরিয়া হয় নাই।

কোন আশ্চর্য্য জিনিস দেখিলে তাহা সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক এবং যাহার যেরূপ শক্তি সকলেই কিছু কিছু আশ্চর্য্য জিনিস সংগ্রহ করিয়া থাকে। রাজারা সকলেই এরূপ আশ্চর্য্য জিনিস সংগ্রহ করেন। মন্দিরে মন্দিরে অনেক আজব জিনিস সংগ্রহ হইত। আমাদের সকল রাজার বাড়ীতেই একটা করিয়া শিলাখানা থাকে। সেখানে নানারকম অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ হয়। সে সব অস্ত্রের একটি করিয়া ইতিহাস আছে, রাজারা সকলেই সেই ইতিহাস জানেন, তাই ঐ সকল এত যত্ন করিয়া রাখেন। সেই শিলাখানাই এক রকম Museum। অনেক শিকারী যে সব জন্তু শিকার করেন তাহাদের চামড়া, দাঁত, হাড়, খড়্গ, খুর বাড়ীর দরজায় সাজাইয়া রাখিয়া দেন। এইরূপ তিন চার পুরুষ করিলে একটা Museum

হইয়া উঠে। অনেক ধনী লোক চিড়িয়াখানা করিয়া থাকেন, সেও এক রকম Museum, কবিরাজেরা বাড়ীতে অনেক রকম ঔষধের গাছ পুতিয়া রাখেন, সেও এক রকম Museum। সকল দেশেই এইরূপ সংগ্রহ হইত, এইরূপ অনেক ছোট খাট Museum হইত। ইহুদিদের বড় রাজা সুলেমানের এইরূপ আশ্চর্য্য জিনিষের সংগ্রহ ছিল, অগস্তস্ সিজারেরও সংগ্রহ ছিল। কিন্তু এই সকল সংগ্রহ কেবল চক্ষুর তৃপ্তি ও কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য হইত। মুসিয়মের যে তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য তাহার একটিও লোকে জানিত না এবং জানিলেও যেরূপে সংগ্রহ করিতে হয় সেইরূপ বুদ্ধিপূর্ব্বক সংগ্রহ করা হইত না। এখনকার মুসিয়মের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য যথা—(১ম) আনন্দ (২য়) লোকশিক্ষা (৩য়) আবিষ্কার।

(১) আনন্দ—মুসিয়মের বাড়ীটি সুন্দর স্থানে হইবে, ঘরগুলিতে জিনিসপত্র ভাল করিয়া সাজান হইবে, আলো ও বাতাসের অভাব থাকিবে না, জিনিসগুলি সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে, কেবল বাছা বাছা জিনিস দেখান হইবে, অনেক জিনিস সাজাইয়া ভিড় করা হইবে না। ঐ বাড়ী ঢুকিলেই মন যেন প্রফুল্ল হয়, তাহা হইলেই যে সকল জিনিস দেখিবে সে গুলি অনেক দিন মনে থাকিবে।

(২) শিক্ষা—জিনিসগুলি সাজান দেখিয়াই যেন মনে করিতে পারা যায় যে, পর পর কত উন্নতি হইতেছে। সাজান তিন রকমে হইতে পারে (ক) উপাদান লইয়া, উপাদানের এক এক বস্তু এক এক জায়গায় থাকিবে। সোনার জিনিস এক জায়গায় রূপার জিনিস এক জায়গায় লোহার জিনিস এক জায়গায় ইত্যাদি ইত্যাদি। (খ) কাল অনুসারে, উপাদান লইয়া সাজান হইলে, তাহার মধ্যে আবার কালানুসারে সাজাইতে হইবে। কোনটা আগে কোনটা পরে দেখাইতে হইবে। প্রত্যেক স্থলেই দেখাইতে হইবে পর পর উন্নতি হইতেছে না অবনতি হইতেছে। যদি দেখা যায় পর পর উন্নতিই হইতেছে, কিন্তু মাঝে এক জায়গায় দিনকতক অবনতি হইয়া গেল, এইরূপ অবনতি হইল কেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করার নাম Research বা অন্বেষণ। (গ) দেশানুসারে—দেশ অনুসারে সাজান হইলে এক দেশের পদার্থের সঙ্গে অন্য দেশের পদার্থের কত প্রভেদ তাহা দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই প্রভেদের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেশের লোকের প্রকৃতিগত যে ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা একটি প্রয়োজনীয় অন্বেষণ।

(৩) আবিষ্কার—অনেক সময়ে মুসিয়মের সাজান জিনিস দেখিলেই মনে হয় যেন কোন জায়গায় শিকল কাটিয়া গিয়াছে, তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তখন আবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়। সেই কাটা শিকল বা ছেঁড়া তার মিলাইয়া দেওয়া মুসিয়মের প্রধান কাজ। এই সকল আবিষ্কার Museum হইতে হয় এবং তদ্দ্বারা জগতের অনেক উপকার হয়। মুসিয়মে এইরূপ আবিষ্কারের যাহাতে সুবিধা হয় তাহা করিয়া দেওয়া একান্ত

আবশ্যক। মুসিয়মে সাজান জিনিস হইতে আর যে যেরূপ অন্বেষণ বা আবিষ্কার হইতে পারে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এই তিন উদ্দেশ্যে Museum করা অতি অল্প দিন আরম্ভ হইয়াছে, বোধ হয় এক শত বৎসরও হয় নাই। কেমন করিয়া শুদ্ধ মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ আশ্চর্য্য জিনিস সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা হইতে ক্রমে Museum করিবার ইচ্ছা হয় তাহা বুঝিতে গেলে একটু ইতিহাসের কথা লইয়া আলোচনা করিতে হইবে।

১৪৫৩ খৃঃ অব্দে ইউরোপে একটি বিষম ঘটনা ঘটে, তদ্দ্বারা পশ্চিম ইউরোপের সৌভাগ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপের দুর্ভাগ্যের উদয় হয়। ঐ খৃঃ অব্দে তুর্কীরা কনষ্টান্টিনোপল দখল করে। বহুকাল হইতে গ্রীকেরা বিদ্যার চর্চ্চা করিতেছিল, সুকুমার কলা শিক্ষা করিতেছিল, ঐ সময়ে তাহাও শেষ হইল। অনেক গ্রীক্ পণ্ডিত তাঁহাদের পাঁজি-পুথি ও দেখিবার মত ভাল জিনিস লইয়া ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলে পলায়ন করেন। পশ্চিম ইউরোপের বিশেষতঃ ইতালীর সম্রান্ত লোকেরা তাঁহাদিগকে পরম আদর করিয়া দেশে রাখেন। পশ্চিম ইউরোপে গ্রীকবিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ হয়, হেরোডোটাস, ইশ্চাইডিস্, সোফাক্লিস, প্লেটো প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রীক পণ্ডিতদিগের পুস্তকের পঠনপাঠন আরম্ভ হয়। গ্রীকদিগের ভাস্করকার্য্যের প্রতি লোকের অনুরাগ হয়। নূতন বিদ্যার একরূপ নেসা হইয়া দাঁড়ায়। লোকে যাহা কিছু গ্রীক সব সংগ্রহ আরম্ভ করে। সংগ্রহটা এই কালেই বেশী হয়। পূর্ব্ব হইতে ইতালীতে রোমানদিগের অনেক কীর্ত্তিকলাপ ছিল, তাহার উপর গ্রীক আসিয়া জুটিল, গ্রীক ও রোমান কীর্ত্তিতে ইতালী ছাইয়া গেল। ইউরোপে ইতালী একটি পুণ্য ভূমি হইয়া গেল। লেখাপড়া শিখিবার পর একবার ইতালী বেড়াইয়া না আসিলে পাঠ সমাপ্ত হইত না। নেপোলিয়নের সময়, ইতালীর এই সব কীর্ত্তিকলাপ লুণ্ঠিত হইয়া ফ্রান্সে আসিল। ১৮১৫ খৃঃ অব্দে প্রধান প্রধান জিনিসগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু অনেক জিনিস ফ্রান্সে পড়িয়া থাকে এবং এখনও আছে। মোটামুটি বলিতে গেলে ফরাসীবিপ্লবের সময় হইতে Museum করার লক্ষ্য স্থির হয়। Museum কিরূপ বাড়ীতে রাখিতে হইবে, কেমন করিয়া জিনিস পত্রগুলি সাজাইতে হইবে, কি উপায়ে লোকের আনন্দ ও শিক্ষা হইতে পারে, কি উপায়ে পণ্ডিতগণ নিত্য নূতন তত্বের আবিষ্কার করিতে পারেন এ সকল কথা খৃষ্টীয় ১৯ শতের আরম্ভ হইতে লোকের মনে উদয় হইতে থাকে। ১৮৭০ সালে এক ইউরোপীয় মহাপণ্ডিত এ বিষয়ে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, পুস্তক লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে ইউরোপের Museum গুলি নবজীবন লাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রধান কথা এই যে যিনি Museumএর কর্ত্তা হইবেন, তাঁহার এক জন মানুষের মত মানুষ, পণ্ডিতের মত পণ্ডিত হওয়া আবশ্যক। তিনি মুসিয়মটিকে যেমন করিয়া সাজাইবেন, লোকে সেইরূপই বুঝিবে, সুতরাং ঐ জায়গায় পাকা লোক দেওয়া চাই।

কয়েক বৎসর হইল Museum ও পুস্তকালয় করিবার জন্ত ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট বিশেষ

বন্দোবস্ত করিয়াছেন, Municipality কিংবা লোকাল বোর্ড এজন্য স্বতন্ত্র টেক্স বসাইতে পারেন না। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ডে বিজ্ঞানের জন্য প্রায় দুই হাজার এবং নানাবিধ শিল্পের জন্যও ৩৩৮টি Museum আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি সর্ব্বসাধারণের জন্য, কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জন্য, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নগরের জন্য, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্থানের জন্য। Tembry নামক ইয়র্কসায়ারের একটি ছোট জায়গায় একটি ছোট Museum আছে উহাতে Tembryর চারি পাশের আজব জিনিস সব সংগ্রহ হয় এবং ইয়র্কসায়ারের সমুদ্রতীরে যে সব সামুক ঝিনুক উঠে তাহাই দেখান হয়, কিন্তু সে Museumএরও আয় বৎসরে ৫০ পাউণ্ড বা ৭৫০ টাকা।

Museum এ কি দেখাইতে হইবে? পরমেশ্বর যাহা করিয়াছেন সেই সবই দেখাইতে হইবে ইহার নাম বিজ্ঞান মুসিয়াম। মানুষে যাহা করিয়াছে তাহাও দেখাইতে হইবে ইহার নাম Anthropological Museum। শিল্প-সম্বন্ধে যে সকল Museum আছে তাহা এই Anthropological Museumএর কণামাত্র। কলিকাতায় যে ইণ্ডিয়ান Museum আছে উহার উৎপত্তির স্থান এসিয়াটিক সোসাইটী। এসিয়াটীক সোসাইটীর উদ্দেশ্য এই যে, এসিয়া মহাদেশের সীমার মধ্যে ঈশ্বর যাহা করিয়াছেন আর মানুষে যাহা করিয়াছে তৎ সমস্তের আলোচনা। এসিয়াটীক সোসাইটী কখনও আপনাদের প্রভাব সঙ্কোচ করেন নাই, Indian Museum ও আপনার প্রভাব সঙ্কোচ করেন নাই। তথাপি এই দাঁড়াইয়াছে যে ঘটনাচক্রে শাখাদিগের শ্রীবৃদ্ধিতে এসিয়াটীক সোসাইটী ক্রমে কলিকাতা সোসাইটীতে পরিণত হইয়াছেন, Indian Museumও ক্রমে বেঙ্গল Museum হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তথাপি ঈশ্বর যাহা করিয়াছেন এবং মানুষ যাহা করিয়াছেন এই দুইয়েরই আলোচনা তাঁহারা করেন। মান্দ্রাজ Museumও এই ছাঁচে তৈয়ারী, বোম্বাই Museumও এই ছাঁচে ঢালা হইতেছে। বরোদায় একটি Mnseum আছে, বরোদার মহারাজের তাহার প্রতি খুব দৃষ্টি। সেটিও এই প্রকারের Museum.

কিন্তু এতদ্ভিন্ন সম্প্রতি আর কতকগুলি Museum হইয়াছে তাহার দৌড় এত বেশী নয়। তাহারা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস লইয়াই ব্যস্ত। এই প্রকারের Museumএর মধ্যে পেসোয়ার Museum খুব ভাল। একটি পাহাড়ের উপর Museum, তাহার চারিদিক্ খোলা, যথেষ্ট আলো আছে সাজান অতি চমৎকার। Sir Orecl Styne ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যে জায়গায়ই যাও একবার চোখ বুলাইয়া গেলেই পেসোয়ারের পুরাণ সময়-তালিকা ঠিক বুঝিতে পারিবে। পুরাণ টাকাগুলি এই ভাবে সাজান পুরাণ মূর্ত্তিগুলি এই ভাবে সাজান পুরাণ বাসন গুলি এই ভাবে সাজান, সব সময় ধরিয়া সাজান। Fowler সাহেব যে লিখিয়াছেন, যে Creator লইয়াই Museum, পেসোয়ার দেখিলে সে কথা যে খুব সত্য তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু পেসোয়ার Museumএর উদ্দেশ্য খুব ব্যাপক নয় পেসোয়ারের প্রাচীন ইতিহাসই উহার উদ্দেশ্য, তাহা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।

পেসোয়ারের পর লাহোর মুসিজিয়ম সমস্ত পাঞ্জাব প্রদেশের ইতিহাসের যাহা কিছু সব এখানে সংগ্রহ হইয়াছে। খৃঃ পূর্ব্ব দুই শত হইতে খৃষ্ট পর দুই শতাব্দ পর্য্যন্ত পাঞ্জাব অঞ্চলে যে সকল পাথরের কাজ হইত তাহাতে গ্রীক্‌দিগের প্রভাব খুব ছিল, কারণ সেই সময় অনেক গ্রীক ঐ অঞ্চলে বাস করিয়াছিল। তক্ষশীলা তখন ঐ অঞ্চলে একটি প্রধান নগর ছিল। পেসোয়ারও অনেক সময়ে রাজধানী ছিল। সুতরাং পোসায়ারের অনেক জিনিস ও তক্ষশিলার সব জিনিস লাহোরে আছে।

লাহোরের পর দিল্লী Museum ইহাতে মুসলমান আমলের ও মোগল আমলের জিনিসই অধিক। মথুরায় একটি Museum আছে। লাল পাথরের বাড়ী দেখিতে ছবি খানির মত। মথুরা ব্রজধামের রাজধানী। ব্রজধাম রজের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু Museumটিতে রজের গন্ধ নাই—এমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পণ্ডিত রামকিষণ, তিনি Hony-curator। যেখানে যে পাথরের মূর্ত্তিটি পাইতেছেন বা কাজ করা পাথর পাইতেছেন অমনি আনিয়া Museumএ রাখিতেছেন। যে ঢিপি খুঁড়িলে কিছু পাওয়া সম্ভব অমনি তাহা খুঁড়িতেছেন আর যে মূর্ত্তি পাইতেছেন তাহাই আনিতেছেন। এইরূপ খুঁড়িতে খুঁড়িতে, যাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই, কনিষ্কের একটি পাথরের মূর্ত্তি আনিয়াছেন।

ইহাদের পর লক্ষ্ণৌ Museum, একেবারে ওয়াজিদ আলিসার মহলগুলির মাঝখানে, আর সেই মহলের সঙ্গে ঠিক সাবুদ করা। বাড়ীটি ছবিখানির মত, বহুকাল হইতে খৃষ্টীয় তিনশত বৎসর পর্য্যন্ত দ্রোণের রাজধানী অহিচ্ছত্র ব্রাহ্মণদের একটা প্রধান জায়গা ছিল। বহুকাল হইতে অহিচ্ছত্রাগত ব্রাহ্মণের বড়ই আদর ছিল। সেই অহিচ্ছত্র হইতে চৌদ্দ হাজার কাজ করা পাথর লক্ষ্ণৌ Museumএ আসিয়াছে। শ্রাবস্তী এক কালে কোশল দেশের রাজধানী ছিল এখন নিবিড় জঙ্গল। শ্রাবস্তী খুঁড়িয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাও লক্ষ্ণৌ Museum এ আছে। কাশী হইতেও অনেক জিনিস লক্ষ্ণৌ Museumএ আসিয়াছে। লক্ষ্ণৌ Museum এর দরজার সামনে প্রকাণ্ড পাথরের ঘোড়া, সে ঘোড়াটি সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধের ঘোড়ার প্রতিমূর্ত্তি।

ইহার পর সারনাথ Museum। গত দশ বার বৎসর সারনাথ খুঁড়িয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে সব এইখানে আছে। সারনাথে বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করান, সুতরাং সেটি বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ; তাহার উপর আবার হিন্দুদের বারাণসীর নিকটে, গঙ্গা হইতেও বেশী দূর নয়, সেখানে অনেক বৌদ্ধ বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের স্থানটি Museum হইতে অল্পদূরে। সেই খানে একটি অশোকস্তম্ভ ছিল, তাহার মাথায় চারিটি সিংহ আছে, বোধ হয় যেন তাহারা জীবন্ত। স্বয়ং মার্সাল সাহেব সারনাথ খুঁড়িয়াছিলেন। মাটি খুঁড়িয়া প্রাচীন ইতিহাসের প্রমাণ বাহির করিতে মার্সাল সাহেব দক্ষ—বৃহস্পতি। Museumএর পার্শ্বে থাকে একটা প্রকাণ্ড স্তূপ এখনও ১০০ ফিটের উপর উচ্চ।

রঙ্গপুরে এখন যে Museum খোলা হইতেছে ইহারও উদ্দেশ্য বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের মাল-মসলা সংগ্রহ করা। রঙ্গপুর বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। বরেন্দ্র ভূমি এক কালে ভাস্করকার্য্যের জন্য সমস্ত ভারতবর্ষে বিখ্যাত হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তে অনেক শিলাপত্র বারেন্দ্র শিল্পির দ্বারা খোদিত। ধাতুকার্য্যে বারেন্দ্রশিল্পি যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছে। রঙ্গপুরের অদূরে মহাস্থান গড়, বল্লালের সময়ে একটা প্রধান তীর্থ স্থান ছিল, কেহ কেহ বলেন উহাই পৌণ্ডবর্দ্ধন, তাহা হইলে উহা একটি অতি প্রাচীন স্থান। অশোক রাজা তাঁহার একটি ভাইকে এইখানে রাখিয়াছিলেন। এই Museum এখন মাল মসলা সংগ্রহ করিয়া দেখান যে মহাস্থান পৌণ্ডবর্দ্ধন কিনা। মহাস্থান গড়ে যে সকল দেবমূর্ত্তি পাওয়া যায় সব এই খানেই রাখা হউক। কামতাপুরও রঙ্গপুর জেলার নিকট উহাও এক কালে উত্তরবঙ্গের একটি প্রধান রাজ্যের রাজধানী ছিল। সেখান হইতে অনেক মাল-মসলা সংগ্রহ হইবে। ঘোড়াঘাট আর একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান, সেখান হইতেও অনেক মাল-মসলা সংগ্রহ হইতে পারিবে।

রাজসাহীতে Museum করিয়া বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন ইঁহারাও সেই পথে চলুন এবং আপনাদের ইতিহাস উদ্ধার করুন।

রঙ্গপুরের আর একটা সুবিধা আছে, এরূপ সুবিধা বাঙ্গালার আর কোথাও নাই। রঙ্গপুর বাঙ্গালার সীমান্তপ্রদেশ, ইহার ওপারেই এক কালে নিবিড় জঙ্গল ছিল, তথায় নানা জাতি অসভ্য লোক বাস করিত। অনেকে এখন সভ্য হইয়াছে আর অনেকে এখনও বনে বাস করে। উহাদের ইতিহাস সংগ্রহ করা, উহারা কি খাইত কি করিত, কিরূপ ঘরে বাস করিত কিরূপে শীকার করিত, কিরূপে কৃষিকার্য্য করিত এ সকল সংগ্রহ করা রঙ্গপুর Museum এর একটা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাহা হইলে রঙ্গপুর-মিউসিয়ম যে কেবল ইতিহাসেরই উন্নতি করিবে এমন নহে, Anthropology বা মানব তত্ত্বেরও অনেক সহায়তা করিতে পারিবে। আপনারা আমাকে এই মিউসিয়মযজ্ঞের পৌরোহিত্যপদে বরণ করিয়াছেন, আমি বলি "অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু"।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বনমালদেবের তাম্রশাসন

ৎস্বস্তি শ্রীমান্ প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপান্বয়ো
মহারাজাধিরাজ শ্রীবনমাল বর্ম্মদেবঃ।*

স্বস্তি।† শ্রীমৎ কৈলাসভূভৃৎ পৃথুকনকশিলাসঞ্চয়াস্ফালনোত্থৈ (১)
রাসারৈর্হৈমপঙ্কাবিল(২) তুহিনকরৈঃ সিক্তবৈমানি(৩)সার্থঃ।
অন্তঃক্রীড়ৎ(৪) (সুভূষ) (৫) প্রবর সুরবধূ কেশহস্তচ্যুতৈর্ব্বো
নাকেশক্রপ্রসূনৈ রক্নণিতসলিলোঽব্যাৎ স লৌহিত্যসিন্ধুঃ ॥১
স পুনাতু পিনাকী বো যচ্ছীর্ষে স্বর্ধুনীজলম্(৬)।
কীর্ণং রেচকবাতেন তারকাপ্রকরায়িতম্ ॥২
নরক ইতি সুনুরাসী(৭)দাদি বরাহস্য ভুবি তদুদ্ধারে।
অদিতেঃ কুণ্ডলহরণে প্রতাপমপি যো হরেরহরৎ ॥৩
কৃষ্ণেণ তং নিহত্য চ সৃষ্টৌ ভগদত্তবজ্রদত্তাখ্যৌ(৮)।
তস্য সুতৌ তদ্বনিতাকরুণবিলাপহতহৃতহৃদয়েণ ॥৪

---

* ইহা স্পষ্টতঃ হাতিমার্কা সিল-মোহরের পাঠ। (চিত্র দ্রষ্টব্য) এই পাঠে 'ৎ' এই প্রাথমিক চিহ্নটি ছিল না।

† সোসাইটির পত্রিকার মুদ্রিত পাঠে পদ্যোচিত পংক্তি বিভাগ নাই; অথচ মুদ্রিত পংক্তি যে শাসনের পংক্তির অনুরূপ তাহাও নহে। শ্লোকসংখ্যা মূল শাসনে অবশ্যই ছিল না, পত্রিকার পাঠে আছে। কিন্তু এই সংখ্যার ৮ম শ্লোকের পরে বহু গোল আছে, অনাবশ্যক বিধায় তাহা প্রদর্শিত হইল না।

১। পণ্ডিত কমলাকান্তের পাঠ "সংগমান্দোলনোত্থৈ"। কিন্তু প্রথম শ্লোকার্দ্ধের যে চিত্র আছে তাহাতে ''নোত্থৈ" স্থলে যেন "প্রোত্থৈ" আছে দেখা যায়।

(২) ক-পাঠ (অর্থাৎ পণ্ডিত কমলাকান্তের পাঠ) পং কা বিল।

(৩) ক-পাঠ 'বৈশারি'। চিত্রে 'শ' ও 'র' স্থানে স্পষ্ট 'ম' ও 'ন' দেখা যায়। কিন্তু 'বৈ' স্থলে 'তৈ'ও যে না হইতে পারে এমন নয়; কিন্তু 'তৈমানি'র কোনও অর্থ হয় না। 'বৈমানি'র অর্থও কষ্টকল্পিত; (বিমান—স্বার্থে ক, ততঃ ইন্)

(৪) মূলে নাকি 'ক্রীরৎ' ছিল,—পণ্ডিত কমলাকান্ত লিখিয়াছেন "এতন্মধ্যে সর্ব্বত্র ড-কারস্থানে রেফঃ তদ্দেশীয়ানাং ডকারোচ্চারণ সামর্থ্যাভাবাৎ যথোচ্চারণং তথা লিখনং।" (কমলাকান্ত বোধ হয় বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত ছিলেন)।

(৫) এই তিন অক্ষর পণ্ডিত কমলাকান্তের যোজনা; তিনি লিখিয়াছেন, "অন্তঃক্রীরৎ ইত্যুত্তরং অক্ষরত্রয়ং নাস্তি তত্র সুভূষেতি ময়া পূরিতম্।" তথাস্তু।

(৬) প্রায়শঃ অন্তে অনুস্বার আছে, তৎস্থলে সর্ব্বত্র 'ম্' করিয়া দেওয়া হইল।

(৭) সোসাইটির পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে, 'বাসী' স্পষ্টই হাতের লেখার 'র' এর বিন্দু-লোপ ঘটিয়াছিল।

(৮) সোসাইটির পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে 'সৃষ্টৌ ভগবত্ত বজ্রদত্তাখ্যো'।

সংপ্রাপ্তে ভগদত্তে শ্রীমৎপ্রাগ্জ্যোতিষাধিনাথত্বম্।
বিনয়ভরোপি তদেত্য প্রারাধয়দীশ্বরং তপসা ॥৫
তুষ্টেন তেন তস্মৈ দত্তং (১) সুপরিপস্তনাধিনাথত্বম্।
প্রাগ্জ্যোতিষাধিরাজ্যং কালেন তদন্বয়স্যাপি(২) ॥৬
তস্যান্বয়েভূৎ ক্ষিতিপালমৌলিমাণিক্যরোচিঃস্ফুরিতাঙ্ঘ্রিপীঠঃ(৩)।
প্রাগ্জ্যোতিষেশঃ ক্ষতবৈরিবীরঃ প্রালম্ভ ইত্যদ্ভুতনামধেয়ঃ ॥৭
স পূর্ব্বনৃপতিগুণসম্বন্ধোঘরাগানুরঞ্জিত(৪) দিগন্তঃ।
সালস্তম্ব(৫) প্রমুখৈঃ শ্রীহরিষান্তৈর্ম্মহীপালৈঃ ॥৮
দিবমারূঢ়বান্‌যস্য ভূভুজোথৈকোবৈরিবীরোভূৎ।
ভ্রাতা শৌর্য্যত্যাগৈ রসমানান্নারথোতি নৃপঃ ॥(৬) ৯
শ্রীজীবদেতি সংজ্ঞা রাজ্ঞী হৃদয়ানুগাভবত্তস্য।
বহুজনবন্দ্যা মহতঃ প্রভাতসন্ধ্যেব(৭) তেজসো জননী ॥.•
তস্যাস্তস্য(৮) তু রাজ্ঞঃসুতোভবন্নৃপশিরোর্চ্চিতাঙ্ঘ্রিযুগঃ(৯)।
শ্রীহর্জরোনৃপেন্দ্রঃ শ্রিয়া স্বয়ং যঃ সমুপগূঢ়ঃ(১০) ॥১১
ধর্ম্মপ্রবাদেষু যুধিষ্ঠিরো যো ভীমোরিবর্গে সমরে চ জিষ্ণুঃ।
একোপ্যনেকৈরিতিসঙ্গতো(১১) যো নিঃশেষকর্ম্মীতনয়ত্বমেতঃ ॥১২
গোপীজনানন্দিতমানসস্য দ্বেষ্যেব বক্ষঃ পরিহৃত্য বিষ্ণোঃ।
নিঃশেষরামাজনদেহসংস্থ মাদায় সৌন্দর্য্যমিহাজগাম ॥১৩
বর্ণাস্তশেষগুণজাতময়স্বভার পত্ন্যুর্ম্মাতুলবলস্য রথাঙ্গ(১২) পাণেঃ
তেনাহমগ্র্যমহিষী জগতীভুজোস্য ভূতা জনেন খলু লাঘবমভ্যুপৈমি।

(১) সো-প (অর্থাৎ সোসাইটির পত্রিকায় আছে) 'দত্তে'। পণ্ডিত কমলাকান্ত কখনও এতাদৃশ ভুল করেন নাই। অতএব ইহা ক-পাঠ নহে।

(২) সো-প 'নদন্বয়'। (৩) ক-পাঠ 'স্ফুরিতাংঘ্রিপীঠঃ'। (৪) ক-পাঠ 'রংজিত'।

(৫) বলবর্ম্মার ও রত্নপালের তাম্রশাসনে আছে "সালস্তম্ভ"।

(৬) এই শ্লোকটি সম্বন্ধে প্রবন্ধাংশে বিস্তর আলোচনা করা হইয়াছে। পণ্ডিত কমলাকান্ত পড়িয়াছিলেন

দিবমারূঢ়েবাস্মস্ত ভূভুজোর্থে কবৈরিবীরোভুৎ।
ভ্রাতা শৌর্য্যত্যাগৈ রসম্মানান্নারথোতিনৃপঃ।

এই শ্লোক ও তৎপূর্ব্বশ্লোক একত্র অন্বয় করা হইয়াছিল, তাই পূর্ব্বশ্লোকে পাদার্দ্ধচ্ছেদক কোনও চিহ্ন মুদ্রিত পাঠে দেওয়া হয় নাই। এই শ্লোকসংখ্যায় গলদ আছে। কিন্তু ইংরাজী অনুবাদে শ্লোকসংখ্যা ঠিকই দেখা যায়—কেবল ২৭, ২৮ ও ২৯ স্থলে যথাক্রমে ২৮, ২৯ ও ৩০ আছে।

(৭) এখানে সোসাইটির মুদ্রিত পাঠে একটি দাঁড়ি নিরর্থক আছে।

(৮) ক-পাঠ 'তস্তাস্তস্ত'। (৯) ক-পাঠ 'তাংঘ্রিযুগঃ'।

(১০) ক-পাঠ 'হর্জরো'। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই পাঠে ছন্দঃপাত হয় তথাপি পণ্ডিত পাঠক বিশুদ্ধপাঠ ধরিতে পারেন নাই।

(১১) ক-পাঠ 'সংগতো'। (১২) ক-পাঠ 'রথাংগ'।

ইতি যস্য মহাদেবী বিলোচ্য(১) মনোনুগা ভবল্লক্ষ্মীঃ।
শ্রীমত্তারাভিধানা প্রমদারত্নোত্তমা নৃপতেঃ॥১৫
তস্যাশেষক্ষিতিপমুকুটোদ্‌ঘৃষ্টপাদাব্জপীঠ
স্যাভূৎ সূনুর্নৃপগুণ মহারত্নমালাবিভূষঃ।
তস্যাং দেব্যামখিলভুবনানন্দকো যঃ শশীব
শ্রীমান্ খ্যাতো জগতি বনমালাভিধানঃ ক্ষিতীশঃ॥১৬
জলনিধিতটবনমালাসীমাবধি মেদিনীপতিত্বস্য।
যোগ্য ইতি নাম ধাতা চক্রে বনমাল ইতি যস্য॥১৭
প্রবলারাতিমত্তেভঘটাধ্বান্তোরুসংহতিম্(২)।
দিবাকরায়িতং যেন বিদার্য্য রণভূমিগাম্॥১৮
ক্ষিতিতনয়নৃপতিবংশপ্রভবনরেন্দ্রামলাম্বরে যেন।
স্ফুটমেব মৃগাঙ্কায়িত(৩) মত্যুগ্রারাতিতিমিরৌঘম্॥১৯
ভূরিদৃপ্তরিপুবীরবাহিনীশৈলবজ্র মুরুবিক্রমাসিনা।
যেন রাজকমশেষমস্যতা শ্রীরকারিচিরমেকভর্ত্তৃকা॥২০
যস্য প্রতাপভীত্যা বহুরিপুজয়িনোপি মেদিনীপালা
কেচিদ্দিশো বিজগৃহুঃ(৪) প্রসভ মালম্বাম্বরাণ্যন্যে॥২১
রাজ্ঞামন্যেষাং যে নিশিতানাজ্ঞাবিমূন্নৃপা মুমুচুঃ।
যস্মাত্ততো বিভীত্যা ভূমিং দূরং নিজাং তে বিজহুঃ॥২২
বৈরভিমুখং রিপূণা মাঘটিতং মত্তকরিঘটাটোপৈঃ।
বিক্রমৈকহেতোস্তে র্যস্যাঞ্জলয়ঃ কৃতাঃ ক্ষিতিপৈঃ॥২৩

কা হা*

ধূরুহে(৫) নহুষস্য যেন পতিতং কালান্তরাদালয়ং
সৌধং ভক্তিনতা(৬)খিলামরবর ব্রাতার্চিতাঙ্ঘ্রেঃ(৭) পুনঃ।
প্রালেয়াচলশৃঙ্গতুঙ্গমতুল গ্রামেভবেশ্মাজনৈ
র্যুক্তং হাটক(৮) শূলিনঃ ক্ষিতিভুজা ভক্ত্যা নবং চক্রুষা(৯)॥২৪

---

(১) ক-পাঠ 'বিলোক্য' (২) ক-পাঠ 'সংহতিং'।

(৩) ক-পাঠ 'মৃগাংকায়িত'। উপমানাদাচারে কর্ত্তুঃক্যঙ্ (পাণিনি ৩।১।১০-১১) দ্বারা ইহা এবং পূর্ব্বশ্লোকস্থ 'দিবাকরায়িতং' সিদ্ধ হইয়াছে। (৪) সো-প 'বিজগ্রহুঃ'।

* 'কাহা' এই অক্ষরদ্বয় একটি পংক্তি অধিকার করিয়া রহিয়াছে; বোধ হয় মূল শাসনের একখানি ফলকের উপরিভাগে লিখিত কোনও পতিত অক্ষরদ্বয়ের বোধক। কিন্তু পণ্ডিত কমলাকান্ত এমনই পাঠ করিয়াছেন যে শাসনের কুত্রাপি 'কা' বা 'হা' বা 'কাহা' আকাঙ্ক্ষিত দেখা যায় না।

(৫) সো প 'ধূরুহে'। (৬) সো প 'নবা'। (৭) ক-পাঠ 'তাং ঘ্রেঃ'।

(৮) ক-পাঠ 'হেতুক'। প্রবন্ধে এতৎসম্বন্ধে আলোচনা আছে। (৯) সো প 'চক্রুষা'।

যস্যানন্তদ্যুতিমতিসিতা নাগলোকে হসন্তী
দিঙ্‌নাগানাং শ্বসিতজনিতাং শীকরালীঞ্চ দিক্ষু(১)
সম্পূর্ণে(২)(ন্দো)র্বিয়তিবিমলামংশুমালাং বিচিত্রাং
রাজ্ঞোনল্পা বিচরতিতরাং কীর্ত্তিরস্থাপ্যজস্রম্‌ ।২৫
সত্যগাম্ভীর্য্যতুঙ্গত্ব প্রতাপত্যাগবিক্রমৈঃ ।
যোজয়দ্ধর্ম(৩)জাব্ধ্যদ্রিভানুকর্ণমরুৎসুতান্‌ ॥২৬
যস্য যশঃ শশিনেদং ভুবনং ধবলীকৃতং বিলোক্য দৃশা
সব্রীড়(৪) ইবোদেতি প্রালেয়মরীচিরস্থাপি ॥২৭
দেবাগারং বাদ্যগীত প্রণাদৈর্নানারামাস্(৫) সত্রিণাং ব্যাহৃতৌ চ ।
গায়ন্ত্যত্রাপ্যপ্সরম্যাঃ সুরাপ্যো(৬) দেশে দেশে শালিনীং যস্য কীর্ত্তিম্‌ ॥২৮
বহুহেমরৌপ্যগজবাজিমহীপ্রমদাদিরত্ননিচয়ং বহুশঃ ।
প্রদদাদবার(৭)মনিশং নিগদাৎ(৮) প্রমিতাক্ষরোপি বহুবাগভবৎ ॥২৯

প্রপ্রীতসমস্তবর্ণাশ্রমাদপরিমিতসুভগ(৯)সাধুবিদ্বজ্জনাধিষ্ঠানাদ্বিচিত্রগজতুরগশিবিকাভিরূঢ়ৈর্মহানরপতিভিরবনিপতিসেবার্থং গচ্ছদ্ভিঃ প্রত্যাগচ্ছদ্ভিশ্চ সঙ্কুলমহারাজমার্গাদ(১০)-সংখ্য গজতুরগপদাতিসাধননিরন্তরনিরুদ্ধসকলদিগন্তরা(১১)হৃদয়বেলাচলোত্থিতোত্তুঙ্গতরুশরণ(১২)বিশ্রান্তমত্ত-বর্হিণকেকারবোদ্ভ্রান্তভুজগব্রাতমুক্তফুৎকারপ্রকম্পিতানেকতরু(১৩) বিগলিতকুসুমনিকরপরিমল(১৪)সুরভিসলিলেন তদুপবনলগ্নদাবানলদহ্যমানকালাগুরুধূমসন্তবাম্বুধরবৃন্দসুগন্ধিজলৌঘ-প্রবাহিণা(১৫) উদয়তটমহীধরোপবনগন্ধিপর্ণাঙ্কুরভুজাং কচিৎ(১৬) স্বয়ং ভূতানামন্যত্রপ্রণয়বদ্ধকুলযূথানামপরত্র সত্ত্ব(১৭)বিনিহতাদভ্রভক্ষিত(১৮) মাংসোজ্ঝিতানাং কস্তূরিকামৃগাণাং মদগন্ধে-নামোদিতসকলতীরোপকণ্ঠনিবাসিজনপদেন সকলসুরাসুরমুকুটমণিময়ূখমঞ্জরীরঞ্জিত(১৯)চরণ-পীঠাভ্যাং শ্রীকামেশ্বরমহাগৌরীভট্টারিকাভ্যামধিষ্ঠিতশিরসঃ কামকূটগিরেঃ সততনিতম্বস্খাল-নাদধিকতরপবিত্রপয়ঃসম্পূর্ণস্রোতসা মজ্জদ্বিলাসিনীকুচকলশতটাশ্লিষ্টমদপঙ্কা(২০)বিলসুগন্ধাম্ভসা

(১) ক-পাঠ (ও সোপা) 'রালীংচদিক্ষ'। (২) ক-পাঠ 'সংপূর্ণে'। (৩) সো প 'জয়দ্ধম'।
(৪) মূলে ছিল 'সব্রীর'।—প্রথমাংশে 'ব্রীড়ৎ' শব্দের ফুটনোট দ্রষ্টব্য। (৫) ক-পাঠ 'রামান্‌'।
(৬) ক পাঠ 'খবাপ্যো'। (৭) সো প 'প্রদদবার'। (৮) ক-পাঠ 'নিগদং'।
(৯) ক-পাঠ 'শুভগ'। (১০) ক-পাঠ (ও সো প) 'সম্বলং মহারাজ মাগার'।
(১১) সো প 'দিগন্তরা'। এই পর্য্যন্ত পঞ্চম্যন্ত পদগুলি বহু পরবর্ত্তী "হারূপেশ্বরাৎ" এর বিশেষণ। পণ্ডিত কমলাকান্ত অশুদ্ধ পাঠহেতুক এইটা ধরিতে পারেন নাই।
(১২) ক-পাঠ 'শকুন'। (১৩) সো প 'অনেকতা'। (১৪) সো প 'পরিমন্ত'।
(১৫) এই স্থলে এবং তৎপর কোনও কোনও স্থলে বৃথা '।' এইরূপ ছেদ আছে, তাহা পরিত্যক্ত হইল।
(১৬) ক-পাঠ (ও সো প) পূর্ণাং কুরভুজাং ক্বচিৎ। (১৭) ক-পাঠ (ও সো প) 'ত্বগনংৰ'।
(১৮) ক-পাঠ 'ভাদভক্ষিত'। (১৯) ক-পাঠ 'মংজরীরংজিত'। (২০) ক-পাঠ 'পংকা'।

বেষাঙ্গণা(১)ভিরিব নানাভরণশোভিতপ্রকটাবয়বাভির্বালকুমারিকাভিরিব কণৎকিঙ্কিণীভিঃ(২) কার্ণাটীভিরিব কঠিনাভিঘাতসংবর্দ্ধিত(৩)বেগাভির্ব্বারস্ত্রীভিরিব চামরধারিণীভি র্দশবদনান্তঃ-পুরিকাভিরিব রুষিত(৪)সন্ততদশনাভিঃ পবনকামিনীভিরিবাত্যন্তবেগবতীভিঃ রমণীয়দ-লুহাঙ্গনাভি(৫)রিব সকলজনমনোহারিণীভি র্নটীভিরিব নর্ত্তকপুরুষাক্রমণসংবর্দ্ধিতোৎ(৬)-কম্পাভি র্দুর্গতদেবপালিভিরিব সততোত্তানস্থানকামিনীভি র্নৌভি(৭)রলঙ্কৃতোভয়তীরোপান্ত-দেশেন শ্রীলোহিত্যভট্টারকেণ সনাথশ্রীহারুপ্পেশ্বরাৎ (৮)স পরমমাহেশ্বরো মাতাপিতৃপদানুধ্যাত-পরমেশ্বরপরায়ণচিত্তকো মহারাজাধিরাজ শ্রীবনমালদেবঃ কুশলী ।*

বভূব শাণ্ডিল্যকুলপ্রদীপো বেদার্থবিদ্ভিজ্জট নামধেয়ঃ ।
সাঙ্গং(৯)যজুর্ব্বেদ মধীতবান্ যস্ত্যাগীশুচির্দ্দেবগুণোপপন্নঃ(১০) ॥১
শৌচবিপ্রগুণো(১১)পেতা পত্নী সব্রায়িকাভিধা ।
ব্রাহ্ম্যেণ বিধিনা সম্যক্ পরিণীতা কুলোদ্ভবা ॥২
সূনুস্তয়োর্বেদবিদগ্রজন্মা ইন্দোকনামা গুণবান্ বরিষ্ঠঃ ।
তস্মৈ দদৌ শ্রীবনমালদেবো গ্রামং স মাতাপিতৃপুণ্যহেতোঃ ॥৩
ত্রিস্রোতায়াঃ পশ্চিমতঃ সজলস্থলসংযুতম্ ।
অভিশূরবাটকাখ্যমষ্টসীমাপরিচ্ছদম্(১২) ॥৪

পূর্ব্বেণ দশলাঙ্গল(১৩)সহ(১৪)সীমা পূর্ব্বদক্ষিণেন চন্দ্রপরিসসীমা দক্ষিণেন অবারিসহ-সীমা। দক্ষিণপশ্চিমেন পুষ্করিণীসহসীমা পশ্চিমেন নৌকুবাসহসীমা ॥(১৫) উত্তরপূর্ব্বেণ দশলাঙ্গল(১৬)সহ সীমা অষ্টৌ সীমাপরিচ্ছদাঃ(১৭) ॥ সংবৎ(১৮)১৯ ছমিকাকছি(১৯) ॥

(৯ এবং চিহ্ন তত্র (২০)

(১) ক পাঠ 'বেণাঙ্গণা'। (২) ক প 'কিংকিণী'।
(৩) ক পাঠ 'সম্বদ্ধিত'। (৪) ক পাঠ 'রুষিত'।
(৫) ক পাঠ 'দলুহাংগনা'। (৬) ক পাঠ 'সম্বদ্ধিত'।
(৭) এই শব্দটি সোসাইটির মুদ্রিত পাঠে পড়িয়া গিয়াছিল। প্রবন্ধে এ বিষয়ের আলোচনা আছে।
(৮) ক পাঠ 'হরুয়ে শনাৎ'। প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। (৯) ক পাঠ 'সাংগ'।
(১০) এই শ্লোকের এবং পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোকের সোসাইটি মুদ্রিত পাঠে সংখ্যা দেওয়া হয় নাই।
(১১) সো প 'গণো'।
(১২) সো প 'পরিছদং'। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের 'চ্ছ' লিখিবার কায়দাই ঈদৃশ ছিল যে অনভিজ্ঞেরা ছ পড়িবে।
(১৩) ক পাঠ 'লাংগল'।
(১৪) ক পাঠ 'সন্ত'। প্রবন্ধে এতৎসম্বন্ধে আলোচনা আছে। এইরূপ অন্যান্য স্থলেও 'সহসীমা' স্থলে 'সন্তসীমা' আছে।
(১৫) এস্থলে পশ্চিমোত্তরেণ এবং উত্তরেণ এই দুই সীমা পড়িয়া গিয়াছে। তজ্জন্য পণ্ডিত কমলাকান্ত দায়ী কি না বলা যায় না। মূল শাসনেও ভুলচুক থাকিতে পারে।
(১৬) ক পাঠ 'লাংগল'। (১৭) সো প 'পরিছদাঃ'। (১৮) ক পাঠ 'সম্বৎ'।
(১৯) এই সকল অক্ষরও বোধ হয় পূর্ব্বের 'কাহা'র ন্যায় কলক মধ্যে পরিভ্রষ্ট অক্ষর।
(২০) এই টুকু বোধ হয় পণ্ডিত কমলাকান্তের নিজস্ব টিপ্পনী; ইহা সংবতের অঙ্গসম্বন্ধীয় হইবে।

বনমালদেবের তাম্রশাসন

বঙ্গানুবাদ *

স্বস্তি প্রাগ্‌জ্যোতিষাধীশ্বর বংশজ শ্রীমান্ মহারাজাধিরাজ শ্রীবনমালবর্ম্মদেব (১) স্বস্তি। শ্রীমৎ কৈলাসপর্ব্বতের প্রকাণ্ড স্বর্ণময় শিলারাশির সংঘর্ষজাত এবং হেমপঙ্কমিশ্রিত তুহিনকরসন্নিভ ধারাসম্পাত দ্বারা বিমানচারীদিগকে যিনি সিক্ত করিতেছেন, যাঁহার সলিলরাশি জলক্রীড়ানিরত শ্রেষ্ঠসুরাঙ্গনাদিগের কেশ ও হস্ত হইতে প্রভ্রষ্ট সুরবরতরু-কুসুম দ্বারা আরক্ত হইতেছে, সেই লৌহিত্যনদ তোমাদিগকে পালন করুন(২)।

পিনাকধারী মহাদেব তোমাদিগকে পবিত্র করুন—যাঁহার শিরস্থিত গঙ্গাজল রেচকবায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া তারকাপ্রকরের ন্যায় শোভিত হইতেছে॥ ২

বরাহ কর্ত্তৃক পৃথিবীর উদ্ধার সময়ে তাঁহাতে নরক নামক পুত্র জাত হন—যিনি অদিতির কুণ্ডল হরণ দ্বারা ইন্দ্রের প্রতাপও হরণ করিয়াছিলেন(৩)॥ ৩

কৃষ্ণ তাঁহাকে নিহত করিয়া তদীয় বনিতার করুণবিলাপে সম্যক্ বিচলিতচিত্ত হইয়া ভগদত্ত ও বজ্রদত্ত নামে তাঁহার দুইটি পুত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন॥৪

বিনয়সম্পন্ন ভগদত্ত শ্রীসম্পন্ন প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপত্য লাভ করিলেও তাহাতে আগমন করিয়া তপশ্চরণ দ্বারা মহাদেবকে(৪) আরাধনা করিয়াছিলেন।৫

তিনি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সুপরিপত্তনের(৫) আধিপত্য(৩) দিয়াছিলেন এবং যাহাতে

---

* অনেক স্থলেই পণ্ডিত কমলাকান্তের পাঠ সন্দিগ্ধ হওয়াতে অনুবাদও বহুস্থলে সুষ্ঠ অর্থবোধক হয় নাই।

(১) এইটুকু হাতিমার্কা সিলের লিপি। অতঃপর শাসন-লিপি।

(২) পশ্চাৎ পুনশ্চ লৌহিত্যের বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

(৩) এই কথা বলবর্ম্মার ও রত্নপালের তাম্রশাসনেও আছে। পণ্ডিত কমলাকান্ত ইহা শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৫৯ তম অধ্যায়ের যে একটি স্থলে অবান্তর ভাবে উল্লেখিত আছে তাহা দেখাইয়াছেন।

কিন্তু এই বিষয় কালিকাপুরাণে ৩৪শ অধ্যায়ে স্পষ্টই আছে:—

"দেবেশ্বরং ত্রিধা জিত্বা হয়গ্রীবসহায়বান্।
অদিত্যাঃ কুণ্ডলযুগং ত্রিষুলোকেষু বিশ্রুতম্।
* * * *
জহার নরকো ভৌমো নির্ভীকো মুনিশাপতঃ।"

(৪) অনুবাদক পণ্ডিত সারদাপ্রসাদ 'ঈশ্বর' অর্থে 'শ্রীকৃষ্ণ' বুঝিয়াছেন। "ঈশ্বরঃ সর্ব্ব ঈশানঃ শঙ্কর চন্দ্রশেখরঃ" এই অভিধান দ্বারা ঈশ্বর শব্দ মহাদেবেরই নামান্তর বুঝায়।

(৫) ইহার অর্থ বুঝা গেল না। প্রকৃত পাঠ যে কি, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

উত্তরকালে তাঁহার বংশীয়গণ প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিরাজত্ব করেন তাহারও বিধান করিয়াছিলেন।৬

তাঁহার বংশে অরাতিবীরগণের নিধনকারী প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর প্রালম্ভ এই অদ্ভুত-নামা নৃপতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন—যাঁহার পাদপীঠ নৃপতিগণের শিরঃস্থিত মাণিক্যপ্রভায় সমুদ্ভাসিত হইত।৭

সালস্তম্ভপ্রমুখ শ্রীহরিষ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী মহীপালগণের গুণসম্পর্কহেতুক তাঁহা দ্বারা দিগন্ত অনুরঞ্জিত হইয়াছিল।৮

যে রাজার অতিনৃপ বৈরিবীর ভ্রাতা একাকী অসমানহেতু শৌর্য্যত্যাগ না করিয়া রথ পরিত্যাগ না করিয়াও স্বর্গজয়ী হইয়াছিলেন(১)।৯

শ্রীজীবদা ইতিনামা তাঁহার মনোজ্ঞা রাজ্ঞী ছিলেন যিনি প্রভাত-সন্ধ্যার ন্যায় বহুজনের বন্দনীয়া এবং তেজস্বীর(২)জনয়িত্রী ছিলেন।১০

তাঁহাতে সেই রাজার পুত্র নৃপেন্দ্র হর্জ্জর জাত হইয়াছিলেন—যাঁহার অঙ্ঘ্রিযুগল রাজ-গণের মস্তক দ্বারা অর্চ্চিত হইত এবং যিনি স্বয়ং লক্ষ্মী দ্বারা সমালিঙ্গিত হইয়াছিলেন।১১

যিনি ধর্ম্মপ্রবাদে যুধিষ্ঠির, রিপুগণ মধ্যে ভীম, যুদ্ধে জিষ্ণু(৩) ছিলেন। অতএব একাকী হইয়াও যিনি অনেকের সহিত সঙ্গত হইয়া অশেষরূপে নীতিপ্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১২

যাঁহার মানস গোপীজন দ্বারা আনন্দিত সেই বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক লক্ষ্মী স্বেচ্ছায় ন্যায় সমস্ত নারীজনশরীরস্থ সৌন্দর্য্যসম্ভার গ্রহণপূর্ব্বক এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন।১৩

'ইনি মদীয় অতুলবল পতি চক্রপাণির বর্ণাদি(৪) অশেষ গুণজাত ধারণ করেন, তাই আমি এই রাজার প্রধানা মহিষী হইয়াছি—যদিও ইহাতে লোকের নিকটে আমি লঘুত্ব প্রাপ্ত হইতেছি।১৪

এইরূপ আলোচনা করিয়া লক্ষ্মী সেই নরপতির নারীরত্নশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী তারা নামে মনোরমা প্রধান মহিষী হইয়াছিলেন।১৫

যাঁহার পাদপদ্মপীঠ অশেষ ভূপতিগণের মুকুট দ্বারা ঘৃষ্ট হইত সেই রাজার ঐ মহিষীর গর্ভে বনমালসংজ্ঞক জগদ্বিখ্যাত ক্ষিতিপতি শ্রীমান্ পুত্র জাত হইয়াছিলেন। যিনি রাজ-

---

(১) বোধ হয় প্রালম্ভের ভ্রাতা একাকী বহু শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রণে ভঙ্গ না দিয়া বীরের গতি লাভ করিয়াছিলেন।

(২) তেজস্বী—পুত্র এবং সূর্য্য উভয়ার্থক।

(৩) "যুধিষ্ঠির" "ভীম" ও "জিষ্ণু" এই শব্দত্রিতয়ে শ্লেষ আছে।

(৪) রাজা হর্জ্জর কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, বোধ হয়। অবশ্য, "হারী হিরণ্ময়বপুধৃতশঙ্খ-চক্রঃ" বলিয়া শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান আছে বটে; কিন্তু পূর্ব্ব শ্লোকে "গোপীজনানন্দিতমানস" বিশেষণযুক্ত বিষ্ণু দ্বারা 'শ্রীকৃষ্ণ'ই যে উদ্দিষ্ট তাহা বুঝা যাইতেছে।

গুণাবলীরূপ মহারত্নমালা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া চন্দ্রের ন্যায় অখিল জগতের আনন্দকারী হইয়াছিলেন।১৬

এই ব্যক্তি সমুদ্রতটবর্ত্তী বনমালার সীমাপর্য্যন্ত পৃথিবীপতিত্বের যোগ্য, তাই পিতা যাঁহার 'বনমাল' এই নাম করিয়াছেন।১৭

সমরক্ষেত্রস্থিত প্রবল শত্রুগণের মত্তগজঘটারূপ বিশালান্ধকারসংহতি বিদারণপূর্ব্বক যিনি দিবাকরের ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন।১৮

পৃথিবীপুত্র নরকরাজবংশজাত রাজগণরূপনির্ম্মলাকাশে যিনি অরাতিরূপ তিমিররাশি দূরীভূত করিয়া চন্দ্রের ন্যায় (শোভমান) হইয়াছেন।১৯

অতিশয় দর্পযুক্ত শত্রুবীরসেনারূপ পর্ব্বতের বজ্রস্বরূপ(১)রাজগণকে প্রবল পরাক্রান্ত অসিধর যিনি নিপাত করিয়া বহুকাল লক্ষ্মীকে একভর্ত্তৃকা করিয়া রাখিয়াছিলেন।২০

যাঁহার প্রতাপভয়ে বহুশত্রুবিজয়ী রাজগণও কেহ কেহ নানাদিকে পলায়নপর হইয়াছিলেন। অন্যেরা আকাশগৃহ অবলম্বন করিয়াছিলেন(২)। ১

অপর ভূপতিগণের মধ্যে যাঁহারা রণক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ শরক্ষেপ করিতেন, তাঁহারা যাঁহার ভয়ে নিজ ভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরে গমন করিয়াছিলেন।২২

যে সকল ভূপতি মদমত্তমাতঙ্গশ্রেণী লইয়া সদর্পে শত্রুগণের অভিমুখে যাইতেন তাঁহারা বিক্রমৈকনিলয় যাঁহার কাছে অঞ্জলিবন্ধন করিতেন। ৩

দেবগণ যাঁহার চরণে ভক্তিভরে নত হইয়া থাকেন সেই হাটকেশ্বর মহাদেবের কালক্রমে ভূপতিত হিমালয়শৃঙ্গ সদৃশ উচ্চ এবং গ্রাম, প্রজা, হস্তী, বেশ্যা প্রভৃতি সমন্বিত সৌধগৃহ ভক্তিসহকারে নূতনভাবে পুনর্নির্ম্মিত করিয়া যিনি নহুষের (কীর্ত্তির) ভার লঘুকরিয়াছিলেন।২৪

যাঁহার অতিধবলা প্রভূতকীর্ত্তি নাগলোকে অনন্তমণিদ্যুতিকে, দিগ্‌মণ্ডলে দিঙ্‌নাগগণের নিঃশ্বাসরেচিত শীকর সমূহকে এবং আকাশে পূর্ণচন্দ্রের নির্ম্মল বিচিত্র অংশুমালাকে উপহাস করিয়া অদ্যাপি নিরন্তর সুষ্ঠু বিচরণ করিতেছে।২৫

সত্য, গাম্ভীর্য্য, তুঙ্গত্ব, প্রতাপ, ত্যাগ এবং পরাক্রম দ্বারা যিনি (যথাক্রমে) ধর্ম্মপুত্র (যুধিষ্ঠির) সমুদ্র, পর্ব্বত, সূর্য্য, কর্ণ এবং পবননন্দনকে (৩) পরাজয় করিয়াছিলেন।২৬

যাঁহার যশঃশশধর দ্বারা এই সংসার ধবলীকৃত হইতেছে(৪), স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া অদ্যাপি হিমাংশু ব্রীড়াগ্রস্তের ন্যায় উদিত হইতেছে।. ৭

---

(১) পরাজিতের উৎকর্ষ প্রদর্শন দ্বারা জেতার গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

(২) অর্থাৎ স্বর্গগামী হইয়াছিলেন।

(৩) এই পবননন্দন ভীম এবং হনুমান্ উভয়কেই বুঝাইতে পারে—কেননা উভয়েই প্রবল-পরাক্রমসম্পন্ন।

(৪) "যশসি ধবলতা বর্ণ্যতে হাসকীর্ত্ত্যোঃ"; তাই এই শ্লোকে—তথা ২৫শ শ্লোকে—ধবলতার এত বাড়াবাড়ি।

দেশে দেশে দেবালয় গীতবাদ্যধ্বনিদ্বারা নানাবিধ উদ্যান, যজ্ঞকারিগণের ব্যাহৃতিধ্বনিতে এবং পদ্মশোভিত সুন্দর বাপীসমূহ যাঁহার প্রশস্ত কীর্ত্তি অদ্যাপি ঘোষণা করিতেছে।২৮

(যিনি) বহুবার বহু স্বর্ণ রৌপ্য গজ বাজি ভূমি নারী প্রভৃতি রত্নসমূহ প্রদান করিয়াছেন এবং অবারিতভাবে অবিশ্রান্ত (দানবাক্য) কথন হেতু সংযতবাক্ হইয়াও বহুবাক্(১) হইয়াছেন।২৯

* যে নগরে সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমবাসিগণ পরম প্রীতিযুক্ত, যেখানে অসংখ্য গুণযুক্ত সাধু ও পণ্ডিতজনের অধিষ্ঠান, যাহার প্রশস্ত রাজপথগুলি রাজসেবার্থ যাতায়াতকারী নানাবিধ গজ বাজি শিবিকাধিরূঢ় বড় বড় নৃপতিগণের দ্বারা সমাকীর্ণ, যাহার দিগন্তর-সমূহ অসংখ্য গজ বাজি পদাতিরূপ সাধন দ্বারা অনবরত নিরুদ্ধ হইতেছে(২) —

যাহার সলিল উদয়বেলাচলস্থিত অতুচ্চ পাদপগৃহ-বিশ্রান্তমত্তময়ূরের কেকারবে উদ্‌ভ্রান্ত ভুজঙ্গ সমূহের ফুৎকার দ্বারা প্রকম্পিত বহু বৃক্ষ হইতে পতিত পুষ্পনিচয়ের পরিমল দ্বারা সুবাসিত হইয়াছে ; যাঁহার জলৌঘপ্রবাহ নগরোপবনসঙ্গতদাবানলে দহ্যমান কালাগুরুধূমজাত-মেঘবৃন্দকর্ত্তৃক সুগন্ধি হইয়াছে ; যাঁহার তীরোপকণ্ঠনিবাসী জনপদসমূহ ঐ সকল কস্তুরিকা-মৃগগণের মদগন্ধ দ্বারা আমোদিত হইয়াছে—যাহারা উদয়তট পর্ব্বতের উপবন সম্বন্ধে পর্নাঙ্কুর ভক্ষণ করিয়া থাকে, ও যাহারা কুত্রাপি স্বয়ং একাকী চরিয়া থাকে অন্যত্র প্রেমাস্পদ মিত্রগণ সহ দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে অপরত্র ব্যাঘ্রযূথকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া প্রচুর পরিমাণে ভুক্তমাংস হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে ; যাঁহার স্রোতঃসকল দেবাসুর-মুকুট-মণিপ্রভামঞ্জরী দ্বারা রঞ্জিতপাদপীঠ শ্রীকামেশ্বর দেব ও মহাগৌরীদেবী কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত-শিখর কামকূটপর্ব্বতের নিতম্বভাগ নিরন্তর ক্ষালন হেতুক সমধিক পবিত্রবারি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে ; যাঁহার সলিল কৃতাবগাহনা বিলাসিনীগণের কুচকলসোপরি ন্যস্ত মৃগমদ লেপ দ্বারা মলিনীকৃত ও সুরভিযুক্ত হইতেছে ; এবং যাঁহার উভয় তীরে সমস্ত স্থান বেশ্যাপল্লীস্থ নারীগণের ন্যায় নানালঙ্কারশোভিত প্রকটাবয়বা(৩)অল্পবয়স্কা কুমারীগণের ন্যায় শব্দায়মানকিঙ্কিণীযুক্তা, কর্ণাটাঙ্গনাগণের ন্যায় কঠিনাভিঘাত দ্বারা বর্দ্ধিতবেগা,

(১) "ব্রাহ্মী তু ভারতী ভাষা গীর্বাগ্ বাণী সরস্বতী"—তাই 'বাক্' এস্থলে 'ভাষা'র প্রতিশব্দ ধরিয়া, "বহুবাক্" অর্থ "বহুভাষাবিৎ" অর্থ করা যায়। পণ্ডিত শারদাপ্রসাদ তরজমা করিয়াছেন "of whom men speak much"

* এখানে গদ্য-রচনা আরম্ভ হইয়াছে। বহু সমাসবদ্ধ অথচ বহু বিষয়ের বর্ণনা একই বাক্য দ্বারা নিষ্পাদিত হওয়ায় ইহা এত জটিল হইয়াছে যে, অনুবাদে প্রাঞ্জলতা রক্ষা করা অসাধ্য।

(২) এই পর্য্যন্ত বাক্যগুলি বহুপরিবর্ত্তী 'হারুপেশ্বর' নগরের বিশেষণ। ইহার পর 'লৌহিত্যে'র বিশেষণ আরম্ভ হইল।

(৩) এই হইতে স্রোতস্বতীর বিশেষণ আরম্ভ হইয়াছে।

বারবনিতাগণের ন্যায় চামরযুক্তা, রাবণের অন্তঃপুরস্থা (রাক্ষসী) দের ন্যায় রক্তবর্ণবিস্তৃত-দশনসমন্বিতা; পবনরমণীগণের ন্যায় অত্যন্ত বেগবতী, দলুহাঙ্গনাগণের ন্যায়(১) সর্ব্বজন-মনোরমা, নটীগণের ন্যায় নর্ত্তকপুরুষাক্রমণ হেতু বর্দ্ধিতোৎকম্পা দুর্গত দেবশ্রেণীর ন্যায় সর্ব্বদা উচ্চস্থানাভিলাষিণী(২) নৌকাবলীর দ্বারা অলঙ্কৃত হইতেছে; ঈদৃশ লৌহিত্য-দেবসনাথ সেই হারূপেশ্বর (নগর) হইতে পরমমাহেশ্বর মাতাপিতার পদানুধ্যাত পরমেশ্বরা-সক্তচিত্ত কুশলী মহারাজাধিরাজ শ্রীবনমালদেব।*

শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের প্রদীপস্বরূপ বেদার্থবিৎ ভিজ্জটনামক দানশীল পবিত্র দেবোচিতগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন যিনি সাঙ্গ যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।১

বিশুদ্ধব্রাহ্মণগুণযুক্তা সভ্রায়িকানাম্নী সৎকুলসম্ভবা তদীয় পত্নী সম্যক্‌ব্রাহ্মবিধি অনুসারে পরিণীতা হইয়াছিলেন।২

তাঁহার পুত্র বেদবিৎ ইন্দোক নামক গুণী মহত্তম ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহাকে শ্রীবনমাল-দেব মাতাপিতার পুণ্যনিমিত্তে একটি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন—৩

উহা ত্রিস্রোতা নদীর পশ্চিমে জলস্থলসংযুক্ত অষ্টসীমাপরিচ্ছন্ন অভিশূরবাটক নামে (খ্যাত) ছিল।৪

পূর্ব্বে দশলাঙ্গলসহসীমা, পূর্ব্বদক্ষিণে চন্দ্রপরিসহসীমা, দক্ষিণে অবারিসহসীমা, দক্ষিণ-পশ্চিমে পুষ্করিণীসহসীমা পশ্চিমে নৌকুবাসহসীমা, উত্তরপূর্ব্বে দশলাঙ্গলসহসীমা—এই অষ্ট সীমাপরিচ্ছদ। সংবৎ ১৯

শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য (বিদ্যাবিনোদ, তত্ত্ব-সরস্বতী, এম্, এ।)

---

(১) পণ্ডিত শারদাপ্রসাদ 'দলুহা' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'a nation' (অর্থাৎ জাতিবিশেষ)।

(২) দেবতারা দুর্দ্দৈববশতঃ মর্ত্ত্যলোকে আসিলেও ভূমিতে তাঁহাদের পাদস্পর্শ হয় না; নৌকা গুলিও আরোহণের দ্বারা অবনমিত হইলেও ডুবিয়া না গিয়া জলোপরি ভাসিয়া থাকিত।

(১৮৪০ খৃষ্টাব্দের এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেল হইতে সংগৃহীত।)

আসাম তেজপুরে প্রাপ্ত বনমাল দেবের তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোকাঙ্ক ; সিল-মোহরের ছবি ও লিপি ; এবং শাসনে ব্যবহৃত অক্ষরের নমুনা।

বনমালদেবের তাম্রশাসন

(আলোচনা)

খ্রীষ্টীয় ১৮২৪ সনে আসাম প্রদেশ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন হয়। সুসভ্য বৃটিশ রাজকর্ম্মচারিগণ দেশের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানের নিমিত্ত পূর্ব্বাবধিই সচেষ্ট ছিলেন, নববিজিত আসাম প্রদেশ আবিষ্কৃত হইবার অব্যবহিত পরেই এই ভূভাগের নানাবিধ তথ্য বিষয়ক প্রবন্ধ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৪০ অব্দে এই আলোচ্য তাম্রশাসনখানিও উক্ত সোসাইটির পত্রিকায় ৭৬৬ পৃষ্ঠাবধি প্রকাশিত হয়।

তখন আসামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন মেজর (পশ্চাৎ জেনারেল) জেঙ্কিন্‌স্‌, তাঁহার উপাধি ছিল, "Agent to the Governor General, North Eastern Frontiers." গৌহাটীই তখন অবধি রাজধানী ছিল। তিনি এখানেই থাকিয়া আলোচ্য তাম্রশাসনখানির (এবং অপর আর একখানির) সংবাদ সোসাইটিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চিঠির কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে :—"A puttur of three copper-plates joined by a large copper ring to a Seal, containing within a raised rim a figure of Ganesa was lately dug up near the station of Tezpur in the Darrang division, and I have the pleasure to enclose a copy of the inscription.

A similar grant of two plates was lately produced by a Brahmin in the Kamrup courts to substantiate a claim to some Lakhiraj lands; at the time it was first brought up, there was no person in the province who could read the inscription but having given to a Pandit the alphabets of ancient forms of Sanskrit writing, published by Mr. James Princep to illustrate his discoveries, he was soon able to make out the inscriptions.

It was a grant of land as Burmattar by Durmapal in the year 36, without any mention what era, to these Brahmins and detailed the boundaries of the grant. That inscription was not very legible, the letters in some places being much rubbed but the letters in the present puttur are quite distinct and hope they have been correctly read.

The Dewali which was formed by the grant viz Maharudra Dewali is still in existence though in a very dilapidated state and has given its name to the mauza on which it stands."

জেঙ্কিন্‌স্‌ সাহেবের এই সকল কথা উদ্ধৃত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ধর্ম্মপালের একখানি তাম্রশাসনের ইহাতে যৎসামান্য বর্ণনা আছে; ঐ শাসন এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছেনা। ধর্ম্মপালের একখানি তাম্রশাসন আসাম-প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় আবিষ্কার করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে এই দেবালয়ের অথবা ৩৬ অব্দের উল্লেখ নাই—ইহার ফলক সংখ্যাও দুই নহে, তিন। তবে দুই ধর্ম্মপালই অভিন্ন ব্যক্তি হইবার

কথা—তাহা হইলেও ঐ খানি নষ্ট হওয়াতে কামরূপ রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থের একখানি ছিন্নপত্র যে চিরবিলুপ্ত হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আলোচ্য তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধার কমলাকান্ত নামক জনৈক পণ্ডিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন লিপিমালা পাঠে অভ্যস্ত ছিলেন না; কিন্তু প্রিন্‌সেপ সাহেবের সঙ্কলিত প্রাচীন অক্ষর গুলির আদর্শ দেখিয়া পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন ফটোগ্রাফির বোধ হয় সৃষ্টিও হয় নাই। কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটির প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রাযুক্ত অঙ্গুরীয়কের এবং তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোকে প্রথমার্দ্ধের অবিকল প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে,—মুদ্রাতে যেরূপ অক্ষরে শাসন-প্রদাতা রাজার নাম ও পদবি দেওয়া আছে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং যে বর্ণমালার সাহায্যে হয়তো পণ্ডিত কমলাকান্ত শাসনের পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাও রহিয়াছে। এইগুলির আলোকচিত্র এই প্রবন্ধের সঙ্গে দেওয়া হইল।

পণ্ডিত কমলাকান্ত খুব বিদ্বান ছিলেন; কিন্তু প্রথম শ্লোকার্দ্ধের প্রতিলিপির সঙ্গে তদীয় পাঠ মিলাইলে দেখা যায় যে, তিনি বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধারে সমর্থ হন নাই। "সঙ্গমান্দোলনোত্থৈ" স্থলে "সঙ্কয়াস্ফালনোত্থৈ" পাঠ হওয়াই সঙ্গত বোধ হয়—যদিও "স্ফালনোত্থৈ" এই অংশের প্রতিলিপিতে যেন লেখকের প্রমাদ পরিলক্ষিত হয়। আবার তাঁহার পঠিত 'বৈশারিসার্থঃ' স্থলে "বৈমানিসার্থঃ" পাঠই অধিকতর সম্ভব। প্রথম শ্লোকের অর্দ্ধাংশেই যদি এই সকল গলদ দেখা গেল, শাসনের অবশিষ্ট স্থলে যে কি পরিমাণ ভুলভ্রান্তি আছে তাহা অনুমানের বিষয়।

আবার পণ্ডিত কমলকান্তের লেখাও যে বিশুদ্ধ ভাবে ছাপা হইয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। একটি স্থলে খুব একটা প্রয়োজনীয় শব্দই পড়িয়া গিয়াছে; "সততোত্তানস্থানকামিনীভিঃ" এই বিশেষণের পরে "নৌভিঃ" শব্দটি ছিল—মুদ্রাকরের প্রসাদে তাহা ছাপান হয় নাই। গৌহাটির পণ্ডিত কমলাকান্তের লেখার ইংরেজী অনুবাদ (সম্ভবতঃ) কলিকাতায় পণ্ডিত সারদাপ্রসাদের দ্বারা হইয়াছিল; তিনি অবশ্যই ছাপার আগেই অনুবাদ করিয়াছিলেন—তাই এটা (এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি শব্দ) যে "নৌভিঃ"র বিশেষণ তাহা পণ্ডিত সারদা প্রসাদের অনুবাদ হইতেই বুঝা যাইতেছে। ছাপিবার সময় 'নীভিঃ' ও 'নৌভিঃ' তে গোলমাল বাধিয়াছে এবং দেবনাগরাক্ষরে এই দুইটির অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য বশতঃ পরেরটি অতিরিক্ত ভাবিয়া কম্পোজিটার (বা প্রুফ রিডার) উহা ছাড়িয়া দিয়াছে। এইরূপ আরো দুই এক স্থলে মুদ্রা-যন্ত্রের কর্ম্মচারিবর্গের ভ্রম স্পষ্টতঃ লক্ষিত হয়।

পণ্ডিত সারদাপ্রসাদের অনুবাদে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য আছে—ইংরেজী ভাষায়ও যে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল তাহাও সূচিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু স্থলে রচনার অভ্যন্তরস্থ অনায়াসবোধ্য অশুদ্ধি পরিহার চেষ্টা না করাতে একে আর তরজমা করিয়া ফেলিয়াছেন। তবে পাঠ যে স্থলে অবিসংবাদিত ভাবে বিশুদ্ধ তাদৃশ স্থলে অনুবাদে অর্থব্যত্যয় কিঞ্চিৎ কমই পরিলক্ষিত হয়।

বনমালদেবের প্রপৌত্র বলবর্ম্মার প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত এবং সম্যক্

আলোচিত * হওয়াতে তাহা হইতেও আমরা বনমালের এবং তাঁহার পিতা হর্জ্জরের অনেক কথা জানিতে পারিতেছি। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:—

"* * * * * * ।
অভবদ্ভুবি নৃপচন্দ্রো দ্বিষজ্জরো হর্জ্জরো নাম ॥
অহমহমিকয়া বিবন্দিষূণাং যদরুণ পাদনখপ্রভাবিতানৈঃ।
ন মুকুটমণয়ো বিভান্তি রাজ্ঞাং রবিকর সংবলিতাইব প্রদীপাঃ ॥
তস্যাত্মজঃ শ্রীবনমালদেবো রাজা চিরং ভক্তিপরোভবেহভূৎ।
বিশালবক্ষাস্তনুবৃত্তমধ্যাঃ পিনদ্ধকণ্ঠঃ পরিঘাভবাহুঃ ॥
ন ক্রুদ্ধং বিকৃতাস্যং নচ হাসিতং নচ বচঃ শ্রুতং নীচাৎ।
নচ কিঞ্চিদুক্ত মহিতং মহিতং শীলং সদৈব যস্যাভূৎ ॥
যেনাতুলাপি সতুলা জগতি বিশালাপি ভূরিকৃতশালা।
পংক্তিঃ প্রাসাদানামকৃত বিচিত্রাপি সচ্চিত্রা ॥"

এই সকল বর্ণনা হইতেও দেখা যায় যে, শ্রীবনমালদেব এবং তৎপিতা হর্জ্জরদেব পরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। তাঁহাদের রাজধানী হারূপ্পেশ্বর নামক স্থানে ছিল। কিন্তু পণ্ডিত কমলাকান্ত পড়িতে না পারিয়া "হরয়েশন" করিয়াছেন। বলবর্ম্মার তাম্রশাসনে স্পষ্ট আছে—

"লৌহিত্যস্য সমীপে তদেব পৈতামহং কটকং।
তত্র শ্রীমতি হারূপ্পেশ্বরনামনি কটকে কৃতবসতিঃ ॥" ইত্যাদি।

অবশ্য বনমাল বলবর্ম্মার ঠিক্ 'পিতামহ' ছিলেন না, প্রপিতামহ ছিলেন; কিন্তু এখানে 'পৈতামহং' বিশেষণটিও পিতামহ হইতে আগত—প্রপিতামহ হইতে নহে, এমন বলিতে পারা যায় না। বনমালের পিতা হর্জ্জরেরও রাজধানী যে হারূপ্পেশ্বরেই ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তেজপুর শহরের সন্নিকটে ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ পর্ব্বতগাত্রে যে লিপি খোদিত আছে, তাহা এ যাবৎ সম্পূর্ণ পঠিত হয় নাই। ডাঃ কীলহর্ণ অল্পমাত্র পড়িয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন :—

"The inscriptions undoubtedly is dated Gupta 510 (= A. D. 829) * * * It is the increasing reign of victory of the glorious Harjara Varmadeva who is described as Maharajadhiraja Parameswara Paramabhattaraka, proud of the strength of the arm and staying at Huruppeswara pura"†

অতএব বনমালের রাজধানী যে "হারূপ্পেশ্বর" হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না।

এই নগর কোথায় অবস্থিত ছিল? বনমালের তাম্রশাসনখানি তেজপুর শহরের কাছেই খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু শাসন-প্রাপ্তির স্থানের সঙ্গে প্রদাতার রাজধানীর সম্পর্ক

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৭—২য় সংখ্যা পৃঃ ১১৩—১২৮।
† Quoted from Dr. Keilhorn's letter to Dr. T. Bloch, dated the 12th August 1905.

অতি কমই থাকে; তৎপ্রপৌত্র বলবর্ম্মার প্রদত্ত তাম্রশাসন ব্রহ্মপুত্রের অপর দিকে বহুদূরে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু হর্জ্জরের নাম যুক্ত গিরিগাত্র-লিপিদ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, হারূপেশ্বর হয়তো তেজপুরের মধ্যে না হউক অতীব সন্নিকটেই ছিল। ইহা যে ব্রহ্মপুত্রের তীরে ছিল, তাহা বনমাল ও বলবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতেই দেখা যাইতেছে। বনমালের তাম্রশাসনে লৌহিত্যের "শ্রীকামেশ্বরমহাগৌরীভট্টারিকাভ্যামধিষ্ঠিতশিরসঃ কামকূটগিরেঃ সততনিতম্বক্ষালনাদধিকতরপবিত্রপয়ঃসম্পূর্ণস্রোতসা" এই বিশেষণটি দেখা যায়। এই কামকূটও হয়তো হারূপেশ্বরের অতি নিকটেই ছিল। এখনও যে তেজপুরের অনতিদূরে অত্যুচ্চ শৈলোপরি দেবীমন্দির আছে তাহা নবম শতাব্দীতে কামকূটোপরি কামেশ্বর মহাগৌরীর স্থান সূচক কি না কে বলিতে পারে?

কেহ মনে করিতে পারেন, এই বিশেষণটি দ্বারা সভৈরবকামাখ্যাধিষ্ঠিত ব্রহ্মপুত্র তীরবর্ত্তী পর্ব্বত নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সম্ভাব্য নহে; (১) তখন ৺কামাখ্যা মহাপীঠের লুপ্তাবস্থা ছিল। (২) ৺কামাখ্যার নাম মহাগৌরী ছিল বলিয়া জানা যায় না। (৩) কামাখ্যাধিষ্ঠিত পর্ব্বতের নাম নীলাচল,—কামকূট নহে।

বনমালদেবের সময়ে তদীয় রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত ছিল। তেজপুর হইতে ত্রিস্রোতা বা তিস্তানদীর পশ্চিম পার পর্য্যন্ত রাজ্যের সীমা পাওয়া যাইতেছে। হয়তো ভাস্করবর্ম্মার রাজত্ব যেমন করতোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, দুই শত বৎসর মাত্র পরবর্ত্তী বনমালের সময়ে রাজ্য তাদৃশ সীমাবিশিষ্টই ছিল।

এই ত্রিস্রোতা নিয়া সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। "ত্রিস্রোতায়াঃ পশ্চিমতঃ" প্রদত্ত ভূমির ঠিকানা দেখিয়া পাঠক পণ্ডিত কমলাকান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া যাঁহাদিগকে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন, সকলেই 'ত্রিস্রোতা' অর্থ 'গঙ্গা' করিয়া দানের ভূমি গঙ্গাতীরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু একজন অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহার একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হইতেছে।

তখন সোসাইটির সদস্যগণ মধ্যে স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ই এক মাত্র বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি লিখিয়াছিলেন;—

"* * You will find on referring to Dr. M'cosh's topography of Assam p. 93, that the northern central Assam or Darrang or Tezpur * * is bounded from Nowdowar on the East by the river Barile. Here is the mystery. The river Barile is called in the language of the country Bhurili (ভরলি) and the Sacred name of the same river is Basisthy (বাশিষ্ঠী গঙ্গা) or Ganges, which you will be able to ascertain from the learned people through Captain Jenkins. Thus the land alluded to in the grant must be on the banks of this Ganges and not ours &c. * * *"

বলা বাহুল্য সোসাইটির সম্পাদক মহাশয় জেঙ্কিন্স্ বাহাদুরকে এ বিষয়ে লিখেন নাই—লিখিলে এই মতের ভুল ধরা পড়িত; তিনি মন্তব্য লিখিয়াছিলেন—'I perfectly con-

cur in thinking that this explanation relieves us of the necessity of supposing Vanamala (বনমাল) to have possesed lands on the banks of the real Ganga * * " এবং তৎপরে লিখেন "Taking Harjara or Vanamala as a Raja ruling only in Charduar and its vicinity &c &c." ফলকথা তখন প্রত্নতত্ত্বের অবস্থা যাহা ছিল, তাহাতে এইরূপ ধারণা অসম্ভাবিত নহে। কিন্তু ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের বাশিষ্ঠী গঙ্গা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, শুনিয়াছি তিনি একবার ৺কামাখ্যা দর্শনে আসিয়াছিলেন; হয়তো তখন ভরলু (ভরলী নহে) নদীর নাম যে বাশিষ্ঠী গঙ্গা তাহা ইহার উৎপত্তি স্থান বশিষ্ঠাশ্রমে গিয়া জানিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু কোথায় তেজপুরের পূর্ব্বদিকে বুরিলি নদী আর কোথায় গৌহাটির পশ্চিম ভাগে ভরলু নদী।

পণ্ডিত কমলাকান্ত কিছু কিছু নোট লিখিয়াছিলেন, ত্রিস্রোতায়াঃ সম্বন্ধে লিখেন "শেষে ত্রিস্রোতায়াঃ ইতি তৎকর্ত্তুর্ভ্রান্তিঃ ত্রিস্রোতসঃ ইতি সাধু।"† বোধ হয় তিস্তানদীর নামটি তাঁহাদের মনে স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। সংজ্ঞাবাচক 'ত্রিস্রোতা' দেখিয়া বুঝা উচিত ছিল যে ইহা গঙ্গার প্রতিশব্দ নহে। তাহা হইলে 'ত্রিস্রোতসঃ' লিখিত হইত।

বনমালের তাম্রশাসনে 'সম্বৎ ১৯' এবং ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে "সম্বৎ ৩৬" দেখিয়াও তাঁহাদের গোল বাধিয়া ছিল। সোসাইটি পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় এই দুইটি সন পরস্পর সাপেক্ষ মনে করিয়া লিখিয়াছিলেন :—"I will endeavour to prove that this era must have been the one adopted by the Hindoo conquerors of Assam as their own."

এতদ্বিষয়ে তিনি প্রকাণ্ড নোট্ লিখিয়া পরিশেষে ইহাকে পালাব্দ ঠিক্ করিয়াছিলেন এবং বনমালকে ঐ পালবংশের তৃতীয় রাজা ধরিয়া ধর্ম্মপালকে চতুর্থ ভূপতি করিয়া ছিলেন। বাস্তবিক এই সকল মন্তব্য পড়িলে বেশ আমোদ বোধ হয়;—প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের শৈশবাবস্থায় তদনুশীলনকারিগণকে কত ভ্রমাবর্ত্তে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতে হইয়াছিল।

বলা আবশ্যক যে এই শাসনখানি বনমালদেবের রাজত্বের উনবিংশ বর্ষে আনুমানিক ৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল; তৎপিতা হর্জ্জরের গিরিগাত্র-লিপির সন যে ৮২৯ খৃষ্টাব্দে তাহা আমরা প্রাগুল্লিখিত ডাঃ কীলহর্ণের মন্তব্য হইতেই জানিয়াছি।

ফলকগুলির অঙ্গুরীয় গ্রন্থির সঙ্গে যে 'সিল্' মোহর ছিল তাহাতে কামরূপরাজগণের পরিচিহ্ন হস্তীর চিত্র রহিয়াছে। উঁহারা এটা গণেশের মূর্ত্তি মনে করিয়াছিলেন।‡ এই

* ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর এতদুপলক্ষে আরও ভুল করিয়াছিলেন। তিনি বনমালের তাম্রশাসনের 'ত্রিস্রোতা' ধর্ম্মপালের শাসনে ছিল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে বহু বাজে কথা লিখিয়াছিলেন।

† তিনি আরও লিখিয়াছিলেন :—"প্রাগ্জ্যোতিষাধিপস্ত বনমাল বর্ম্মণোরাজ্ঞো গঙ্গাতীরেঽপি অধিকার স্থিতঃ। গঙ্গাতীরে যাগং কৃত্বা যাজ্ঞিকাচার্য্যায় গঙ্গাপশ্চিমতটে ভূমিদানং কৃতং। তাম্রশাসনেন ভূমিদানং হি যাগদক্ষিণারূপমেব প্রসিদ্ধং বর্ণিতং চ শিশুপালবধাদৌ।" ইহার টীকা অনাবশ্যক।

‡ গণেশ একদন্ত; সিল্মোহরে যে চিত্র আছে তাহা স্পষ্ট "দ্বিরদ"; কিন্তু এত সূক্ষ্ম অনুসন্ধান তখনকার দিনে অপ্রত্যাশিত।

ভুল যে সোসাইটির সাহেবেরাই করিয়াছিলেন তাহা নহে। বঙ্গাধিপ কুমারপালের অমাত্য বৈদ্যদেব কামরূপরাজ তিষ্যদেবকে পরাস্ত করিয়া কামরূপ রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক রাজা হইয়া এক তাম্রশাসন প্রদান করেন; তাহাতে তিনি ঈদৃশ চমসাকৃতি 'সিল্' করিয়া উহাতে গণেশমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন; বোধ হয় প্রাচীন কামরূপের রাজগণের হাতি মার্কা মোহরকে তিনি 'গণেশ'-মার্কা মনে করিয়া তাহারই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

অন্যান্য তাম্রশাসন আলোচনার কালে ভগদত্ত বজ্রদত্তের সম্পর্কে বিচার স্থলে মতদ্বৈধ প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে পুনশ্চ সে কথার অবতারণা হইতেছে। ভাস্করবর্ম্মা ও ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে বজ্রদত্তকে ভগদত্তের পুত্র বলা হইয়াছে। ধর্ম্মপালের শাসনে বজ্রদত্তের কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু বলবর্ম্মা, রত্নপাল এবং এই সমালোচ্য বনমালদেবের তাম্রশাসনে বজ্রদত্তকে ভগদত্তের অনুজ বলা হইয়াছে। এই তাম্রশাসনের ৪র্থ শ্লোকে এ বিষয়ে বেশ অভিনব একটি কথা বলা হইয়াছে :—

"কৃষ্ণেণ তং (নরকং) নিহত্য চ সৃষ্টৌ ভগদত্ত বজ্রদত্তাখ্যৌ।
তস্য সুতৌ তদ্বনিতা করুণবিলাপহৃতহৃদয়েন॥"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরক-বধের পরে নরক-পত্নীর করুণ বিলাপে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ভগদত্ত-বজ্রদত্ত নামক দুইটি পুত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জানি না এই উক্তির মূল কোথায়। মহাভারত অশ্বমেধ পর্ব্বের ৭৫ অধ্যায়ে যে বজ্রদত্তকে স্পষ্ট ভগদত্তের পুত্র বলা হইয়াছে, তাহা অনেকশঃ বলিয়াছি; আবার কালিকাপুরাণের ৪০ অধ্যায়ে যে নরকের নিজ পত্নীতে ভগদত্ত প্রমুখ চারিটি পুত্র উৎপাদনের কথা আছে, তাহাও প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি। অথচ বনমালের তাম্রশাসনের এই কথা বলবর্ম্মা এবং রত্নপালের তাম্রশাসনের উক্তি দ্বারা প্রকারান্তরে সমর্থিত হইতেছে। অবশ্যই কোনও পুরাণ বা উপপুরাণে এতাদৃশ কোনও কথা আছে। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ এ বিষয়ে একটু গবেষণা প্রয়োগ করিবেন কি?

শাসনের মর্ম্ম সংক্ষেপে এই :—

নরকভগদত্তের বংশে প্রালম্ভ নামধেয় নৃপতি আবির্ভূত হন; তাঁহার রাজ্ঞী শ্রীজীবদা ছিলেন। তাঁহাদের পুত্র শ্রীহর্জ্জর নামক ভূপতির ঔরসে তদীয় পত্নী শ্রীতারার গর্ভে শ্রীমান্ বনমালদেব জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরস্থ শ্রীহারূপ্পেশ্বর নামক রাজধানী হইতে বনমালদেব, যজুর্ব্বেদীয় শাণ্ডিল্য গোত্রজ ভিজ্জট নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে তৎপত্নী সভ্রায়িকার গর্ভে জাত ইর্ণে নামধেয় বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে ত্রিস্রোতার পশ্চিমে অতিশূরবাটক নামে একটি গ্রাম প্রদান পূর্ব্বক এই শাসনখানি লিখিয়া দিয়াছিলেন।*

---

* একটা লক্ষ্যের বিষয় এই যে পরবর্ত্তী বলবর্ম্মা রত্নপাল প্রভৃতির তাম্রশাসনে যেমন "যথাযথং সমুপস্থিত ব্রাহ্মণাদি বিষয় করণ" ইত্যাদিকে সম্বোধন করিয়া কতকগুলি অনুশাসন বাক্য আছে, ইহাতে তাহা নাই। প্রাচীনতর ভাস্করবর্ম্মার শাসনে ছিল কিনা বলা যায় না। কেননা যে ফলকে তাহার থাকিবার কথা ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ভূমির সীমাস্থলে যদিও "অষ্টৌ সীমাপরিচ্ছদাঃ" লিখিত আছে তথাপি পূর্ব্ব, পূর্ব্ব-দক্ষিণ, দক্ষিণ দক্ষিণপশ্চিম, পশ্চিম ও উত্তরপূর্ব্ব এই কয়টি সীমা দেওয়া আছে। পশ্চিমোত্তর ও উত্তর সীমা শাসনে ছিল কিনা, মূল শাসন না দেখিলে বলা যায় না। এই সীমাপরিচ্ছদের সমস্ত কথা বুঝা যায় না। প্রত্যেক সীমাতেই পণ্ডিত কমলাকান্ত 'সভ' শব্দ লিখিয়াছিলেন, ইহার অর্থ হয় না বলিয়া এবং 'হ' ও 'ভ' তুল্যাকৃতি অক্ষর মনে করিয়া 'সহ' করিয়া দিয়াছিলেন। কেননা, রত্নপালের দ্বিতীয় তাম্রশাসনে এই সীমা কথাটি স্পষ্ট রহিয়াছে।

শাসনের মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। মূলের যে যে স্থানে সোসাইটি মুদ্রিত পাঠের ব্যত্যয় করা হইয়াছে তাহা ফুটনোটে প্রদর্শিত হইয়াছে। দুইটি স্থল সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ আবশ্যক। শাসনের নবম শ্লোকটি সোসাইটির পত্রিকায় এইরূপ মুদ্রিত আছে :—

"দিবমারূঢ়ে বাস্তস্ত ভূভুজো থৈকবৈরিবীরোভূং।
ভ্রাতা শৌর্য্য ত্যাগৈ রসন্মানা নাবথোতি নৃপঃ॥"

ইহাতে কোনও অর্থ হয় না। অথচ ছন্দঃপাতও হইয়াছে। অনুবাদক পণ্ডিত সারদাপ্রসাদ পূর্ব্বার্দ্ধ পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত যেন তেন অন্বিত করিয়া দিয়া অপরাংশের অর্থ করিয়াছেন—"His brother, greatest of all Rajas abandoned his Valour with indignation but not his car (? indignantly resigned the fight yet left not his car ?)" কিন্তু প্রকৃত পাঠ যে কি বুঝা যায় না; অথচ একটি শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ যে পূর্ব্ব শ্লোকের সঙ্গে অন্বিত হইবে তাহাও বোধ হয় না। যতদূর পারা যায় শব্দ পরিবর্ত্তন না করিয়া পাঠ নিম্নলিখিত রূপে কল্পিত হইয়াছে :—

"দিব মারূঢ়বান্ যস্য ভূভুজো থৈকো বৈরিবীরোভূৎ।
ভ্রাতা শৌর্যত্যাগৈ রসমানান্নারপোতিনৃপঃ॥"

ইহারও যে অর্থ খুব সুন্দর হইয়াছে বলিতে পারি না। তথাপি যথাসম্ভব শ্লোকটিকে অন্য নিরপেক্ষ করা হইল মাত্র

অপর একটি স্থলেও সাহস পূর্ব্বক পাঠ ব্যত্যয় করা হইয়াছে। চতুর্ব্বিংশ শ্লোকে পণ্ডিত কমলাকান্ত "হেতুকশূলিনং" পাঠ করিয়াছেন অর্থাৎ "হেতুক মহাদেবের।" পণ্ডিত সারদাপ্রসাদ অনুবাদ করিয়াছেন "of Hetukusulin (the Siva of destruction)।* কিন্তু আমাদের বিবেচনায় পাঠটি 'হেতুক' না হইয়া "হাটক" হইবে বলিয়া বোধ হয়। আকার অনেক সময় একারের ন্যায় দেখায়; আবার 'ট' অক্ষরটিও 'তু'এর খুবই সদৃশ। তাই হাটক শূলিনঃ পাঠ কল্পিত হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে এখানে হাটকেশ্বর আসিলেন কিরূপে? তন্ত্রে আছে "শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ।" কিন্তু তাহা হইলেও 'হাটকেশ্বর' শ্রীহট্টের এক চেটিয়া

* অনুবাদের অশুদ্ধি গুলি দেখান অনাবশ্যক বলিয়া এ বিষয় অধিক প্রয়োগ করা যাইবে না

জিনিস নহেন। ঐ দেখুন গোদাবরী নদীর তীরেও এক হাটকেশ্বর আছেন।* অতএব ভক্তানুরোধে আরও দুই এক স্থলে যে মহাদেব এই নামে পরিচিত হইতে পারেন না তাহা মনে করা অনুচিত।

এই শাসনের কবি খুব শক্তিমান্ ব্যক্তি ছিলেন; পদ্যে গদ্যে তাঁহার শাসনখানি সুন্দর লিখিত হইয়াছে। পদ্যে তিনি নানা ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন। দুইটিতে (২৮ ও ২৯ সংখ্যক শ্লোকে) ছন্দের নামও অবান্তরভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। অতিশয়োক্তিভূয়িষ্ঠ নানা অলঙ্কারের অবতারণা করিয়া রচনাকে তিনি বেশ সরস করিয়াছেন। গদ্যাংশেও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ লেখক বাণভট্টের অনুকরণে দীর্ঘসমাসাঢ্য "উৎকলিকাপ্রায়ের" অবতারণা করিয়াছেন। রাজধানীর বর্ণনায় মধ্যে সন্নিবিষ্ট লৌহিত্যের এবং তত্তীরোপাস্থনৌকাশ্রেণীর বর্ণনা অতীব চমৎকারিণী হইয়াছে। হায়, নানাভরণ শোভিত, চামরকিঙ্কিণীযুক্ত, রক্তদন্তাকারচিত্রাবলীবিশিষ্ট, নর্ত্তকপুরুষাক্রমণোৎকম্পিত, বহিত্রাদি দ্বারা বায়ু বেগে পরিচালিত, সকল জন মনোহর, লৌহিত্য সলিলোপরি সতত ভাসমান নদরাজের উভয় কূল-শোভা ঐ সকল নৌকা এখন কোথায়?

আমরা যে এতাদৃশ তাম্রশাসন খানির মূল ফলকগুলির চিত্রদর্শনও করিতে পারিলাম না—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ভাস্কর বর্ম্মার শাসন আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে ইহাই প্রাচীন কামরূপের প্রাচীনতম শাসন, এবং ইহাই যে সর্ব্বাদৌ আবিষ্কৃত ও আলোচিত শাসন তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক আমরা যতটুকু আলোচনা করিতে পারিলাম, তজ্জন্য সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ আমাদের ধন্যবাদার্হ।

সোসাইটির ১৮৪০ সালের পত্রিকা অতিশয় দুর্লভ, গত পাঁচ বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিয়া বিগত কার্ত্তিক মাসে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃপায় ইহা পাইতে পারিয়াছি। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

রঙ্গপুর জেলার কোনও ভূমি সম্বন্ধে তাম্রশাসন এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা জানি না। কিন্তু এই শাসন দ্বারা প্রদত্ত ভূমি যে এক্ষণে রঙ্গপুর জেলাতে অপরিচিত অবস্থায় বর্ত্তমান তাহাতে সন্দেহ নাই। রঙ্গপুর-পরিষদই সুতরাং এই শাসনখানির আলোচনার প্রকৃষ্ট স্থান; আশা করি পরিষদের সভ্যমহোদয়গণ ভূমির সংস্থান নির্ণয়ার্থ যথোচিত অনুসন্ধান করিতে যত্নবান্ হইবেন।

শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য।

---

* "এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তাঃ সর্ব্ব এবর্ষিপার্থিবাঃ
দ্রষ্টুং ত্রৈলোক্যভর্ত্তারং ত্র্যম্বকং হাটকেশ্বরম্।
ততঃ কপিবরঃ প্রাপ্তো ঘৃতাচ্যাসহ সুন্দরি
স্নাত্বা গোদাবরীতীর্থে দিদৃক্ষু হাটকেশ্বরম্।"
বামনপুরাণ ৬২ অধ্যায় (শব্দকল্পদ্রুম)

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালা

(দ্বারোদ্ঘাটন-কালে পঠিত)

যোগ্যতা বর্ত্তমান থাকিতেও অযোগ্যতার প্রতি স্নেহ-প্রদর্শন আমাদের দেশে দুর্লভ নহে। এ ক্ষেত্রেও আপনারা তাহার পরিচয় পাইতেছেন। সুতরাং অধিক ভূমিকার পরিবর্ত্তে আপনাদের মার্জ্জনা-দৃষ্টি প্রার্থনা করিয়া যথা-শক্তি কর্ত্তব্য-সম্পাদনে অগ্রসর হইতেছি। কয়েক বৎসর হইতে ভারতের কোন শ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিদের ছায়ায় বসিয়া প্রত্নতত্ত্বালোচনার যতটুকু সুবিধা পাইয়াছি তাহাতে ইহাই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে মূর্ত্তিতত্ত্বের (Iconography) আলোচনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ভারতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি মিউজিয়াম স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে সকল সংগ্রহের মধ্যে মূর্ত্তির সংখ্যাই অধিক। মূর্ত্তির আলোচনা করিতে হইলে দুইটি গুণের প্রয়োজন—এক শিল্প-সমালোচকের চক্ষু, আর প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণা। বঙ্গদেশের আবিষ্কৃত মূর্ত্তিগুলির পরিচয় দিতে হইলে প্রত্নতত্ত্বের খুঁটিনাটি জানিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কারণ ইহাতে মৌর্য্য-শিল্প, গান্ধার-শিল্প প্রভৃতি অতি প্রাচীন যুগের মূর্ত্তি খোদিত ফলকের সম্যক্ জ্ঞানের জন্য অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী ভাষায় লিখিত মূর্ত্তি-তত্ত্বের (Iconography) পুস্তকও পাঠ করিতে হয় না। তবে বঙ্গদেশের মূর্ত্তির পরিচয় দিতে হইলে, নানা তন্ত্র, নানা পুরাণ পাঠ করিবার প্রয়োজন আছে। কারণ তান্ত্রিকতা-প্রধান বঙ্গদেশের অধিকাংশ মূর্ত্তিই হয় শাক্ত, না হয় বৈষ্ণব উপাসকের আদেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মূর্ত্তি-পূজার দিকে ও পুরাণপাঠের প্রতি আমাদের তেমন লক্ষ্য না থাকিলেও অধুনা যে আমরা প্রত্নতত্ত্বের অনুরোধে পুরাণগুলি পাঠ করিতেছি ও মূর্ত্তির নানা ধ্যান নিষ্ঠার সহিত পাঠ করিয়া প্রাচীন কালের মূর্ত্তিগুলির সহিত মিলাইতেছি, ইহাও বড় সুখের বিষয়। এখানে বিষ্ণু, কালী প্রভৃতি যে মূর্ত্তিগুলি স্থাপিত করা হইয়াছে, তাহাদের শিল্প-সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে হইলে বোধ হয় সময়ে কুলাইবে না, সুতরাং সেগুলির মাত্র স্থূল পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইব।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ প্রাচীন মুদ্রা। সংগৃহীত মুদ্রার কতকগুলি ঐতিহাসিকতা হিসাবেও যথেষ্ট মূল্যবান। সুবিধার জন্য মুদ্রাগুলিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। যথা (১) ইণ্ডো-গ্রীক্ ও রোমান্ মুদ্রা, (২) কোচবিহার ও আসামের মুদ্রা, (৩) মুসলমানী আমলের মুদ্রা, (৪) বিভিন্নদেশীয় মুদ্রা। এই মুদ্রাগুলির মধ্যে যে গুলি ঐতিহাসিক হিসাবে মূল্যবান, মাত্র সেই গুলিরই লিপির (Legend) বিশিষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইল।

মুদ্রা ব্যতীত এই চিত্রশালার আর একটি সংগ্রহ লিপিযুক্ত ইষ্টক ও ভগ্ন প্রস্তরাদি (Teracottas)। এ গুলির মূল্য সকল মিউজিয়ামেও যেরূপ, এখানেও তাহাই। এ গুলিরও

যথাসম্ভব সাধারণ বিবরণ প্রদত্ত হইল। প্রথমতঃ সংগৃহীত বিভিন্ন মূর্ত্তির বিষয়ে আলোচনা করিব।

১নং। যে বিষ্ণুমূর্ত্তি আপাততঃ এই কক্ষের বাহিরে স্থাপিত করা হইয়াছে, ইহা ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি। ২নং মূর্ত্তির আলোচনায় ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার পাদমূলে একখানি ক্ষুদ্র লিপি আছে। নিজে চেষ্টা করিয়াছি, পরন্তু এই যুগের বিখ্যাত লিপিতত্ত্ববিদ্‌গণকেও দেখাইয়াছি, কেহই পড়িয়া অর্থ করিতে পারেন নাই।

২নং। তিনটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। তিনটি একই লক্ষণবিশিষ্ট হইলেও আকারে অবশ্য ছোট বড় আছে। এই মূর্ত্তিত্রয়ের মধ্যে যেটি সর্ব্ব দক্ষিণে স্থাপিত হইয়াছে, তাহার পাদপীঠে একটি ক্ষুদ্র লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ বিষ্ণুমূর্ত্তির ন্যায় এ মূর্ত্তি কয়টিও শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। সকলগুলি দণ্ডায়মান। সকলেরই দক্ষিণ পার্শ্বে চামর হস্তে কটিদেশ বক্র করিয়া এক একটি দণ্ডায়মানা নারীমূর্ত্তি। ঠিক একই ভাবে মূল মূর্ত্তির বামপার্শ্বে এক একটি বীণাবাদিনী স্ত্রীমূর্ত্তি। এই তিনটি মূর্ত্তি অক্ষত। ত্রিবিক্রম নামে বিষ্ণুমূর্ত্তির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহার সহিত মিলাইলে মনে হয় এ তিনটিও ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি। "বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়" নামক পুস্তিকা পাঠে বুঝা যায় যে, এই শ্রেণীর ছয়টি মূর্ত্তি এই বরেন্দ্র অঞ্চল হইতেই সংগৃহীত হইয়া পরিষদের মিউজিয়ামে স্থান লাভ করিয়াছে। এগুলি গোবিন্দগঞ্জ থানায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

৩নং। ইহাও একটি ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটির দক্ষিণাংশ ভগ্ন।

৪নং। ইহা বর্ত্তমান চিত্রশালার একটি বিশিষ্ট মূর্ত্তি। প্রথম দর্শনে মনে হয় যে, ইহা একখানি বিষ্ণুমূর্ত্তি। কিন্তু কোন বিষ্ণুমূর্ত্তির ধ্যান বা চিত্রের সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই। সমৃণালপদ্ম হস্তে মূর্ত্তিটি দণ্ডায়মান। পার্শ্বে দুইটি দণ্ড হস্তে পুরুষমূর্ত্তি। তাহাদের অধোদেশের বস্ত্র দেখিলে পুরুষ বলিয়াই মনে হয়। তন্নিম্নে মূল মূর্ত্তির পাদদেশে সাতটি অশ্বমূর্ত্তি অঙ্কিত।

"রক্তাব্জযুগ্মাভয়দানহস্তং
কেয়ূরহারাঙ্গদকুণ্ডলাঢ্যং"

ইত্যাদি শ্লোকের বর্ণনার সহিত এই মূর্ত্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সুতরাং ইহাকে সূর্য্যমূর্ত্তি বলা যাইতে পারে। "সপ্ত সপ্তিবহঃ প্রীতঃ"—এ কথাও এখানে খাটে।

৫নং। মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিখানি দশভুজা। সপ্তশতী স্তোত্র-বর্ণিত মহিষমর্দ্দিনীমূর্ত্তির সহিত অবশ্য ইহার মিল নাই। কিন্তু পুরাণ-কল্পিত মূর্ত্তির সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। আমাদের দেশে শারদীয় মহাপূজায় এই মূর্ত্তিরই পূজা হইয়া থাকে।

"কাত্যায়ন্যাঃ প্রবক্ষ্যামি মূর্ত্তিং দশভুজাং তথা"

ইত্যাদি নানা পুরাণোক্ত ধ্যানে ইহারই বর্ণনা আছে। রাজসাহীর বরেন্দ্র-সমিতির মিউজিয়ামে যে মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা অষ্টভুজা, তথায় মহিষও ভিন্ন

শ্রেণীর। সেই মূর্ত্তির বর্ণনা-সূত্রে কবি ও ঐতিহাসিক পুজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাও এই মূর্ত্তির সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে। "যাহা ভীষণ হইতে ভীষণ, তাহার মধ্যেও যে শিল্প-সৌন্দর্য্যের অভাব নাই, তাহা পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হইয়াছিল। ভাব-সামগ্রী পুঞ্জীকৃত করিয়া, সে কালের গৌড়শিল্পী যে মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তি রচনা করিয়াছিল, তাহার সহিত এ কালের ক্ষীণপ্রাণ বাঙ্গালীর যত্নে রচিত মহিষ-মর্দ্দিনী-মূর্ত্তির কত পার্থক্য। সে কালের মহিষমর্দ্দিনী মহিষমর্দ্দিনী—মর্দ্দনের প্রণালীর ভিতর দিয়া তাহার ভাবসামর্থ্য কেমন পরিস্ফুট যেন দেবাসুর-সংগ্রাম-কল্পনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পাপের পরাজয় এবং পুণ্যের জয় বিঘোষিত করিতেছে। মহিষমর্দ্দিনী শূলাগ্রে মহিষাসুরের মর্ম্ম স্থান বিদ্ধ করিয়াছেন,—দৃঢ়মুষ্টিনিবদ্ধ শূলদণ্ড যেন সবলে শূলাগ্র নিম্নাভিমুখে প্রোথিত করিতেছে। + + + ইহার (এই মূর্ত্তির) নিদর্শন যে দেশেই আবিষ্কৃত হউক না কেন, ইহা বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর শিল্পকৌশল-সম্ভূত মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তিরই ভাবসম্পদের পরিচয় প্রদান করিবে। তাহা ভীষণে মধুরে অপূর্ব্ব সমাবেশ-কৌশলে অনন্যসাধারণ বলিয়াই উল্লিখিত হইবার যোগ্য।"

৬নং। এই শবাসনা কালীমূর্ত্তি খানির পরিচয় এখনও সকলেরই কৌতূহলের বিষয় হইয়া আছে। এই বিবরণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কালীমূর্ত্তির সহিত সিংহ ইহাই প্রথম দেখা গেল। পৃথিবীর অন্য কোন মিউজিয়ামে এরূপ মূর্ত্তি আছে বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। আশা হয়, ভবিষ্যতে এক দিন অবশ্যই এই মূর্ত্তি আত্ম-পরিচয় সহকারে প্রত্নতত্ত্ববিদের কৌতূহল ভঞ্জন করিয়া নূতন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইবে।

৭নং। এই শ্রীমূর্ত্তি ক্ষুদ্র কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত। ইহাতে একটি চতুর্ভুজ পুরুষ একটি নারীকে আবেষ্টন করিয়া আছেন। পুরুষমূর্ত্তির পাদদেশে একটি বৃষ, নারীমূর্ত্তির পাদ-দেশে একটি সিংহ। এ শ্রেণীর বহু মূর্ত্তি বগুড়া ও গৌড়ে পাওয়া গিয়াছে। তাহার কোন কোন মূর্ত্তির পাদদেশে "বাভ্রবীকায়া" খোদিত আছে। সুতরাং লিঙ্গ না থাকিলেও বর্ণনা-সাদৃশ্যানুসারে এ মূর্ত্তিকেও "বাভ্রবীকায়া" বলা যাইতে পারে। ইহারই পার্শ্বে একখানি ভগ্ন মূর্ত্তি রাখা হইয়াছে। সেটি বৌদ্ধতারা মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। মূর্ত্তিটি দ্বিভুজা ও "ললিতা-সনে" উপবিষ্টা। বহু সরকারী মিউজিয়ামে এইরূপ মূর্ত্তি দেখিয়াছি।

৮নং। এই মূর্ত্তি তাম্রনির্ম্মিত। ইহার সহিত ত্রিবিক্রম মূর্ত্তির যথেষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। ইহারও দুই পার্শ্বে বীণাধারিণী ও চামরপ্রবাহিণী আছে। পদ্মপুরাণ এরূপ বিষ্ণুমূর্ত্তিকে প্রদ্যুম্ন বলিয়াছেন।

৯নং। ধর্ম্ম সভার সভাপতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত দুইটি মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিদ্বয়ের প্রথমটি বাসুদেব মূর্ত্তি। দ্বিতীয়টি মনসামূর্ত্তি। "নাগরাজসুত ক্রোড়াং নাগমাতরমম্বিকাং" ইত্যাদি ধ্যানের সঙ্গে মিলিয়া যায়, "ফণাসপ্তসমাযুক্তাং" ও বটে।

মুদ্রা। **প্রথম ভাগ।** (১) এখন সংগৃহীত মুদ্রা সমূহের সম্বন্ধে কিছু পরিচয় প্রদান

করিব। যথাবশ্যকীয় পুস্তক না পাওয়ায় মুদ্রার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পদে পদে অসুবিধা ভোগ করিয়াছি। যথাশক্তি সংশোধন করিবার অভিলাষ আছে। এই পরিষদে একটি মাত্র "ইণ্ডো-

প্রাচীন যুগের মুদ্রা

গ্রীক" বা ব্যাকট্রিয়ান মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। কুণ্ডীর জমিদার শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর ইহা উপহার দিয়াছেন। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে বাক্‌ট্রীয়া রাজ্য সিরিয়ার (Syria) রাজ্য হইতে পৃথক্ হয়। তাহার পরবর্ত্তী শতাব্দীতে ইউক্রাটাইডিস্ (Eucratides) মিনান্দার (Menander) প্রভৃতি ব্যাকট্রীয়ান নরপতিগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল আক্রমণ করেন। এই প্রদেশে ইঁহাদের বংশধরগণও বহুদিন রাজত্ব করেন। তাঁহারাই গ্রীক্‌ধরণে কতকগুলি রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা বাহির করিতেন। এ মুদ্রাটিও তাহারাই অন্যতম। ইহার সম্মুখের পৃষ্ঠায় (Obverse) গ্রীক্ অক্ষরে নিম্নলিখিত অংশ লিখিত আছে,—

ইহাকে অক্ষারান্তর করিলে এইরূপ হয় :—

ব্যাসিলিউস নিকিফোরা * * *

গ্রীক্ শব্দ "ব্যাসিলিউস" অর্থ রাজা, নিকিফোরো বোধ হয় তাঁহার নাম। ইহার পরের অক্ষরগুলি একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। লিপির আবেষ্টনের মধ্যে একটি গ্রীক্ দেবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত।

মূর্ত্তির অপর পৃষ্ঠায় (Reverse) একটি অশ্ব-মূর্ত্তি অঙ্কিত। তাহার চারিদিকে অস্পষ্ট ভাবে কয়েকটি অক্ষর দেখা যাইতেছে। পড়িবার উপায় নাই। এরূপ মুদ্রায় সাধারণতঃ একই লিপি দুই প্রকারের অক্ষরে লিখিত থাকে।

(২) একটি স্বর্ণমুদ্রা।* সম্মুখের দিকে মধ্যদেশে ল্যাটীন ভাষায় লিখিত আছে :—

"Dux" অর্থ জমিদার (Duke) অথবা প্রধান কর্ম্মচারী। তাহারই পার্শ্বে লিখিত আছে Ludon Manin. ইহার ইংরাজী অর্থ বোধ হয় Lydian Glove of Diogenes.

এই রাজপুরুষ বোধ হয় Cynic সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি-পার্শ্বেই বোধ হয়

মধ্যযুগের মুদ্রা

যিশুর শিষ্য St. Mark এর মূর্ত্তি; তিনি রাজচিহ্ন দিতেছেন। মুদ্রার অপর পৃষ্ঠায় লিখিত আছে Regis iste duco. ইংরাজী

I lead that of a king. রাজার ন্যায় ক্ষমতা তাঁহার আছে, ইহাই বোধ হয় এই লেখার উদ্দেশ্য।

* এই ধরণের মুদ্রা ডুকেট (Ducat) নামে ইউরোপে পরিচিত। এ সকলের সময় সাধারণতঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী। Renaissance আন্দোলনের প্রথম নেতা ফ্রেডারিক (Frederick II) প্রথম এইরূপ মুদ্রা প্রচার করেন। ভেনিস নামক নগরে ডুকেট প্রথম বাহির হইয়াছিল। আলোচ্য মুদ্রাটির ওজন বোধ হয় ৫৪ গ্রেণ হইবে। ভেনিসের শাসনকর্ত্তা (Doge) এইরূপ মুদ্রা খোদিত করিতে পারিতেন। এটিও ভেনিস দেশীয় মুদ্রা।

দ্বিতীয় ভাগ। আসামী মুদ্রা ও কোচবিহারের মুদ্রা। এই মুদ্রাগুলির পরিচয় প্রত্যেক আবরণের উপরই লিখিত আছে।

তৃতীয় ভাগ। মুসলমানী আমলের মুদ্রা। এগুলিরও পরিচয় আবরণের উপর প্রদত্ত হইয়াছে। এ গুলির মধ্যে মোগল বাদশাহ সুলতান গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর সা, বঙ্গের প্রথম মুসলমান নবাব ইলিয়াস্ খাঁর পুত্র সেকেন্দর সাহ, আকবর সাহ, জাহাঙ্গীর ও সাহ আলমের মুদ্রাগুলি উল্লেখযোগ্য। যে সকল শাসন-কর্ত্তার নাম লিখিলাম, তাঁহারা সকলেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। সুতরাং বিশেষ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

চতুর্থ ভাগ। ইহাতে শ্যাম দেশীয় দুইটি ও চীন দেশীয় দুইটি ও এবং নেপালের একটি মুদ্রা রহিয়াছে। নেপাল দেশীয় মুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠায় "**পৃথিবীর বিক্রম**" এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় (বৃত্তাকারে) "**শ্রীশ্রীশ্রীগোরক্ষনাথ**" ও (মধ্যদেশ) "**ভবানী**" লিখিত আছে।

এতদ্‌ভিন্ন কতকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদের ঐতিহাসিক কোন মূল্য নাই বলিয়া আর কোন আলোচনা করা গেল না।

ভগ্ন ইষ্টকাদি। (ক) এই বিভাগে আটখানি লিপিযুক্ত মৃন্ময় ইষ্টক সংগৃহীত আছে। লিপিগুলির সাধারণ পাঠোদ্ধার বিশেষ দুরূহ হইবে না বলিয়া এই স্থানে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা হইল না।

এই সংগ্রহের মধ্যে একখানি লিপিযুক্ত কৃষ্ণপ্রস্তরের ফলকও রহিয়াছে। এই ফলক-লিপি রঙ্গপুর-পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।

(খ) ইষ্টক সংগ্রহের মধ্যে কতকগুলির উপর শ্রীমূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। একখানিতে বিষ্ণুর মৎস্যাবতার, একখানিতে ধনুর্ব্বাণযুক্ত রামাবতার এবং অপরখানিতে হলধারী বলরাম-মূর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত আর কয়েকখানিতে নর্ত্তনশীলা নারীমূর্ত্তি ইত্যাদি অঙ্কিত দেখা যায়।

(গ) গৌড় হইতে আনীত এনামেল করা ইষ্টকাংশ। এগুলি যিনিই দেখিয়াছেন, তিনিই ইহাদের শিল্প-কৌশলের প্রশংসা করিয়াছেন।

(ঘ) রঙ্গপুরের প্রাচীন স্থান ভবচন্দ্রের পাট হইতে প্রাপ্ত সুবৃহৎ ইষ্টক। ইহা হইতে প্রতীত হইবে তৎকালে কত বড় ইষ্টক গৃহ নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইত।

(ঙ) কারুকার্য্যযুক্ত নানাবিধ ইষ্টক। এগুলি পীরগাছা, বর্দ্ধনকুঠী ও বগুড়ার গোপীনাথপুর হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

(চ) প্রাচীনকালে বন্দুকের নল। এটি কুণ্ডীর জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী পরিষদে প্রদান করিয়া ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

(ছ) ক্ষুদ্র স্তূপের মস্তক-ভাগ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই শ্রেণীর ক্ষুদ্র স্তূপকে votive stupa বলিয়া থাকেন। ইহার শিল্প-পদ্ধতি দক্ষিণ-ভারতে বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়। ইহার একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার উপরে একটি কালরঙএর লেপ দেওয়া হইয়াছে। এটি শ্রীযুক্ত

জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্ক্রাইন ক্যানাল হইতে সংগ্রহ করিয়া পরিষদকে উপহার দিয়াছেন।

(জ) চিত্রাবলী। এই সংগ্রহের সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বস্ত্রাঙ্কিত চিত্রখানি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক উপহৃত হইয়াছে। এখানি তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধ-চিত্র। ইহার মধ্যে বুঝিবার অনেক জিনিষ আছে। বাহুল্য ভয়ে সে সব কথা ছাড়িয়া দিতে হইল।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য চিত্র কোচবিহারের মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের আলেখ্য। এখানি রঙ্গপুরের শিল্পীর হস্তাঙ্কিত। ইহা হইতে সেকালের অয়েল-পেইন্টিং এর নিদর্শন পাওয়া যায়। কোঁচান নামক বস্ত্রে মহারাজের পোষাক রচিত হইয়াছিল। এই আলেখ্যের উপহারদাতা এই পরিষদের একজন উৎসাহী কর্ম্মী শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবিশ।

এই চিত্র-সংগ্রহের মধ্যে পাঁচখানি ফোটোগ্রাফ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যে অষ্টধাতু-নির্ম্মিত পাঁচটি সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি রঙ্গপুরের গোবিন্দগঞ্জের এলাকায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল, একয়খানি পূর্ণায়তন গৃহীত তাহারই ফটোগ্রাফ্‌ মূর্ত্তিগুলি গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার মিউজিয়ামে লইয়া গিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য, এই সমগ্র সংগ্রহের পরিচয়ে যতগুলি অভাব রহিয়া গেল, মিউজিয়াম-কার্য্যে যাঁহারা দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই কৃপা করিয়া সেগুলি পরিপূর্ণ করিয়া দিবেন। আশা করি, এই প্রকারের কার্য্যে বিশেষজ্ঞগণ সাহায্য করিতে কখনই কৃপণতা করিবেন না। কারণ, এ কথা বোধ হয় নির্ব্বিবাদে সকলই স্বীকার করিবেন যে, বর্ত্তমান চিত্রশালার প্রতি কর্ত্তব্য কোন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষীণ গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে। ইহার কর্ত্তব্য সমগ্র দেশের কর্ত্তব্য। সমস্ত পাশ্চাত্য সমাজ আমাদের এই শুভ অনুষ্ঠানের পূর্ণতা দেখিবার জন্য বহুদিন হইতেই সাগ্রহে চাহিয়া রহিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের

নবম সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণ

১৩২১ বঙ্গাব্দ

(স্থাপিত ১৩১২ বঙ্গাব্দ ১১ই বৈশাখ)

১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে এই সভা দশম বর্ষে উপনীত হইয়াছে।

সদস্য সংখ্যা :—

	আজীবন সদস্য	বিশিষ্ট সদস্য	অধ্যাপক সদস্য	সহায়ক সদস্য	ছাত্র সদস্য	একুন	সাধারণ সদস্য শাখা সভার অধিকারপ্রাপ্ত	সাধারণ সদস্য উভয় সভার অধিকারপ্রাপ্ত	একুন
১৩১৯ অষ্টমবর্ষ	১	৫	৪	১২	৬	২৮	২৫০	১৩০	৪০৮
১৩২০ নবমবর্ষ	১	৫	৪	১২	৬৬	৮৮	২৫৯	১২৯	৪৮৮

আজীবন সদস্য ঃ—টেপার অন্যতম দানশীল ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অন্নদামোহন রায় চৌধুরী মহাশয় সভার স্থায়ী ধনভাণ্ডারে এককালীন ২০০০৲ টাকা প্রদানপূর্ব্বক আজীবন সদস্যের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার মহদ্দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশীয় ভূম্যধিকারী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

বিশিষ্ট সদস্য ঃ—দেবীযুদ্ধপ্রণেতা প্রবীণ একনিষ্ঠ সাহিত্যিক আসাম-শ্রীহট্টনিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, মহাশয় এই সভার বিশিষ্ট সদস্যের পদ গ্রহণ করিয়া এই সভার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন।

অধ্যাপক সদস্য ঃ—মূল সভার নূতন নিয়মাবলী অনুসরণপূর্ব্বক আলোচ্যবর্ষে এই সভায় চারিজন অধ্যাপক সদস্য গ্রহণ করা হইয়াছে। উক্ত সদস্য চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন-তর্ককণ্ঠ এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভার প্রবন্ধ-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জানকীনাথ তর্করত্ন এবং শ্রীযুক্ত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের অনুগ্রহ লাভে সভা এখনও সমর্থ হন নাই।

সহায়ক সদস্যঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও শ্রীযুক্ত রেয়াজউদ্দীন আহাম্মদ সহায়ক সদস্য হইয়াছেন। দ্বাদশ জন সহায়ক সদস্য মধ্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহাশয় ছাত্র-সভার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে মহাশয় আসামের প্রাচীন পুথি ও বৈষ্ণবগ্রন্থ সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া সভার মুখপত্রে প্রকাশ জন্য প্রদান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত মোহিনীকুমার বসু ওভারসিয়ার মহাশয় সভার অধিবেশনাদির উদ্যোগে যথাশক্তি পরিশ্রম করিয়াছেন।) অবশিষ্ট সদস্যের নিকট সভা আলোচ্যবর্ষে সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। সহায়ক সদস্যগণ সভার বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনে সাহায্য করিবেন এরূপ প্রতিশ্রুত হওয়ায় সদস্যের যাবতীয় অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের দ্বারা প্রতিশ্রুতি রক্ষিত না হইলে তদপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে। ('ক' পরিশিষ্টে সদস্য তালিকা দ্রষ্টব্য)

ছাত্র-সদস্য ও ছাত্রসভার অধিবেশনাদিঃ—আলোচ্যবর্ষে ৬০ জন ছাত্র-সদস্য গৃহীত হইয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ সরকারকে ছাত্রসভার সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। আলোচ্য বর্ষে ছাত্রসভার সাতটি অধিবেশন হইয়াছে। ('খ' পরিশিষ্টে ছাত্র-সভার কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত হইল) অনুসন্ধান-কার্য্যে মাত্র দুইটি ছাত্রসদস্য সভাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছেন। ছাত্রসভার সদস্য সংখ্যার তুলনায় সভা আরও অধিক সাহায্য প্রত্যাশা করেন। ১৩২০ বঙ্গাব্দের জন্য ছাত্রসদস্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ চারিটি পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহার ফল আগামী বর্ষে প্রকাশিত হইবে। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত তিনটি পুরস্কার ছাত্রসদস্যগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে :---

শ্রীযুক্ত নবসুন্দর দাসের পত্নীর স্মরণার্থ,—

পুরস্কার		যে বিষয়ের জন্য	পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্র সদস্য
১ম পুরস্কার মূল্য	৬৲	সভার বিশেষ প্রকার সাহায্য হেতু	শ্রীকালীপদ বাগ্‌ছী।
২য় " "	৫৲	প্রবন্ধ রচনার জন্য	শ্রীশ্যামাপদ বাগ্‌ছী।
৩য় " "	৪৲	চিত্র সংগ্রহের জন্য	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ছাত্র সভার ফল কিঞ্চিৎ আশাপ্রদ।

সাধারণ সদস্য

(উভয় সভার অধিকারপ্রাপ্ত)

১৩১৯ সালের মোট সদস্য-সংখ্যা ১৩০

বাদ

উভয় সভার চাঁদা প্রদানে অশক্ত হওয়ায় কেবলমাত্র শাখা সভার অধিকার প্রাপ্ত---	৩
দুই বৎসরের ঊর্দ্ধকাল চাঁদা বাকী রাখায় সদস্য-পদ হইতে অপসৃত—	১
মৃত—	২
একুন	৬

অবশিষ্ট ১২৪ একশত চব্বিশ জন।

১৩২০ সালে নব-নির্ব্বাচিত— ৫ পাঁচ জন।

একুন সদস্য-সংখ্যা ১২৯ একশত উনত্রিশ জন।

সাধারণ সদস্য

(কেবল শাখাসভার অধিকারপ্রাপ্ত)

১৩১৯ সালে মোট সদস্য-সংখ্যা —২৫০

বাদ

দুই বৎসরের অধিককালের চাঁদা বাকী রাখায় সদস্য পদ

হইতে অপসৃত ৯

অবশিষ্ট ২৪১ দুইশত একচল্লিশ।

উভয় সভার সদস্য হইতে পরিবর্ত্তিত— ৩

নব নির্ব্বাচিত— ১৫

একুন সদস্য সংখ্যা ২৫৯ দুইশত উনষাট।

১৩২০ সাল পর্য্যন্ত সদস্যগণের নিকট বাকী চাঁদার পরিমাণ

১৩১৯ সালের বাকীর পরিমাণ

উভয় সভার অধিকারপ্রাপ্ত ৪৭ জন সদস্যের নিকট ৩১৮॥০

কেবল শাখা-সভার অধিকারপ্রাপ্ত ৩৯ জন সদস্যের নিকট

১৩২০ সন পর্য্যন্ত বাকী ২৫৩॥০

মোট ৫৭২৲ পাঁচশত বায়াত্তর টাকা।

উভয় সভার অধিকারপ্রাপ্ত সভ্যপদ হইতে অপসৃত দুই জন সদস্যের নিকট ১৩১৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সভার চাঁদা বাবদে— ৯৲

দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে অপসৃত ৯ জন সদস্যের নিকট সভার চাঁদা বাবদ— ১০৩৲

পরিবর্ত্তিত তিন জন সদস্যের নিকট— ১০৲

মৃত দুই জন সদস্যের নিকট— ১৫॥০

মোট ১৬ ষোল জন সদস্যের নিকট সভার ক্ষতি হইয়াছে। ১৩৭।০

আয়-ব্যয়।

১৩১৯ সালের ব্যয় বাদে উদ্বৃত্ত— ৭১৬৷০

১৩২০ সালের সর্ব্বপ্রকারে মোট আয়— ৫৭১৮৷৵৩

একুন— ৬৪৩৫৷৵৩

১৩২০ সালে সর্ব্বপ্রকারে মোট ব্যয়— ১৮৬৪॥৵৩

অবশিষ্ট—৪৫৭০৷০

চারি হাজার পাঁচশত সত্তর টাকা বার আনা।

বিত্তং

স্থায়ী ধনভাণ্ডারে মজুদ—	৩০০০
গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিল—	১৪০০৲
অন্যান্য তহবিল—	১৭০৸০
মোট—	৪৫৭০৸০

চারি হাজার পাঁচশত সত্তর টাকা বার আনা।

সদস্যের মৃত্যু ঃ—উভয় সভার অধিকারপ্রাপ্ত সদস্য ছন্দোবোধ-শব্দসাগর-প্রণেতা হরিদেবপুর (রঙ্গপুর) নিবাসী প্রবীণ সাহিত্যিক কালীমোহন রায়চৌধুরী ও রঙ্গপুরের প্রবীণ উকীল গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ বি এল্ মহাশয়দ্বয় আলোচ্যবর্ষে পরলোকে গমন করিয়াছেন। উত্তরবঙ্গের ইহাতে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই।

অষ্টম সাম্বৎসরিক অধিবেশন।

২০ ও ২১শে বৈশাখ শনি ও রবিবার (১৩২০ বঙ্গাব্দ) কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপতিত্বে এই সভার অষ্টম সাম্বৎসরিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রথম দিবস এই সভা-সংস্পৃষ্ট ছাত্র-সভার অধিবেশন এবং দ্বিতীয় দিবস বার্ষিক অধিবেশন সংঘটিত হয়। বঙ্গ-সাহিত্যের পৃষ্ঠ-পোষক মাননীয় মহারাজ বাহাদুরকে এই উপলক্ষে রঙ্গপুর-পরিষৎ, তৎসংস্পৃষ্ট ছাত্রসভা ও বেলপুকুরপল্লীপরিষৎ হইতে তিনখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হয় ("গ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। মাননীয় মহারাজবাহাদুর সাদরে এই অভিনন্দন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ছাত্র-সদস্যগণের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ "নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি" বিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য তিনি ৫০৲ টাকা মূল্যের একটি সুবর্ণপদক প্রদানে প্রতিশ্রুত হন এবং ছাত্র-সদস্যগণকে সাদরে আহ্বানপূর্ব্বক পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইবার ব্যবস্থা করেন। এই অধিবেশনেই শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ বি এল্ মহাশয় উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে যোগদানার্থ দিনাজপুরবাসীর পক্ষ হইতে সাহিত্যিকগণকে আমন্ত্রণ করেন। এই অধিবেশনের বিস্তৃত কার্য্য-বিবরণ সভার মুখপত্রে প্রকাশিত হইবে।

সপ্তমবর্ষের মাসিক সাধারণ অধিবেশন।

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	পঠিত প্রবন্ধ ও তাহার লেখক	প্রদর্শিত দ্রব্য ও তাহার প্রদর্শক	অন্যান্য আলোচনা
প্রথম অধিবেশন ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০, ২৫ মে, ১৯১৩, রবিবার।	গৌড়-পাণ্ডুয়া প্রদর্শক—প্রথমাংশ। শ্রীহরিদাস পালিত।	মহাম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায়ের বাড়ীর কারুকার্য্য-বিশিষ্ট ইষ্টক—শ্রীকালীপদ বাগ্‌ছী। একখানি প্রাচীন পুঁথি ও একটি চীনদেশীয় রৌপ্যমুদ্রা—শ্রীমান্ কালীপদ বাগ্‌ছী (ছাত্র-সদস্য)	(১) সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে শোক-প্রকাশ। (২) উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দিনাজপুরে আহূত ষষ্ঠ অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার জন্য এ সভার পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন। মহামান্য বঙ্গীয় গবর্ণর বাহাদুরের রঙ্গপুর পরিদর্শনোপলক্ষে এ সভার পক্ষ হইতে তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা।
দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন ১৫ই আষাঢ়, ১৩২০, ১৯ জুন, ১৯১৩, রবিবার।	ঐ দ্বিতীয়াংশ।	দিনাজপুর-বাণগড়েপ্রাপ্ত নানা-করা বিবিধ প্রকারের মৃদ্‌-ভাণ্ডের অংশ ও প্রস্তরনির্ম্মিত মকরাকৃতি পয়ঃপ্রণালী—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ সেন জমিদার।	গবর্ণর বাহাদুরের অভ্যর্থনাদির-ব্যবস্থা।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন ১ ভাদ্র, ১৩২০, ১৭ আগষ্ট, ১৯১৩, রবিবার।	সদ্‌গ্রন্থের তালিকা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, ঢাকার মস্‌লিন্ এ, এফ্, এম্, আবদুল আলী এম্ এ, কুণ্ডীর ইতিহাস শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী।	ধুবইল রাজবাটীতে প্রাপ্ত কারু-কার্য্যবিশিষ্ট কয়েকখানি ইষ্টক—শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী।	ছন্দবোধ-শব্দসাগর প্রণেতা কালীমোহন রায়চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ।
চতুর্থ মাসিক অধিবেশন ২২ ভাদ্র, ১৩২০, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩।		একটি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা। রঙ্গপুর ধাপ-মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমদাসুন্দরী দেবী।	মন্থনার ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা ভবসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী কর্ত্তৃক এ সভার গৃহ-নির্ম্মাণ-তহবিলে এককালীন ১২০০৲ টাকা দানের ঘোষণা ও তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। টেপার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অন্নদামোহন রায়চৌধুরী মহাশয় এ সভার স্থায়ী ধনভাণ্ডারে এককালীন ২০০০৲ টাকা দান করায় তাঁহাকে আজীবন সদস্যরূপে গ্রহণ।
পঞ্চম মাসিক অধিবেশন ২১ অগ্রহায়ণ, ১৩২০, ৭ ডিসেম্বর, ১৯১৩ রবিবার।	ইংরাজ-রাজত্ব শ্রীঅবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ	মৃত্তিকানিম্ন হইতে উদ্ধৃত গণেশ-মূর্ত্তি শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী।	শোক-প্রকাশ :—এ সভার আজীবন সদস্য কোচবিহারের মহারাজ রাজ-রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের অকাল-মৃত্যুতে।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন ২৭ পৌষ, ১৩২০, ১১ জানুয়ারী, ১৯১৪, রবিবার।	অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্র	সভাকর্ত্তৃক ক্রীত দুইটি চীন রৌপ্যমুদ্রা।	নানাবিধ গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা গুরুনাথ কাব্যতীর্থ-বিদ্যানিধি মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ।
সপ্তম মাসিক অধিবেশন ৩ ফাল্গুন, ১৩২০, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪, রবিবার।	আর্য্যভট্টের সময়-নিরূপণ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	দুইখানি প্রাচীন পুঁথি শ্রীযাদব চন্দ্র াস।	কবিবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে আনন্দপ্রকাশ পাবনায় আহূত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের দিন-নির্দ্ধারণ ও নাটোরের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরকে ঐ সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচন। মহামান্য বঙ্গীয় গবর্ণর বাহাদুর এ সভার চিত্রশালা পরিদর্শনপূর্ব্বক কলিকাতা হইতে তাঁহার সহকারী মহাশয়ের মধ্যবর্ত্তিতায় যে মন্তব্য প্রেরণ করেন তাহা পঠিত হয়। বিদ্যোদয় পত্রিকা-সম্পাদক পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ। পাবনা-সম্মিলনে উপস্থিত হইবার জন্য প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন।

অধিবেশন	প্রবন্ধ	প্রদর্শিত দ্রব্য	প্রস্তাব
অষ্টম মাসিক অধিবেশন ১৫ চৈত্র, ১৩২০, ২৯ মার্চ্চ, ১৯১৪, রবিবার।	অবগুণ্ঠনের ইতিহাস শ্রীরাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য বা মণি-ভূমিকা কর্ম্ম শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন বিদ্যানিধি	কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী শ্রীবসন্তকুমার লাহিড়ী	এই সভার অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ও ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ের "কবি সম্রাট্" উপাধি-প্রাপ্তিতে আনন্দ-প্রকাশ।
	পদ্মাপুরাণের কবি নারায়ণদেবের বংশ-তত্ত্ব শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি, এ	কান্তজীর মন্দিরের স্খলিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টক শ্রীনগেন্দ্র-নাথ সরকার ও শ্রীপুলিনবিহারী সেন।	নবম সা ৎসরিক অধিবেশনের দিন নির্দ্ধারণ

প্রবন্ধের বিষয়-বিভাগ।

আলোচ্য বৎসরে পঠিত ১০টি প্রবন্ধের মধ্যে ৫টি ঐতিহাসিক, দুইটি প্রাত্নতত্ত্বিক এবং তিনটি সাধারণ সাহিত্যিক-বিষয় অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, এ বৎসর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের অভাব হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই, মহাশয়ের রাসায়নিক-কৃষি-সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ সভার মুখপত্রে বিগত বর্ষ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। এই প্রবন্ধগুলি সভায় পঠিত হইলে সভার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের অভাব দূর হইত। আশা করি লাহিড়ী মহাশয় আগমী বর্ষে তাঁহার প্রবন্ধগুলি সভায় পাঠ করিবেন।

প্রদর্শিত দ্রব্য-সম্বন্ধে আলোচনা।

আলোচ্য বর্ষে প্রাচীন পুঁথি-সংগ্রহ-কার্য্যে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র দাস সভাকে সাহায্য করিয়াছেন। মুদ্রা-বিভাগে যে তিনটি মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে একটি ধাপ মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমদাসুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক উপহৃত। অপর দুইটি সভাকর্ত্তৃক ক্রীত। মূর্ত্তি-বিভাগে সম্পাদক কর্ত্তৃক উপহৃত ধাতুনির্ম্মিত একটি গণেশ-মূর্ত্তি ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ সেন জমিদার মহাশয়ের উপহৃত প্রস্তরনির্ম্মিত মকরাকৃতি পয়ঃ-প্রণালী এবং বিবিধ ঐতিহাসিক নিদর্শন-বিভাগে এই সভার ছাত্র-সদস্য শ্রীমান্ কালীপদ বাগ্‌ছী, শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ সরকার ও শ্রীমান পুলিনবিহারী সেন ও শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সংগৃহীত কতকগুলি কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টক উল্লেখযোগ্য

আলোচ্য বর্ষে দুইটি মাত্র বিশেষ-অধিবেশন হইয়াছিল :—

বিশেষ অধিবেশন।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২০, ১লা জুন ১৯১৩ সাল, রবিবার।

এই অধিবেশনে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে আই, সি, এস্ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলে শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় শোকপ্রকাশ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত এ, এফ্, এম্ আবদুল আলী কর্ত্তৃক তাহা সমর্থিত হইলে সমগ্র সভ্যমণ্ডলী এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

সভাপতি-সম্বর্দ্ধনার্থ বিশেষ অধিবেশন।

১৪ই কার্ত্তিক ১৩২০, ৩১শে অক্টোবর ১৯১৩, রবিবার।

এই সভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহাশয়ের সভাপতিত্ব-গ্রহণের অত্যল্প কালমধ্যে সভার নানা হিতসাধনপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমনহেতু এ সভার পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। এই সভায় তাজহাটের শ্রীযুক্ত রাজা গোপাললাল রায় মহোদয় সভাপতিত্বে বৃত হইয়াছিলেন।

সম্পাদক মহাশয় সভার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করেন এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, বি, এল্, শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল্, শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহাম্মদ মোজাম্মল, শ্রীমান্ ফণিভূষণ মজুমদার (ছাত্র সদস্য), শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীযুক্ত অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, দে মহোদয়ের গুণাবলীর উল্লেখ করেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন।

আলোচ্য বর্ষে—১৬ জন কর্ম্মচারী এবং সদস্যগণ-নির্ব্বাচিত ২০ জন, একুনে ৩৬ জন সদস্য লইয়া মূল সভার নূতন নিয়মাবলী অনুসরণপূর্ব্বক কার্য্য-নির্ব্বাহকসমিতি গঠিত হইয়াছিল।

উহার ৫টি সাধারণ মাসিক অধিবেশনে আলোচিত বিষয়গুলির প্রারম্ভিক আলোচনা হয়। তদতিরিক্ত ঐ সকল অধিবেশনে নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল :—

প্রথম অধিবেশন—১লা ভাদ্র ১৩২০।

১। পাবনায় আহূত সম্মিলনের সময়-অবধারণ ও সভাপতি-নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা।

২। মূল সভার সহিত এ সভার আর্থিক-সম্বন্ধ রক্ষাবিষয়ে আলোচনা হইয়া স্থির হয় যে, সম্পাদক মহাশয়ের সহিত ঐ সভার গত ২৩শে আষাঢ় (১৩২০) তারিখে পরামর্শ হওয়ার পর যে দুইটি মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল তাহার প্রথমটি নিম্নলিখিত সামান্য পরিবর্ত্তনসহ অনুমোদন করা গেল।

রঙ্গপুর-শাখা ১৩২০ বঙ্গাব্দ হইতে আর রঙ্গপুর জেলার বাহিরে প্রথম শ্রেণীর সদস্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র পর্য্যন্ত রঙ্গপুর জেলা ও রঙ্গপুর জেলার বাহির হইতে যে সমস্ত প্রথম শ্রেণীর সদস্য সংগৃহীত হইয়াছেন, নিয়মিতভাবে মূল সভায় ৩৲ টাকা এবং শাখা সভার প্রাপ্য ৩৲ টাকা চাঁদা প্রদান করিলে ভবিষ্যতেও তাঁহারা সাধারণ সদস্যের যাবতীয় অধিকার সহ উভয় সভার সাধারণ সদস্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব-সম্বন্ধে সভার মত এই :—

প্রথম শ্রেণীর সদস্যগণের নিকট মূল সভার প্রাপ্য ৩৲ টাকা ১৩২০ বঙ্গাব্দের প্রথম হইতে মূল সভা আদায় করিবেন এবং মূল সভার পত্রিকাদি তথা হইতে বিতরিত হইবে। শাখা-সভা মূল সভার গ্রন্থাদি ও উনবিংশ ভাগ পত্রিকা ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা হইতে বিতরণ-ভার গ্রহণ করিবেন না। বাকী ৩৲ টাকা যাহা শাখাসভার প্রাপ্য তাহা শাখাসভা নিজেই আদায় করিবেন, মূল সভা তাহা আদায় করিতে পারিবেন না। ১৩১৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর সদস্যগণের নিকট বাকী চাঁদার অর্দ্ধাংশ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অর্দ্ধেক মূল সভা অর্দ্ধেক শাখাসভা আদায় করিবেন।

৩। কর্ম্মচারিগণের বেতনবৃদ্ধির ব্যবস্থা।

৪। বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে চারিটি পুরস্কার ছাত্র সদস্যগণ মধ্যে বিতরিত হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে তত্তদ্ বিষয়ক প্রবন্ধ আহ্বানের ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় অধিবেশন—২১শে অগ্রহায়ণ ১৩২০।

১। শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের সামাজিক ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ এ সভার গ্রন্থাবলীভুক্ত করিয়া মুদ্রণের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শীতলাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের উপরে উহার পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার ভার অর্পিত হয়।

২। ধাপ মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমদাসুন্দরী দেবীর ব্যয়ে কবি দুর্গাপ্রসাদ-রচিত সত্যনারায়ণের পাঁচালী গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা।

৩। ৺নরেন্দ্রনাথ বক্সীর স্মৃতিরক্ষার্থ ৫০৲ টাকা সাদরে গৃহীত হয়।

তৃতীয় অধিবেশন

১। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি সভায় প্রথম পঠিত হইয়া মতামতের জন্য উত্তরবঙ্গে বিতরণের ব্যবস্থা।

২। কাজি হেয়াৎ মামুদের বাসস্থান-নির্ণয়ের ভার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয়ের উপর অর্পিত হয়।

চতুর্থ অধিবেশন—১৫ই চৈত্র, ১৩২০।

কলিকাতায় আহূত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৭ম অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্য এ সভার পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন :—

কবিসম্রাট্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন।
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ পত্রিকাধ্যক্ষ।
" " অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।
" গণেন্দ্র নাথ পণ্ডিত।
" ভূজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।
" অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।
" সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মোক্তার।
" অনন্তকুমারদাস গুপ্ত।
" পরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ,
শ্রীমান্ কালীপদ বাগ্ছী।
" বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থ-প্রকাশ।

কোচবিহারের রাজমন্ত্রী শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয়ের সঙ্কলিত আহ্নিকাচার-তত্ত্বাবশিষ্ট গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইয়াছে।

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের আদিকাণ্ডের মুদ্রণ শেষ হইয়া সদস্যগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল মহাশয়ের বগুড়ার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড সভার গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে।

কামাখ্যা-উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণ প্রকাশের ব্যয় মোট ১২১৸৵৬ টাকা মধ্যে সম্মিলন অভ্যর্থনা-সমিতির নিকট প্রাপ্ত ৫৫৲ টাকা বাদে সভার তহবিল হইতে ৬৬৸৵৬ টাকা প্রদান করা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছে।

পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় রচিত "নামকোষ" নামক গ্রন্থ রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিট বোর্ডের ব্যয়ে সভা হইতে প্রকাশিত হইবার জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। তদনুসারে ডিষ্ট্রিট বোর্ড ঐ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার ভার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের উপর অর্পণ করেন। গ্রন্থখানি কিছু পরিবর্ত্তন করিলে প্রকাশ-যোগ্য হইবে বলিয়া তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ মন্তব্য গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

ভক্তচরিতামৃতের মুদ্রণ ব্যয় শ্রীযুক্ত শশিমোহন অধিকারী মহাশয় প্রদান করিতে সম্মত ছিলেন। বহু পত্র-ব্যবহার করিয়াও তাঁহার নিকট হইতে মুদ্রণ-ব্যয় সংগ্রহ না হওয়ায় উহা মুদ্রিত হইতে পারে নাই। সভা এই গ্রন্থ প্রকাশের অন্য ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দকেলি মুন্সী মহাশয়ের রচিত "নিমাই চরিত" গ্রন্থের পাণ্ডলিপি সভার হস্তগত হইয়াছে। মুন্সী মহাশয় গ্রন্থ মুদ্রণ বাবদে ১৩৯৲ টাকা সভার হস্তে প্রদান করিয়াছেন। সত্বরেই ঐ গ্রন্থের পাণ্ডলিপি পরীক্ষিত হইয়া সভা হইতে গ্রন্থখানি মুদ্রণ-যোগ্য বিবেচিত হইলে মুদ্রিত হইবে।

শেখ-শুভোদয়া—শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় শেখ-শুভোদয়া নামক মূল প্রাচীন গ্রন্থের আংশিক অনুলিপি প্রকাশার্থ সভার হস্তে প্রদান করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুলিপি প্রাপ্ত হইলে গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে স্থির হইয়াছে।

দিনাজপুর-সম্মিলন।

গত ১৩২০ বঙ্গাব্দে ৩০ জ্যৈষ্ঠ তারিখে দিনাজপুর থিয়েটার হলে এই সম্মিলনের অধিবেশন হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় এই সভার সভাপতিপদ গ্রহণ করেন। সভায় বঙ্গদেশস্থ বহু সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠের পর উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক মহাশয় তাঁহার বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ করেন। এই ভাবে প্রথম দিনের কার্য্য শেষ হয়। দ্বিতীয় দিবস কামরূপ-

অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদকের কার্য্য-বিবরণ পাঠের পর নিম্নলিখিত ৭টি প্রস্তাব যথাক্রমে উত্থাপিত, সমর্থিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয় :—

১। স্থানীয় চিত্রশালা-স্থাপনে গভর্ণমেণ্ট অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এ জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

২। সম্মিলনের অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে আপনাদের কার্য্য-বিবরণ সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্পাদকের নিকট পাঠাইবার জন্য উত্তরবঙ্গের যাবতীয় সাহিত্য-সমিতিগুলিকে অনুরোধ করা হয়।

৩। রিয়াজ্-উস্-সালাতিন্-প্রণেতার সমাধির উপরে স্মৃতিফলক-স্থাপনের ব্যয় ও কর্ম্মভার-গ্রহণে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও হেয়াৎ মামুদ, অদ্ভুতাচার্য্য ও কবিবল্লভের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৪। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া সভ্যদিগের মধ্যে বিতরণ ও মতামত গ্রহণের জন্য সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিকে অনুরোধ করা হয়।

৫। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রণীত শিশু সাহিত্য—"বাঙ্গালার প্রতাপ" গ্রন্থের পরীক্ষার ভার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের উপর অর্পিত হয়।

৬। মুদ্রাযন্ত্রের পূর্ব্বে কাষ্টফলকে খোদিত বগুড়ার কোনও কবির গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষদে আছে; তাহার প্রতিকৃতি মুদ্রণের জন্য উক্ত পরিষৎকে অনুরোধ করা হয়।

৭। দিনাজপুরে একটি চিত্রশালা-স্থাপনের জন্য তত্রত্য দেশবাসীকে অনুরোধ করা হয়।

ইহার পর অনেকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ ও সারগর্ভ বক্তৃতা হওয়ার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

পাবনা-সম্মিলন।

গত ১৩২০ বঙ্গাব্দে ১০।১১ ফাল্গুন রবি ও সোমবার নাটোরের মাননীয় মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন সংঘটিত হয়। পাবনা ইন্‌ষ্টিটিউসনের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রথম দিবস ১০ ফাল্গুন বেলা ২ ঘটিকার সময় প্রথম অধিবেশন হয়। সভায় গণ্যমান্য এবং বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। গত বৎসরের সভাপতির অভিভাষণ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ এবং সভাপতির অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিবস প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব তিনটি যথাক্রমে উপস্থাপিত, সমর্থিত এবং পরিগৃহীত হয় :—

(১ম) উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের নিয়মাবলী যাহা রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা এই অল্পকাল মধ্যে সম্যক্ আলোচিত না হওয়ায় আগামী অধিবেশনে পরিগ্রহণের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

(২য়) পাবনা জেলার ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের ভার কয়েক জন লোকের উপর অর্পিত হয় এবং ঐ অনুসন্ধানের ফল আগামী অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। এই সঙ্গে যাহাতে ভাষাতত্ত্ব ও প্রবাদ-বচনাদি সংগৃহীত হয় তাহার জন্য বিশিষ্ট কয়েক ব্যক্তিকে অনুরোধ করা হয়। বাঙ্গালার মানব-তত্ত্বালোচনার উদ্দেশ্য পাবনা জেলার বিভিন্ন ধর্ম্ম, বর্ণ, জাতি ও ব্যবসায়ভুক্ত জনগণের ইতিহাস-সংগ্রহের ভারও কয়েক জন লোকের উপর অর্পিত হয়।

(৩য়) কবিবর স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের জন্মস্থান পাবনায়। তাঁহার কোনও স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন-রক্ষার ব্যবস্থা করার নিমিত্ত কয়েক জন ব্যক্তিকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত করা হয়। এবং সে চেষ্টার ফল আগামা অধিবেশনে উপস্থিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

প্রাতঃকালেও সভার কার্য্য শেষ না হওয়ায় অপরাহ্ণেও আর একটি অধিবেশন হয়। এ বৎসরের অধিবেশনে অনেকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধ পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সম্মিলনে যোগদান পূর্ব্বক নানাবিধ উপদেশ দিয়া সভার গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

চিত্রশালা-পরিদর্শন।

বিগত ২৯শে কার্ত্তিক (১৩২০) বঙ্গের সদাশয় গভর্ণর-বাহাদুর এবং তদীয় পত্নী ও চীফ্ সেক্রেটারী (Chief Secretary) রাজসাহী-বিভাগের কমিশনার, রঙ্গপুরের কালেক্টর সাহেব প্রভৃতি রাজপুরুষগণ সহ এই সভার চিত্রশালা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের প্রারম্ভে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিভূরূপে সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে ও সম্পাদকের স্বাক্ষরিত প্রাচীন পুথির আকারে রৌপ্য-পত্রে খোদিত ও চন্দনকাষ্ঠের আবরণী সংযুক্ত অভিনন্দন-পত্র সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। তদীয় পত্নীকে চিত্রশালার সংগৃহীত ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং সভার পৃষ্ঠপোষকগণের চিত্রসম্বলিত একখানি চিত্রাধার (album) উপহার প্রদান করা হয়। সভা হইতে মুদ্রিত যাবতীয় গ্রন্থ ও পত্রিকাদি সুন্দররূপে বাঁধাইয়া গবর্ণর বাহাদুরকে উপহার দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে সভার বর্ষাষ্টকের সচিত্র কার্য্য-বিবরণ ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছিল। অভিনন্দন-পত্র নির্ম্মাণের ব্যয়-বাবদ কাশীম-বাজারের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর দেড় শত টাকা প্রদান করিয়া সভার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ("ষ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

সভায় উপহৃত পত্রিকা ও গ্রন্থাদি

ত্রৈমাসিক—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

মাসিক—প্রবাসী, ভারতী, সাহিত্য, নব্যভারত, সুপ্রভাত, আর্য্যাবর্ত্ত, বঙ্গদর্শন, সাহিত্য-

সংহিতা, মানসী, ঢাকা-রিভিউ ও সম্মিলন, প্রতিভা, কৃষি-সম্পদ, শান্তিকণা, তোষিণী, জন্মভূমি, বসুধা, গৃহস্থ, অলৌকিক রহস্য, Dawn Magazine, হিন্দু পত্রিকা, কোহিনূর, বীরভূমি, জগজ্জ্যোতিঃ, বাঁশরী, আলোচনী, ঊষা, আসাম-বান্ধব, সাহিত্য-সংবাদ, উদ্বোধন, হিন্দুসখা, প্রজাপতি, বৈষ্ণব-সঙ্গিনী, কণিকা, অর্ঘ্য, তারা, তিলি-বান্ধব, পল্লীচিত্র, ভারত-মহিলা, ভারতবর্ষ, মন্দার-মালা, আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষিণী, আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশ, স্বাস্থ্য-সমাচার, ব্যবসায়ী, গৌরাঙ্গ-সেবক, ব্রাহ্মণ-সমাজ, নন্দিনী, বিক্রমপুর, সৌরভ, জাহ্নবী, বিজয়া, বিজ্ঞান, সংসার-সুহৃৎ, মাহিষ্য-সমাজ, ধর্ম্ম-প্রচারক।

পাক্ষিক—সম্মিলনী, Collegian

সাপ্তাহিক—হিতবাদী, বসুমতী, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, ঢাকা-প্রকাশ, বিশ্ববার্ত্তা, আনন্দ-বাজার, শিক্ষা-সমাচার, হিন্দুরঞ্জিকা, গৌড়দূত, মালদহ-সমাচার, আসামবন্তী, প্রসূন, রঙ্গপুর-দিক্‌প্রকাশ, রঙ্গপুর-দর্পণ, সুরমা, সুরাজ।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমত্যনুসারে
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক।

সর্ব্বসম্মতিতে পরিগৃহীত হইল।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
নবম সাম্বৎসরিক অধিবেশনের সভাপতি।

"ক" পরিশিষ্ট।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ "রঙ্গপুর-শাখার সদস্য-তালিকা।"

আজীবন সদস্য।

শ্রীল শ্রীযুক্ত অনারেবল মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কাশিমবাজার।
" অন্নদামোহন রায়চৌধুরী জমিদার টেপা রঙ্গপুর।

বিশিষ্ট সদস্য।

কবিসম্রাট্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন রঙ্গপুর।
শ্রীযুক্ত অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্ব-সরস্বতী এম্ এ গৌহাটী।
" অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পঞ্চানন বি, এল্ ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

পণ্ডিত „ কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন শাস্ত্রী, এম্, এ, কুচবিহার।
রায় „ শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই লাসাভিলা, দার্জ্জিলিঙ্গ।
„ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, বেগমপুর, শ্রীহট্ট।

অধ্যাপক সদস্য।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকীনাথ তর্করত্ন ক্রোকদি, ফরিদপুর।
„ বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য, ৭৭ জঙ্গমবাড়ী, বেনারস।
„ যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, কালীধাম, রঙ্গপুর।
„ হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ রঙ্গপুর।

সহায়ক সদস্য।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ রঙ্গপুর।
„ বিধুশেখর শাস্ত্রী ৩৪ বারাণসী ঘোষেরষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মুকদুমপুর, মালদহ।
অধ্যাপক „ বিনয়কুমার সরকার এম্, এ, পাণিনি-কার্য্যালয়, এলাহাবাদ।
„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
„ গোপালকৃষ্ণ দে, কর্জ্জনহল লাইব্রেরী, গৌহাটী।
„ উমেশচন্দ্র দে, ডেঃ কমিশনার অফিস, ধুবড়ী।
„ কুমুদনাথ লাহিড়ী, জাতীয় বিদ্যালয়, মালদহ।
„ শশীমোহন অধিকারী, ভোটমারী, রঙ্গপুর।
„ মোহিনীকুমার বসু, Sub-overseer, রঙ্গপুর।
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১নং মিশন রো, কলিকাতা।
„ শেখ রেয়াজুদ্দীন আহাম্মদ তুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।

সাধারণ সদস্য।

সদর

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ জমিদার।
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ পাকড়াশী জমিদার।
„ যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী ডাক্তার।
„ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্, এম্, এস্।
„ হৃষীকেশ লাহিড়ী এম্, বি।
„ এককড়ি স্মৃতিতীর্থ।
„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার।
„ আশুতোষ মজুমদার বি, এল্।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ।
„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল্।
„ কালীনাথ চক্রবর্ত্তী।
„ ভুবনমোহন সেন।
„ বিপিনচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার।
„ আশুতোষ মজুমদার নায়েব।
„ যদুনাথ মিত্র।
„ রক্ষাচন্দ্র লাহিড়ী মোক্তার।
„ যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল্।

শ্রীযুক্ত দীননাথ বাগছী ম্যানেজার।
" মদনগোপাল নিয়োগী।
" কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্।
" রজনীকান্ত মৈত্রেয় ম্যানেজার।
" কালীকান্ত বিশ্বাস সবইং পুলীশ।
" সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্।
" নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী।
" পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল্।
" প্রসন্নকুমার দাস।
" অক্ষয়কুমার সেন বি, এল্।
" যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত বি, এল্।
" যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্।
" ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি, এল্।
" সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত।
" কৃষ্ণশঙ্কর চৌধুরী।
" শরচ্চন্দ্র মজুমদার।
" মুকুন্দলাল রায়।
" রাধারমণ মজুমদার জমিদার।
" শীতলাকান্ত গাঙ্গুলী এম্, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্।
" চন্দ্রমোহন ঘোষ।
" হরিনাথ অধিকারী।
" ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্।
" খান তসলিমউদ্দীন আহাম্মদ বাহাদুর বি, এল্।
" তৈয়বউদ্দীন আহাম্মদ।
" সৈয়দ আবুলফত্তা সাহেব জমিদার।
" ডাক্তার মহম্মদ মোজাম্মল্।
" মৌলবী হাফেজ উল্ল্যা।
" আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী হার এম্, এ, বি, এল্।
" পূর্ণচন্দ্র নন্দী জমিদার।
" মহম্মদ ছরমত উল্ল্যা।
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়।
" বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য।
" রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার।
" বৈকুণ্ঠচন্দ্র সেন।
" মাহমুদআলী চৌধুরী।
" মৌলবী কোরবান উল্ল্যা।
" শরচ্চন্দ্র বসু।
" এ, এফ, এম্, আব্দুলআলি এম্, এ।
" যতীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী জমিদার।
" নৃপেন্দ্রনারায়ণ রুদ্র জমিদার।
" অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার।
" সিদ্ধেশ্বর সাহা।
" গোপীনাথ ঘোষ।
" যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ।
" গোপালচন্দ্র ঘোষ বি, এ।
" গোপালচন্দ্র দাস।
" সতীশচন্দ্র শিরোমণি।
" রোহিণীকান্ত মৈত্রেয়।
" কিশোরীমোহন হালদার।
" মোহন্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী।
" ভৈরবগিরি গোস্বামী।
" মহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
" বৈকুণ্ঠেশ্বর ভট্টাচার্য্য।
" রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য।
" নগেন্দ্রনাথ পণ্ডিত।
" লোকনাথ দত্ত ম্যানেজার।
" নরেশচন্দ্র বসু।
" কুমার যামিনীবল্লভ সেন জমিদার।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ বাহাদুর।
" আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই।
" ভবতারণ লাহিড়ী এম্. এ, বি, এল্।
অনন্তকুমার দাসগুপ্ত।
উপেন্দ্রনাথ সেন।
রাধাকৃষ্ণ রায় উকিল।
কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরাজ।
সত্যেন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী জমিদার।
শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দে মোক্তার।
" বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মুন্সেফ,
" শ্রীশচন্দ্ররায় মুন্সেফ্।
" নরেশচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার।
দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন
সতীশকমল সেন, বি. এল্।
নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বি, এল্।
নলিনীকান্ত ঘোষ।
কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য এল্ এম্ এস্।
প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী।

সাধারণ সদস্য (মফঃস্বল)

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু চৌধুরী, জমিদার, সৈদপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
" অতুলচন্দ্র দত্ত, এম্, এ, বি, এল্. ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টার, নোয়াখালি।
" অমূল্যদেব পাঠক বি, এল্ দিনাজপুর।
" অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় নায়েব, বোতলাগাড়ী, সৈদপুর, রঙ্গপুর।
" অখিলচন্দ্র দাসগুপ্ত Sub Asst. Surgeon কিশোরগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
" অতুলচন্দ্র দাস গুপ্ত, পেস্কার, গোপালপুর, পোঃ শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
কুমার শ্রীযুক্ত অমীন্দ্রনারায়ণ মগড়া পোষ্ট, ত্রিপুরা।
" অক্ষয়কুমার পাল, মুন্সেফ্‌কোর্ট, নিলফামারী, রঙ্গপুর।
" আশুতোষ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ ৪৯ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা।
" আনন্দচন্দ্র সেন, "বণিক প্রেস্" ৭০ নং মীর্জ্জাপুরষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
" আব্দুল আজিজ চৌধুরী, জমিদার, মহীপুর পোষ্ট, গজঘণ্টা, রঙ্গপুর।
শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় আদ্যনাথ ন্যায়ভূষণ, পোঃ গৌরীপুর, আসাম।
চৌধুরী আমানতুল্লা আহাম্মদ, জমিদার, কুচবিহার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য বড়মরিচা পোষ্ট, কুচবিহার।
মৌলবী মহম্মদ আমীরুদ্দীনখান্ ফকিরাবাদ, পোঃ শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" আইমুদ্দীন আহাম্মদ, সেক্রেটারী খোলাহাটী হেদায়েতল আঞ্জুমান ইস্‌লামিয়া খোলাহাটী পোষ্ট, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
মৌলবী আমীরুদ্দীন আহাম্মদ, উকীল, মেক্‌লিগঞ্জ পোষ্ট, কুচবিহার।
" আকবরহোসেন চৌধুরী, জমিদার, নোহালী, পোঃ তুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।
শ্রীযুক্ত আনন্দলাল চৌধুরী, জমিদার, রায়কালী, বগুড়া।

শ্রীযুক্ত ইমানুতুল্লা সরকার, পোঃ কিসামত ফতেমামুদ, ভায়া, হলদিবাড়ী রঙ্গপুর।
„ ঈশানচন্দ্র পালচৌধুরী, জমিদার, মুক্তাটা, পোঃ গুণেরবাড়ী, ময়মনসিংহ।
„ উদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য, মন্থনা বড়তরফ, পোঃ পীরগাছা, রঙ্গপুর।
„ উপেন্দ্রনাথ সরকার, পোঃ তুফানগঞ্জ, কুচবিহার।
„ উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, সেরপুর, বগুড়া।
„ কুমুদবিহারী রায় জমিদার, দমদমা, পাঁচবিবি, বগুড়া।
„ কামাখ্যাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ষ্টেসনমাষ্টার, পোঃ রঙ্গিয়া, গৌহাটী।
„ কামাখ্যাপ্রসাদ মজুমদার, নায়েব, মজুমদার কাছারী, উলীপুর, রঙ্গপুর।
„ কালীকৃষ্ণগোস্বামী বিদ্যারত্ন এম্, এ, বি, এল্ ২০ মীরআতার লেন, ঢাকা।
„ কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ধাপ, রঙ্গপুর।
„ কিশোরীমোহন চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
„ কিশোরীবল্লভ চৌধুরী, এম্, এ, বি এল, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
„ কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী কাব্যতীর্থ, কলিগ্রাম, মালদহ।
„ কৃষ্ণদাস আচার্য্যচৌধুরী জমিদার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
„ কুমুদনাথ চৌধুরী জমিদার, কুঠীবাড়ী, সেরপুর, বগুড়া।
„ কৃষ্ণনাথ সেন জমিদার, কালীতলা, দিনাজপুর।
„ কৃষ্ণলাল চৌধুরী, জমিদার, ইংরেজাবাদ, মালদহ।
„ কৃষ্ণচরণ সরকার, জমিদার, পোঃ কলিগ্রাম, মালদহ।
„ কামিনীমোহন বাগছী, জমিদার, পোঃ বরিয়া, রাজসাহী।
„ কাশীকান্ত মৈত্রেয়, পাতালেশ্বর, বেনারসসিটি।
ডাক্তার „ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭০ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী, Sub Registrar বরিশাল।
„ কিরণচন্দ্র দে, বি, এ, আই, সি, এস্; সি, আই, ই বেঙ্গল সেক্রেটারীয়েট্ হেড আফিস কলিকাতা।
„ কানাইলাল কাশীবাল ৮নং গয়াঘাট, C/o পণ্ডিত বিষ্ণুদত্ত।
„ গঙ্গাচরণ সেন গোয়ালপাড়া, আসাম।
„ গোপালচন্দ্র দাস, বদরগঞ্জ, রঙ্গপুর।
কুমার „ গজেন্দ্রনারায়ণ Bar-at-law কুচবিহার।
„ গোবিন্দকেলী মুন্সী জমিদার, নলডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
„ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি এল, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
„ গোপালচন্দ্র কুণ্ডু Sub. Asst. Surgeon সৈদপুর, রঙ্গপুর।
„ গিরীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী জমিদার, ডুবডাণ্ডার, রঙ্গপুর।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী, দিনাজপুর।

„ গোপাললাল ভাদুড়ী, Surgeon পোঃ পাকুড়িয়া, রাজসাহী।

কুমার „ চন্দ্রকিশোর রায়, বর্দ্ধনকুটিরাজবাড়ী, পোঃ গোবিন্দগঞ্জ, রঙ্গপুর।

„ এস্, চৌধুরী, দুর্গাগঞ্জ, পূর্ণিয়া।

„ জগদীশচন্দ্র মুস্তৌফী, জমিদার, পোঃ গোবরাছড়া, কুচবিহার।

„ জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত, বি, এল্ পোঃ চাঁপাই, নবাবগঞ্জ, মালদহ।

ডাক্তার „ জগৎচন্দ্র সরকার হরিপুর, রঙ্গপুর।

„ তারাসুন্দর রায়, বি এল্, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।

„ তারকচন্দ্র মৈত্রেয়, পোঃ বরিয়া পাকুড়িয়া, ইটালী, রাজসাহী।

„ দুর্গাকমল সেন Sub Registrar, রাইগঞ্জ, দিনাজপুর।

„ দীননাথ সরকার, মোলানখুড়ি, পোঃ ফারাবাড়ী, রঙ্গপুর।

রাজা „ দেবেন্দ্রনাথ কোঙর, পাঙ্গা, রঙ্গপুর।

„ নলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম, এ, বি এল্, বগুড়া।

„ নলিনীকান্ত অধিকারী বি এল্, বালুরঘাট, দিনাজপুর।

„ নরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার, থানসিংপুর, গাইবান্ধা পোঃ, রঙ্গপুর।

„ নগেন্দ্রপ্রসাদ রায় বি এল্, কুচবিহার।

„ নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় C/o কীর্ত্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভাগলপুর।

„ নবীনচন্দ্র সরকার, কালীগঞ্জ, পোঃ ভবানীগঞ্জ, রঙ্গপুর।

অনারেবল রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, গৌরীপুর, আসাম।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ লাহিড়ী, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, চাঁচল-ষ্টেট, মালদহ।

„ প্রিয়নাথ ভৌমিক, আইসঢাল কাছারী, পোঃ সৈদপুর, রঙ্গপুর।

জষ্টিস্ স্যার শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, বি, এল্, এলাহাবাদ।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, অধ্যাপক রাজসাহী কলেজ, রাজসাহী।

„ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল, নায়েব আহেলকার, দীনহাটা পোঃ, কুচবিহার।

„ প্রমথনাথ মুন্সী, জমিদার, পোঃ সেরপুর, বগুড়া।

„ প্রিয়নাথ রক্ষিত, পোঃ ঘাটনগর, দিনাজপুর।

„ প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল, বগুড়া।

রায়চৌধুরী শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন বক্সী, জমিদার, কুচবিহার।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার, কুণ্ডী, গোপালপুর, পোঃ শ্যামপুর, রঙ্গপুর।

„ প্রিয়নাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল C/o ডাক্তার গঙ্গানাথ মিত্র, বর্দ্ধমান।

„ প্রমথনাথ খান, শ্যামগঞ্জ, কুমাপুর, মেদিনীপুর।

শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, হার্ডিং হোষ্টেল, কলিকাতা।
„ প্রিয়কান্ত বিদ্যারত্ন বি, এ, Court Sub-Inspector of Police সিরাজগঞ্জ কোর্ট, পাবনা।
„ বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল, মালদহ।
„ বরদাকান্ত গাঙ্গুলী বি এল, দিনাজপুর।
„ বেণীমাধব দাস, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
ডাক্তার „ বিনোদবিহারী রায়, মালোপাড়া, রাজসাহী।
„ বীরেশ্বর সেন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-অব-পুলিশ গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
„ ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য উকীল, গাইবান্ধা।
„ ভগীরথচন্দ্র দাস মোক্তার, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
„ ভবানন্দ সরকার, জোতদার, ফলিমারী, পোঃ গোবরাছড়া, কুচবিহার।
„ ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ম্যানেজার, কাঞ্চনকাছারী, পোঃ পত্নীতলা, দিনাজপুর।
„ বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন-বিদ্যানিধি রায়কালি, বগুড়া।
„ বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় জমিদার, পোঃ ভূতছাড়া, রঙ্গপুর।
„ বিষ্ণুপ্রসাদ শর্ম্মা, দলইপাণ্ডা কামাখ্যাপাহাড়, গৌহাটী, আসাম।
„ বরদাগোবিন্দ চাকী, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
„ বসন্তকুমার লাহিড়ী, বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ বিমলাচরণ সেনগুপ্ত, Librarian Victoria College, কুচবিহার।
„ বিনোদবিহারী দাস, মুন্সেফী আদালত, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
„ বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী, হেড পণ্ডিত, দমদমা মধ্য ইংরেজী স্কুল, পোঃ পাঁচবিবি, জেলা, বগুড়া।
রায় „ বৈকুণ্ঠনাথ সেন বি, এল বাহাদুর, জমিদার, সৈদাবাদ, মুর্শিদাবাদ।
অনারেবল রাজা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী, কার্শিয়াং, দার্জ্জিলিং।
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার, কুণ্ডী সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
„ মন্মথনাথ মজুমদার, সেক্রেটারী সিয়াইল সারদাচরণ ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরী, হরিপুর পোঃ, পাবনা।
„ খান মোজাঃফর হোসেন চৌধুরী, জমিদার, পালিচড়া, পোঃ শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
„ মহেন্দ্রনাথ অধিকারী, কামনগো, দীনহাটা কোচবিহার।
রায় „ মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী বাহাদুর, জমিদার, কুণ্ডী সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ ঐ।
„ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ-Block Signal Inspector, সৈদপুর, রঙ্গপুর।
„ রায়চৌধুরী মনোমোহন বক্সী, জমিদার, কাচবিহার।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, মোরাদপুর, পাটনা।

„ যাদবচন্দ্র দাস, পোঃ তুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।

„ „ রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ, এফ, আর, এ, এস ইত্যাদি, কটক কলেজ, কটক।

„ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল, উকীল, জজকোর্ট, বড়বন্দর দিনাজপুর।

„ যোগেশচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, রঙ্গপুর।

„ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, জমিদার, হরিপুর, পোঃ জীবনপুর, দিনাজপুর।

„ যদুনাথ রায় বি এল, বালুরঘাট, দিনাজপুর।

„ যতীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, জমিদার, ফতেপুর ইটাকুমারী, পোঃ কালিগঞ্জ, রঙ্গপুর।

„ যতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল, দিনাজপুর।

অধ্যাপক „ যদুনাথ সরকার এম্, এ, পি, আর, এস্, পোঃ মোরাদপুর, পাটনা।

„ রাধাবিনোদ চৌধুরী, খোলাহাটী, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।

„ রজনীমোহন চৌধুরী, জমিদার, মৃজাপুর, দেউলপাড়া পোঃ, রঙ্গপুর।

„ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, উকীল, দীনহাটা, কোচবিহার।

„ রজনীকান্ত সরকার বি, এল, নীলফামারী, রঙ্গপুর।

„ রজনীকান্ত নিয়োগী, মুন্সেফী আদালত, নীলফামারী, রঙ্গপুর।

„ রামকুমার দাস, দেওয়ান, ফতেপুর ষ্টেট্, ইটাকুমারী, পোঃ কালীগঞ্জ, জেলা রঙ্গপুর।

„ রামদাস ঘটক পেস্কার, মুন্সেফী আদালত, গাইবান্ধা।

„ রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী, এম্ এ, বি এল, পাবনা।

„ রজনীকান্ত সরকার, পোঃ রামবাড়ী, মালঞ্চি, রাজসাহী।

„ রামচন্দ্র সেন, বি এল, দিনাজপুর।

„ লক্ষ্মীনারায়ণ রায় কবিভূষণ, গোপালরায়, পোঃ কাকিনা, রঙ্গপুর।

„ শরচ্চন্দ্র সিংহ রায় জমিদার, রায়পুর, পীরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।

„ শশিকিশোর চক্রদার বি, এল, পোঃ নওগাঁ, রাজসাহী।

„ শশীভূষণ ঠাকুর, পোঃ বরিয়া, রাজসাহী।

কুমার „ শরৎকুমার রায় এম্ এ, দয়ারামপুর, রাজসাহী।

„ শশিশেখর মৈত্রেয়, তালন্দ পোঃ, রাজসাহী।

„ সুরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার, পোঃ নলডাঙ্গা, রঙ্গপুর।

„ সূর্য্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সব রেজিষ্ট্রার, দেবীগঞ্জ, জলপাইগুড়ী।

সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকীল, নিলফামারী, রঙ্গপুর

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাচন্দ্র কবিভূষণ, দিনাজপুর রাজবাড়ী পোঃ, দিনাজপুর।
" সতীশচন্দ্র নিয়োগী জমিদার, পোং আদমদীঘি, বগুড়া।
" সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, 'সম্পাদক সাহিত্য-সমিতি' নবগ্রাম, পোঃ হেমনগর, ময়মনসিংহ।
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার, কুণ্ডি, সত্যপুষ্করিণী, পোঃ শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
" সুরেন্দ্রনাথ বক্সী, জমিদার, ইনাতপুর, বড় তরফ, পোঃ মহাদেবপুর, রাজসাহী।
" সারদানাথ খাঁ ন্ বি, এল, বগুড়া।
" সতীশচন্দ্র বড়ুয়া, জমিদার, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, পোঃ আগমনী, গোয়ালপাড়া।
" সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, জমিদার, সব রেজিষ্ট্রার, ডোমার, রঙ্গপুর।
" সারদাগোবিন্দ তালুকদার, পোঃ বাগ্‌দুয়ার, চৈত্রকোল, রঙ্গপুর।
" সারদাপ্রসাদ লাহিড়ী, পোঃ নূনখাওয়া, ভায়া ভিতরবন্দ।
" সতীশচন্দ্র গোস্বামী, মোক্তার, নওগাঁ, রাজসাহী।
" সারদামোহন রায়, জমিদার, হরিদেবপুর, রঙ্গপুর।
" হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার, নীলফামারী, রঙ্গপুর।
" হরিদাস পালিত, কলিগ্রাম, মালদহ।
" হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম্, এ, বি, এল, নায়েব, উলীপুর, রঙ্গপুর।
" হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার, ববনপুর, পোঃ গোবিন্দগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" হরিপ্রসাদ অধিকারী, বিষ্ণাটারী, হরিদেবপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
" হরেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ-বিদ্যাবিনোদ, কলসকাটি, বরিশাল।

"খ" পরিশিষ্ট

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের অনুগত

ছাত্র-সভার দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী

১৩২০ বঙ্গাব্দ

ভগবানের অপার অনুকম্পায় ছাত্রসভা দুর্ব্বল হইলেও আজ দুই বর্ষ ধরিয়া আপনার কর্ত্তব্য-সাধনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে নাই। ১৩২১ বঙ্গাব্দে এই সভা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। পূর্ব্ব বৎসরে সদস্যসংখ্যা ৭৮ জন ছিল। তাহা হইতে ১৮ জন বাদ দেওয়ায় সদস্যসংখ্যা ৬০ জন

হয় এবং আলোচ্য বর্ষে পুনরায় ৬ জন সভ্য বৃদ্ধি হইয়া বর্ত্তমানে সদস্যসংখ্যা মোট ৬৬ জন দাঁড়াইয়াছে। আমাদের ইচ্ছামত সদস্য আমরা রঙ্গপুরে পাই না। কারণ প্রায় সকল ছাত্রই সাহিত্য-সেবার প্রতি উদাসীন।

মূল পরিষদের সম্পাদক এবং আমাদের গুরুস্থানীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের উপদেশমত আমরা সকল কার্য্য করিয়া উঠিতে পারি নাই বটে কিন্তু আশা আছে তিনি আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে যেরূপ হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছেন তাহাতে আমরা শীঘ্রই আশানুরূপ কাজ দেখাইতে পারিব।

ছাত্র-সভার সুযোগ্য স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ললিতমোহন কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থের সভাপতিত্বে এই সভার সাতটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভ্যদের মধ্যে অনেকে মাঝে মাঝে সভায় উপস্থিত হয়েন নাই, এ জন্য সভার কার্য্য ভালরূপে চলে নাই। আশা করি, আগামী বৎসরে সদস্য ভ্রাতৃবৃন্দ এ দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। আলোচ্য বর্ষের সাতটি অধিবেশনে ছয়টি প্রবন্ধ যথাক্রমে পঠিত হয়। প্রবন্ধ গুলির নাম—

১। মুসলমান শাসনে ভারতের অবস্থা
২। চরিত্র-গঠন ও মনুষ্যত্ব
৩। ছাত্র-সভার কার্য্য ও অনুসন্ধান
৪। ছাত্র-জীবনের কর্ত্তব্য
৫। রামায়ণীয় কথা
৬। অনুসন্ধান।

আগামী বৎসরে যাহাতে ঐতিহাসিক এবং নৈতিক প্রবন্ধ অধিক পরিমাণে পঠিত হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। গত ১৩২০ সালের আষাঢ় মাস হইতে ছাত্র-পরিষদ "সাধনা" নামে একখানি হস্তলিখিত মাসিকপত্র প্রকাশ করিতেছেন। পত্রিকাখানি নানা-কারণে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই বর্ষে সেখানি ত্রৈমাসিক করিয়া যাহাতে প্রকাশ করা যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পত্রিকায় মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ এবং মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধসকল স্থান পাইবে।

আলোচ্যবর্ষে অনুসন্ধান-কার্য্যে ছাত্র-পরিষদ মূল সভাকে বিশেষরূপে সাহায্য করিতে না পারিলেও যাহা করিয়াছেন তাহা বিশেষ আশাপ্রদ।

আলোচ্যবর্ষে শ্রীমান পুলিনবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ, শ্রীমান কালীপদ বাগছী এবং সম্পাদক সভাকে সংগ্রহকার্য্যে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছেন। মূল সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের অনুজ্ঞা এবং নির্দ্দেশমত গ্রীষ্মাবকাশে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ, পুলিনবিহারী সেন এবং সম্পাদক সংগ্রহকার্য্যে বহির্গত হইয়া কতকগুলি বিচিত্র খোদিত ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। শ্রীমান কালীপদ বাগছী মহম্মদপুরের সীতারাম রায়ের বাড়ীর একখানি ইষ্টক, একটি চীনদেশীয় প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা এবং একখানি পুরাতন পুথি সংগ্রহ

করিয়া দিয়া মূল সভাকে সাহায্য করিয়াছেন। যাহাতে সংগ্রহ কার্য্য আরও দ্রুত এবং শৃঙ্খলা-বদ্ধ হয় তজ্জন্য ছাত্র-সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত সদস্য লইয়া একটি সমিতি গঠন করা হইতেছে। আশা করি, উল্লিখিত সদস্যগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্যসাধন করিয়া সভার মুখ-রক্ষা করিবেন।

১।	নগেন্দ্রনাথ সরকার	৫।	চারুচন্দ্র সরকার
২।	মাখনলাল রায়	৬।	ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৩।	কালীপদ বাগছী	৭।	শচীন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত
৪।	শ্যামাপদ বাগছী	৮।	ভবশঙ্কর চৌধুরী

আশা করি মূল সভার সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় এই সভ্যবৃন্দকে উপদেশ দিয়া সংগ্রহ-কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। গত বর্ষে ছাত্র-সভা দিনাজপুর সাহিত্য-সম্মিলনে, পাবনা সাহিত্য-সম্মিলনে এবং কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন এবং আমাদের ছাত্র-সভার গৌরবের বিষয় যে, এই সভার অন্যতম ছাত্রসদস্য শ্রীমান বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনে প্রবন্ধ পাঠের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

সভার বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বার্ষিক অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে একজন উদ্যোগী সদস্য লোকান্তর গমন করিয়াছেন। সংগ্রহকার্য্য শেষ করিয়া আসিয়া পুলিনবিহারী সেন রাজসাহী গমন করিয়াছিলেন। সেখানেই তিনি জলমগ্ন হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে সভা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। সভা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উদ্যোগ করিতেছেন।

আমাদের আগামী বর্ষের কর্ম্মচারি-নিয়োগ কার্য্যটি এই সঙ্গেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। আগামী বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীদ্বয় সর্ব্ব সম্মতিতে কর্ম্মভার প্রাপ্ত হইলেন ;—

সম্পাদক :— শ্রীমাখনলাল রায়
সহঃ— শ্রীভবশঙ্কর চৌধুরী।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্পৃষ্ট ছাত্র-সভার সদস্যগণের প্রতিভূস্বরূপে—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সরকার—সম্পাদক।

"গ" পরিশিষ্ট

বদান্যবর—বাণীসেবক মাননীয় মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের করকমলে
রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যবৃন্দের

সশ্রদ্ধ উপহার।

মহাত্মন্, উত্তরবঙ্গ তন্দ্রামুক্ত হইয়া যখন তাহার ক্ষুদ্রশক্তি সসঙ্কোচে সাহিত্যক্ষেত্রে নিযুক্ত করিয়াছিল, তখন বঙ্গের অপর প্রান্ত হইতে আপনারই আশ্বাসবাণী প্রথমে উচ্চারিত হইয়া তাহাকে সাফল্যের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। সেই জ্ঞানাভিযানের প্রথম পথপ্রদর্শক বাণী-সাধনার উপযুক্ত উত্তরসাধকের প্রতি প্রীতিপূর্ণ পূজা অর্পণের অবসর উপস্থিত হওয়ায় দীন সাহিত্যিকমণ্ডলী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন। সমগ্র ভারতের বিবিধ সদনুষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় পুরুষবর, তাঁহাদের অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে প্রদত্ত ভক্তিপূর্ণ এই পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ করুন।

পল্লীনিকেতনে বাণীর পর্ণকুটীরে আজ যে সমস্ত মহার্ঘ রত্নের সন্ধান মিলিয়াছে, জীর্ণ পত্রনিহিত পুথির পৃষ্ঠায় যে মহান ভাবের অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে মায়ের, এই পর্ণ আবাসে মহানের পাদক্ষেপ আর অসম্ভাবিত নহে। বর্ষে বর্ষে মাতৃভাণ্ডারের রত্নরাজি পরিদর্শন ব্যপদেশে উত্তরবঙ্গে বহু ভক্তসাধক পদার্পণ করিয়া থাকেন। ইহাকেই এই বঙ্গপ্রান্তবর্ত্তী নগণ্য পল্লীনগরীর আকর্ষণের মূলীভূত কারণরূপে উল্লেখ করিতে আর দ্বিধা নাই। হে মুক্তহস্ত বাণীসেবক, পুণ্য কামরূপাধিষ্ঠিত এই বাণীপীঠের সংস্কারে আপনার সাধু ইচ্ছা প্রযুক্ত হউক। দেশের দিকে দিকে আপনার যেরূপ কীর্ত্তিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তদ্রূপ এই বঙ্গোত্তর ভূমি, যাহার প্রকৃষ্টাংশ আপনার পরিপোষণীয়া, তদুপরিও যেন বাণীর একটি পূত-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনার স্মৃতি চিরজাগরুক রাখিতে সমর্থ হয়।

যাঁহার কোষাগার পরার্থে চিরমুক্ত ছিল, প্রাতঃস্মরণীয়া দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রদর্শিত পথে বিচরণপূর্ব্বক আপনি বংশগৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। আপনারই আশাতীত করুণালাভে বঙ্গরাজধানীবক্ষে বঙ্গবাণীর জীর্ণকুটীর বিরাট সৌধে পরিণত হইয়াছে। আর উত্তরবঙ্গ-পরিষৎ দীনাহীনার ন্যায় পর্ণকুটীরবাসিনী হইয়া আপন অস্তিত্ব লোপ করিবে ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়াই আপনার কারণ পরম্পরায় মাতৃদ্বারে শুভাগমন হইয়াছে। এইক্ষণে এই শুভাগমন স্মরণীয় ও মাতৃআশীর্ব্বাদ অর্জ্জনপূর্ব্বক সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া দেশহিতে ব্রতী থাকুন। দীন সাহিত্যিক মণ্ডলীর ভগবৎ সমীপে ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ
২১ বৈশাখ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ

ভবদীয় চিরানুরক্ত
রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের প্রতিভূরূপে
সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী—সম্পাদক।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্থ্রষ্ট ছাত্রসভা কর্ত্তৃক প্রদত্ত

অভিনন্দনপত্র।

যশোরাজিবিরাজিত বদান্যগণাগ্রগণ্য পরমবিদ্যোৎসাহী অনারেবল

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের করকমলে

একদিন যখন বঙ্গসাহিত্যের গগন নিবিড় জলদজালে আবৃত ছিল, যখন কুসুমসৌরভ আমোদিত বনপ্রান্তরে অটবীশাখে বসিয়া অস্ফুটস্বরে দুই একটি পিক প্রাণের গান গাহিত, তখন আপনারই আশ্বাসবাণী-প্রবুদ্ধ নিস্পন্দ প্রাণগুলি মহানুভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। মায়ের দীন কুটীর-প্রাঙ্গণে আপনার কৃপায় উচ্চ সৌধ উত্থিত হইয়া আপনারই মহিমা প্রচার করিয়াছিল; আপনারই অনুগ্রহ বর্ষণে উপেক্ষিতা জননী আজ বিশ্ববন্দিতা; কাঙ্গালিনী জননী রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে শোভমানা। তাই আজ নববর্ষের নবজীবনোৎফুল্ল শিশু ছাত্র পরিষৎ তাহার নব বোধনের ঘট প্রতিষ্ঠাকল্পে আপনাকেই পুরোহিত পদে বরণ করিয়া গৌরব অনুভব করিতেছে।

বঙ্গসাহিত্য জগতে যখন ঘোর হাহাকার, মধুসূদনের দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যু, হেমচন্দ্র অর্থকষ্টে শীর্ণকায়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আপনার তুমুল শঙ্খনাদে স্বর্গ হইতে জাহ্নবীর পূতধারা যমুনার সহিত মিলিত হইয়া ভারতী-কমলার অপূর্ব্ব সঙ্গমে যে নব-প্রয়াগতীর্থের সৃষ্টি করিয়াছে, সেই পবিত্র বারি সেচনে ভাষার পুষ্টি, সাহিত্যের উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। আপনারই অজস্র কৃপা আজ তপনরশ্মির মত দেশের সমস্ত দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে; আপনারই মুক্তহস্ততায় দরিদ্রের মনোরথ আর মানসপটে বিলীন হইতে পারে না।

যে ভাষা জননীর পূজায় বঙ্গের বরেণ্য সাহিত্যসেবিগণ ব্রতী, বালক আমরা, নিতান্ত অশক্ত হইলেও উত্তরবঙ্গের কেন্দ্র সাহিত্যসভা রঙ্গপুর পরিষদের অনুপ্রেরণায় সাহসে ভর করিয়া মাতৃপূজার মঙ্গলঘট স্থাপন করিয়াছি। হে যোগ্য পুরোহিত, আমাদিগের এই বাণী অর্চ্চনার পৌরোহিত্য চিরকালের নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া আমাদের আকুল আকিঞ্চন সফল করুন। আপনার পবিত্র সংসর্গফলে আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধিত হউক, নববলে বলীয়ান হইয়া যেন আমরা পূজাস্পদ সাহিত্যিকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারি।

ক্ষুদ্র বৃহৎ আপনার নিকটে তুল্যরূপে গণনীয়, সুতরাং ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র হইয়াও এই শিশু ছাত্র-পরিষৎ আপনাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে সাহসী হইয়াছে। তাহাদিগের বরমাল্য গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ করুন।

২০ বৈশাখ। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের
১৩২০ বঙ্গাব্দ। ছাত্র সদস্যবৃন্দ।

দীনজন পালক অশেষ গুণান্বিত পরম বিদ্যোৎসাহি

মাননীয় মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের করকমলে

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের অনুগত বেলপুকুর পল্লী পরিষদের সদস্যবৃন্দের

প্রীতি-উপহার।

মহোদয়! বঙ্গ-সাহিত্য-কাননে আপনার কৃপাবারি সিঞ্চনে যে স্বর্গীয় পারিজাত প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহার অমর বাঞ্ছিত সৌরভে দিগ্ দিগন্ত আমোদিত। দীন আমরা এরূপ মহৎ জনের সঙ্গলাভে কৃতার্থ হইব মনে করিয়া সুদূর পল্লীভবন পরিত্যাগ করিয়া আপনার দ্বারে সমাগত হইয়াছি। জানি আপনার দ্বার চির অবারিত সুতরাং আমাদিগের প্রবেশের বাধা জন্মিবার আশঙ্কা নাই।

যে পরিষদের বিজয় শঙ্খনাদে সমগ্র জগৎ ধ্বনিত হইতেছে, যাহার পদতলে বসিয়া কত ভক্তসাধক ধ্যানস্তিমিত লোচনে, বঙ্গবাণীর পদযুগল চিন্তা করিতেছেন; সেই পরিষদের ভাণ্ডার, পল্লীর বনলতা সমাচ্ছাদিত জীর্ণ কুটীর হইতে সমাহৃত অমূল্য রত্নরাজির দ্বারা প্রধানতঃ পরিপূর্ণ। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ ইহা সর্ব্বাগ্রে ধারণা করিয়া আমাদিগের ন্যায় একটি নগণ্য পল্লীতে উহার প্রথম পল্লী-শাখার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাই আজ আমরা মহতের সংসর্গে অতিমহতের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে সাহস করিয়াছি।

হে সমদর্শী কর্ম্মী পুরুষ! নগরের উচ্চ প্রাসাদ হইতে আপনার করুণ দৃষ্টি পল্লীর পর্ণ-কুটীরে নিপতিত হউক। ইতিহাসের ধ্বংসোন্মুখ উপকরণগুলি মায়ের শ্যামল অঞ্চলের অন্তরাল হইতে ক্রমে ক্রমে উদ্ধৃত হইয়া লোক লোচনের বিষয়ীভূত না হইলে, বাঙ্গালীর চিরকলঙ্ক মোচনের আর কোন প্রকৃষ্ট পন্থা নাই।

বঙ্গের বরেণ্য সাহিত্যিকগণের রচিত সুর বাঞ্ছিত কত রমণীয় কুসুম মালিকা আপনার কণ্ঠদেশ সুশোভিত করিয়াছে; আজ আমরা আপনার সেই পবিত্র কণ্ঠে বনস্থলী হইতে চয়িত বনপুষ্পের অকিঞ্চিৎকর মাল্য ভক্তিভরে অর্পণ করিতেছি। হে ক্ষুদ্রবৃহতে তুল্যদর্শি দীনশরণ মহাপুরুষ! আমাদের পল্লী সুলভ অকৃত্রিম প্রীতির নিদর্শনরূপে উহা গ্রহণপূর্ব্বক আপনার কর্ম্মময় জীবনের কোন এক ক্ষুদ্র প্রদেশে অচিরপ্রসূত শিশু পল্লী-পরিষদের স্মৃতি বহন করিয়া লইয়া যাউন।

২১ বৈশাখ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ। } ভবদীয় বেলপুকুর পল্লী পরিষদের প্রতিভূরূপে—

শ্রীবসন্তকুমার লাহিড়ী—সম্পাদক।

"ঘ" পরিশিষ্ট

পরম বিদ্যোৎসাহী বঙ্গহিতব্রত সত্যসন্ধ সুশাসক মহামান্য সদাশয় বঙ্গীয় গভর্ণর

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাইট অনারেবল

টমাস ডেভিড ব্যারণ কারমাইকেল

জি, সি, আই, ই ; কে, সি, এম, জি মহোদয়ের করকমলে

প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিষ্ঠিত রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের দীন সদস্যবৃন্দের

অকৃত্রিম প্রীতি ও ভক্তিপূর্ণ

উপহার।

পুরাণপ্রথিত প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও জ্ঞানবরেণ্য বরেন্দ্রভূমির সন্ধিস্থলে আপনার শুভপদার্পণে এই বিদ্বৎপরিষদের দীন সদস্যবৃন্দ আনন্দোৎফুল্ল হইয়াছেন।

সুশুভ্র হিমাচলের পাদলগ্ন এই পুণ্যভূমির চিরোজ্জ্বলবক্ষে আদি আর্য্যযুগে প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও কামরূপপ্রেরিত আগম-নিগম ও জ্যোতিষের বিমলজ্যোতিঃ প্রথম প্রতিফলিত হইয়া সমগ্র ভারতে বিকীর্ণ হইয়াছিল। মধ্যযুগে বঙ্গবিতাড়িত বৌদ্ধসভ্যতার অস্তিমকিরণ এই বঙ্গ-প্রান্তদেশে চিরনির্ব্বাপিত হইয়া হিমাচলের পরপারবর্ত্তী মহাচীন ও জাপান উদ্ভাসিত করিয়াছিল। পরিশেষে ইসলাম অর্দ্ধচন্দ্রের উদয়াস্ত এবং ব্রিটিশ অভ্যুদয়ের অভূতপূর্ব্ব আলোড়ন এই ক্ষেত্রোপরি স্থায়ী রেখাপাত করিয়া ইতিহাসে ইহাকে স্মরণীয় করিয়াছে। বিশালকায় লৌহিত্য, ত্রিস্রোতা এবং পুণ্যসলিলা অধুনা শৈবালশৃঙ্খলিতা ক্ষীণকায়া সদানীরার তরঙ্গে তরঙ্গে সেই সকল অতীত কাহিনী আজও ব্যক্ত হইতেছে।

অবশ্য জ্ঞাতব্য এবম্বিধ অতীত কাহিনীর উপরিভাগ হইতে বিস্মৃতির সমষ্টিভূত ধূলিকণা ক্রমে অপসারিত করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের পুষ্টিসাধনরূপ মহাব্রতে দীক্ষিত দীন পরিষৎ-প্রসঙ্গ মহোদয়ের ন্যায় অনুসন্ধিৎসু সন্নিধানে উপেক্ষিত হইবে না ভাবিয়া সে তাহার অশেষ দৈন্য সত্ত্বেও ভবৎসমীপে উপনীত হওয়ার এই অপূর্ব্ব সুযোগ ত্যাগ করিতে পারে নাই।

সূক্ষ্মদর্শী বহুগুণাধার প্রজারঞ্জক রাজপুরুষ! আপনি বঙ্গের শাসনদণ্ড গ্রহণের অচিরকাল-মধ্যে দেশের শুষ্ককণ্ঠ সরস করিয়া দিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন, কর্ষণসহায় গোকুলের ক্রমাবনতিতে বঙ্গলক্ষ্মীর পরিপূর্ণ ভাণ্ডার শূন্যগর্ভ হইতেছিল, আপনি তাহার প্রতিকারকল্পে রাজকোষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, দেশসমৃদ্ধির মূলীভূত কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে আপনার উৎসাহদান দেশবাসী নিত্যই লক্ষ্য করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা আপনার অনাবিল অনুকরণযোগ্য সদাপ্রফুল্ল অমায়িক ব্যবহারে দীন প্রজাপুঞ্জ মুগ্ধ ও দেশে

শান্তি বিরাজমান। অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত জনসাধারণের মধ্যে ভূরিপরিমাণ জ্ঞানালোক বিস্তারের সুব্যবস্থা করিতে আপনি সতত সমুৎসুক।

দেশ ও জাতির গৌরব এবং মহত্ত্ব জাতীয় ভাষার উৎকর্ষের দ্বারা নির্ণীত হয়। ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া জননীক্রোড়স্থিত বঙ্গভাষার বাক্‌স্ফুরণে গৌড়সিংহাসনাধিষ্ঠিত সুশাসক সুলতান হুসেন প্রমুখ গৌড়েশ্বরগণ প্রভূত উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষা তাঁহাদের প্রযত্নে কমনীয় কাব্যময়ী মূর্ত্তিতে জগৎ মুগ্ধ করিয়াছিল; কর্ম্মনিপুণ ব্রিটনবাসীর নিপুণহস্তে ভাষার গদ্যময় জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ-মূর্ত্তি প্রকট হইয়াছে। এক্ষণে ইহার ক্রমোন্নতি দেশশাসকগণের উৎসাহদানের উপরেই নির্ভর করিতেছে। আনন্দের বিষয় এই যে, আপনার সর্ব্বতোমুখী সকরুণদৃষ্টি বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধনে ইতিমধ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে। বঙ্গরাজধানীস্থিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এবং পূর্ব্ববঙ্গের সারস্বত-সমাজ রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া আপনার সাহিত্যানুরাগের সাক্ষ্যদান করিতেছে।

এক্ষণে প্রাগ্জ্যোতিষাধিষ্ঠিত এই দীন পরিষদের ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণপূর্ব্বক আপনার কর্ম্মবাহুল্যের মধ্যে ইহার স্মৃতি বহন করিলে দীন সাহিত্যিকবৃন্দ কৃতার্থ হইবে।

শনিবার,
২৯শে কার্ত্তিক, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের সদস্যবৃন্দের প্রতিনিধিরূপে
শ্রীকিরণচন্দ্র দে—সভাপতি
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী—সম্পাদক

To His Excellency the Right Honourable.

Thomas David, Baron Carmichael of Skirling.

G.C.I.E., K.C.M.G.,

GOVERNOR OF BENGAL.

The great patron of Learning, the avowed benefactor of Bengal and the determined lover of Truth.

AN OFFERING

With the sincere esteem & affection of the humble members of

THE RANGPUR SAHITYA PARISAD.

Situated in the kingdom of Pragjyotis.

May it please your Excellency,

The humble members of this Literary Society are filled with delight at your Excellency's auspicious advent to this city, which is situated at the junction of Pragiyotis, celebrated in the Purans, and Barendra, ever-distinguished for its Learning.

The hallowed Light of Astronomy and Vedic Learning emanating from Pragjyotis and Kamrup, flashed back in the Primeval Aryan Age from the radiant breast of this sacred land, at the foot of the snow-capped Himalayas, and diffused its beams all over India. It was from this frontier land, that the dying rays of Buddhist civilisation, banished from Bengal in the Middle Age, illuminated the trans-Himalayan countries of Japan and Greater China. Subsequently, the rising and setting of the Crescent of Islam and the unprecedented commotion at the dawn of British ascendancy made this land memorable in History by scoring ever-lasting lines on its face. Every individual wave on the breast of the gigantic Lohitya (Brahmaputra), the Trisrota (Teesta), and the Sadanira (Karatoya) of the sacred waters, which is now emaciated and chained in water-weeds, is proclaiming to this day the revelations of the Past.

This humble Society that has dedicated itself to the development of the History of Bengal by the gradual removal of the dust of oblivion that has accumulated over the glories of its past, which should be universally known, could not afford to lose this opportunity of appearing before your Excellency, in spite of its innumerable shortcomings, in the belief that its labours will not be passed by unappreciated by any one who is inspired with a zeal for research like your Excellency.

O keen-sighted and popular Statesman, the repository of all virtues! as soon as you assumed the sceptre of Bengal, you unbarred the way to improvement of public health by moistening the parched lips of the country and opened Government Treasury to prevent the deterioration of cattle, indispensable to cultivation, on account of which the full granaries of the Lakshmi of Bengal were being steadily depleted. The people of Bengal are eagerly observing the encouragement which agriculture, commerce and industry, the sources of a country's prosperity, have been receiving at your Excellency's hands. Above all your Excellency's sincere, affable, ever-cheerful and exemplary treatment has delighted your humble subjects, tranquillity now reigns throughout the land, while your Excellency is always anxious for the wide diffusion of culture amongst the masses steeped in the darkness of ignorance.

The greatness and the glory of a country and its people are determined by the wealth of its literature. Fully realising this, Sultan Hossain and other worthy Rulers who sat on the throne of Gaur, gave their whole-hearted encouragement to the lisping

Bengali literature while still in its mother's arms. Under their fostering care, the Bengali language, assuming a comely poetic form, enchanted the whole world. Under the able guidance of the skilful Briton, it has taken the manly appearance of philosophical and scientific prose. Now its further development depends on the encouragement it may receive at the hands of the present rulers. Therefore it is a matter of great joy that your kind attention, which is felt in every direction, has already been directed to-wards the further development of the Bengali Literature. The patronage extended to the Bangiya Sahitya Parisad in the capital of Bengal, and the Saraswat Samaj of Eastern Bengal affords ample testimony to your Excellency's interest in Literature.

Should your Excellency be graciously pleased to accept this insignificant memento of this poor Society and to cherish some memory of it amidst your multifarious duties, the humble members of the Society will be ever grateful.

SATURDAY,
The 15th Nov., 1913.

Signed as representatives of the members of the Rangpur Sahitya Parisad by

Kiran Chandra De—*President*,

Surendra Chandra Roy Choudhury—*Secretary*.

বঙ্গীয় গভর্ণরবাহাদুর কর্ত্তৃক সভা-সম্বন্ধে লিখিত মন্তব্য।

শ্রীযুক্ত গুলে´ সাহেবের পত্রের অনুবাদ।

আপনাদিগকে জ্ঞাপন করিতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, গত ১৬ই নবেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত গবর্ণর সাহেব বাহাদুরের রঙ্গপুর পরিদর্শনকালে তাঁহার জন্য রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের যে প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল তাহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। প্রদর্শিত দ্রব্যাদি দেখিয়া শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল্ মহোদয় রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণের প্রত্নতত্ত্বোদ্ঘাটনের একাগ্রতা ও আন্তরিকতা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। পরিষৎ-প্রদত্ত পুস্তকাবলী উপহার পাইয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। লর্ড কারমাইকেল্ উক্ত সাহিত্য-সভা ও তাহার সদস্যগণের কর্ম্মসাফল্য কামনা করেন।

"ঙ" পরিশিষ্ট

সন ১৩২০ সালের আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়।

বিবরণ	টাকা
প্রথম শ্রেণীর চাঁদা	৫৪১৲
দ্বিতীয় শ্রেণীর চাঁদা	৪২৩।০
প্রবেশিকা	৫৲
সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলীর মূল্য আদায়	১৭॥০
বগুড়া ইতিহাসের মূল্য আদায়	১॥০
ভি, পি, কমিশন আদায়	১৩।৶০
গৌড়ের ইতিহাসের মূল্য আদায়	২।০
গৃহনির্ম্মাণ তহবিল	১৪০০৲
গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল	২০ ৲
বার্ষিক অধিবেশনের সাহায্য	৭০৲
এককালীন প্রাপ্তদান	২৫০৬৲
গচ্ছিত টাকার সুদ আদায়	৪৫॥০
গৌরীপুর কার্য্যবিবরণ প্রকাশের ব্যয় আদায়	২১৪।/০
গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত	১১০৲
সত্যনারায়ণের পাঁচালী প্রকাশ	২০৲
নরেন্দ্রনাথ বকসীর স্মৃতিরক্ষা তহবিল	৫০৲
রামমোহন রায়ের স্মৃতি তহবিল	৭৲
পত্রিকার মূল্য আদায়	২২৵০
বর্ষাষ্টকের কার্য্যবিবরণ-মুদ্রণব্যয় আদায়	৬৫৲
মোট—	৫৭১৮॥৵৩
গত বৎসরের তহবিল—	৭১৬৸০
একুন—	৬৪৩৫।৵৩
বাদ খরচ—	১৮৬৪॥৵৩
	৪৫৭০৸০

মঃ চারি হাজার পাঁচশত সত্তর টাকা বার আনা মাত্র।

স্বাঃ শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার—
সহকারী সম্পাদক।

স্বাঃ শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষাল—
হিসাব-রক্ষক।

ব্যয়।

বিবরণ	টাকা
দপ্তরসরঞ্জামী	১৫॥৶৯
ডাকব্যয়	১৮৭॥৶৬
আসবাব খরিদ	৫২।৵৯
যাতায়াত ব্যয়	৭/৬
গ্রন্থাগারের ব্যয়	১।/৬
কামাখ্যা সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ প্রকাশ-ব্যয়	১৩৭৸৶৩
বার্ষিক অধিবেশনের ব্যয়	৬৪।/৬
কর্পূরস্তব প্রকাশব্যয়	১।৶০
পত্রিকা প্রকাশব্যয়	৪২৮॥৵৯
অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণপ্রকাশ ব্যয়	৩৮৲৯
বেতন ব্যয়	১৯৩।০
ইরসাল মূলসভা	৪২৫।৵০
রঙ্গপুর ইতিহাস প্রকাশ ব্যয়	১১৩/৩
দিনাজপুরসম্মিলন ব্যয়	১৭॥৩
চিত্রসংগ্রহ ব্যয়	৩।/০
কামাখ্যা-সম্মিলন ব্যয়	৸৬
মালদহ-সম্মিলন ব্যয়	১।৵০
বিশেষ অধিবেশন ব্যয়	৸০
আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্ট প্রকাশব্যয়	।৶০
মুদ্রাসংগ্রহ ব্যয়	৪৲
মালদহ কার্য্যবিবরণ-প্রকাশ ব্যয়	৫/০
বাজে ব্যয়	৪।৬
গভর্ণরসাহেবের অভ্যর্থনা ব্যয়	৬৯৸৩
নামকোষ-প্রকাশ ব্যয়	॥০
বিবিধ মুদ্রণব্যয়	৬০
পাবনাসম্মিলন ব্যয়	১৩॥৬
চিত্রশালার ব্যয়	৪॥৵৬
ডিরেক্টরসাহেবের পরিদর্শন ব্যয়	১।৶৯
দিনাজপুর কার্য্যবিবরণপ্রকাশ ব্যয়	৶৬
মোট—	১৮৬৪॥৵৩

হিসাব ঠিক আছে।

স্বাঃ শ্রীদীননাথ বাগছী

স্বাঃ শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।

বিশেষ তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ

১৩২০ বঙ্গাব্দ।

আয়		ব্যয়।	
প্রথম শ্রেণীর সদস্যগণের নিকট হইতে চাঁদা আনায়	৫৪১৲	মূলসভায় ইরসাল ১৩১৯ চৈত্র পর্য্যন্ত হিসাব শোধ	১৭২৸৵৩
প্রবেশিকা	৫৲	১৩২০ সালের জন্য	২৫২৶৯
	৫৪৬৲	শাখাসভার প্রাপ্য প্রতি টাকায় ॥০ হিসাবে	২৭৩৲
			৫২৫।৶৯

বিতং—

আয়— ৫৪৬৲

ব্যয়— ৫২৫।৶৯

২০॥৩ উদ্বৃত্ত

মবলগে কুড়িটাকা আট আনা তিন পাই মাত্র।

সাধারণ তহবিলের উদ্বৃত্ত	৪৫৫০৶০
বিশেষ তহবিলের উদ্বৃত্ত	২০॥৩
মোট উদ্বৃত্ত	৪৫৭০৸০

মবলগে চারিহাজার পাঁচশত সত্তর টাকা বার আনা মাত্র।

তহবিল বিতং

লোন অফিস স্থায়ী আমানত	১৭০০৲
ঐ অস্থায়ী	
রঙ্গপুর-ব্যাঙ্কস্থায়ী	২০০০৲
ঐ অস্থায়ী	৭৪০৲
জিম্বা সম্পাদক	১১৮৸৬
জিম্বা সহঃ-সম্পাদক	৬৸৶৬
	৪৫৭০৸০

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

নবম ভাগ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ সংখ্যা

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, পত্রিকাধ্যক্ষ।

—•—

রঙ্গপুর।

(রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়
কাব্যতীর্থ-কবিরঞ্জন সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত)

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ সম্পূর্ণ দায়ী)

সূচী

কলিকাতা
৯, বিশ্বকোষ-লেন, বাগবাজার,
বিশ্বকোষ প্রেস
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্রদ্বারা মুদ্রিত।
১৩২২ বঙ্গাব্দ।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।] [ডাকমাশুল ।৵০ আনা।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণ বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে
এই পত্রিকা পাইবেন।

☞ কোনও সদস্যের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে অগোণে জানাইবেন।

রঙ্গপুর-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী।

১। চণ্ডিকাবিজয়। (মহাকাব্য)

রঙ্গপুরের কবি দ্বিজ কমললোচন কৃত শক্তিবিষয়ক আদিগ্রন্থ।

ডিমাই ৮ পেজী আকারের প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই সুবৃহৎ উপাদেয় সটীক গ্রন্থের অর্দ্ধমূল্য—কাগজের মলাট ৷৷০ আনা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই করা ৸০ আনা। যাঁহাদের আবশ্যক হইবে পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হইয়া থাকে।

২। আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্ট।

কোচবিহারাধিপতির ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ বকসী মহাশয়ের সঙ্কলিত "আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্ট" নামক একখানি অভিনব স্মৃতিগ্রন্থ তৎপৌত্র শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন বকসী মহাশয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন এম, এ মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই সভা হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। সভ্যেতর ব্যক্তিগণের পক্ষে মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

৩। গৌড়ের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। (হিন্দুরাজত্ব)

মালদহের সুযোগ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্কলিত, এই ইতিহাসগ্রন্থ সভার গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য কাগজের মলাট ৸০ এবং সুন্দর বাঁধাই করা ১৲ টাকা।

৪। রঙ্গপুরের ইতিহাস, প্রথম ভাগ (যন্ত্রস্থ)

রঙ্গপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্যে এই গ্রন্থ সভা হইতে সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত ও সভ্যগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। ১৯১০-১১খৃঃ অব্দে এই গ্রন্থের মুদ্রণব্যয় মধ্যে প্রাগুক্ত বোর্ড ৫০০ পাঁচশত টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এই গ্রন্থে রঙ্গপুরের যাবতীয় পুরাতত্ত্ব ও কৃষিবাণিজ্যাদির বিবরণ চিত্রাদি সহ প্রকাশিত হইবে।

৫। বগুড়া—সেরপুরের ইতিহাস।

বঙ্গের সুলেখক শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

৬। সঙ্গীতপুষ্পাঞ্জলি।

বগুড়ার ভক্তকবি সাধকাগ্রগণ্য স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের অপ্রকাশিত সাধনসঙ্গীতগুলি সংগৃহীত হইয়া তাঁহার দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভক্তকবি ও তাঁহার সঙ্গীতের পরিচয় বঙ্গবাসীমাত্রেরই অবিদিত নাই। আশা করি, কবিবরের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ ও তাঁহার পরিবারবর্গের সাহায্যকল্পে প্রত্যেকেই নগদমূল্য ৷৷০ আনা মাত্র দিয়া এই গ্রন্থখানি ক্রয় করিবেন।

৭। বগুড়ার ইতিহাস। (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল মহাশয়ের রচিত, এই গ্রন্থে সমগ্র বগুড়ার যাবতীয় বিবরণ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বিস্তৃতভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ ও ১৷০, এই সভার সভ্যগণের পক্ষে ।৵০ ও ৷৷৵০ আনা মাত্র।

৮। পালিপ্রকাশ—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী প্রণীত।

মূল্য ২৸০, বাঁধান ৩৲ টাকা; প্রবেশক, পালি পাঠাবলী ও শব্দকোষ সহ, পালিশিক্ষার উপযোগী উৎকৃষ্ট ও সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রায় সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

৯। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ (আদিকাণ্ড)

উত্তরবঙ্গের এই সুবৃহৎ রামায়ণ দিঘাপতিয়ার সুযোগ্য সাহিত্যসেবী রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম, এ মহোদয়ের অর্থানুকুল্যে ও গৌড়ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদকতায় বিশ্বকোষযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। কেবল আদিকাণ্ডই রয়েল আটপেজী আকারে ৩৫ ফর্ম্মায় সমাপ্ত হইয়াছে। সভ্যগণ বিনামূল্যে পাইবেন। সভ্যেতর ব্যক্তির পক্ষে আদিকাণ্ডের মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

নবম ভাগ।

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

রঙ্গপুর।

১৩২১ বঙ্গাব্দ।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ-কবিরঞ্জন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

Printed by

R. C. Mittra, at the Visvakosha-Press

9, Visvakosha Lane, Bagbazar,

CALCUTTA.

নবম ভাগ পত্রিকার পৃষ্ঠা-সূচী

শঙ্করদেব।

তৃতীয় প্রবন্ধ

দ্বাদশ বৎসরের পর শঙ্করদেব গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। জ্যেষ্ঠকে গৃহাগত দেখিয়া বনগঞা গিরি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন ও জামাতা হরির সহিত অগ্রগামী হইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। খুল্লপিতামহগণ সত্বরপদে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তীর্থ-ভ্রমণ দ্বারা পবিত্রদেহ শঙ্কর তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতে উদ্যত হইলে তাঁহারা বারণ করিলেন :—

নমস্কার করিবাক কেহ নিদিলন্ত।
সাধুবাদ করিয়া সাবটি ধরিলন্ত।

শঙ্কর শ্রীক্ষেত্র হইতে আনীত প্রসাদ গৃহে গৃহে বিতরণ করিলেন। সেই প্রসাদ গ্রহণ ও শ্রীক্ষেত্রের মহিমা শ্রবণ করিয়া পিতামহগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। শঙ্করের জ্ঞানালোকদীপ্ত ও পবিত্রতামণ্ডিত উন্নতদেহ পিতামহদিগেরও সম্ভ্রমের উদ্রেক করিল।

বনগঞা গিরি জামাতা হরির গৃহে ছিলেন। শঙ্করদেব ফিরিয়া আসিলে পর গৃহে আসিয়া শশব্যস্তে গৃহোপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তীর্থ-যাত্রাকালে শঙ্কর সমস্ত সম্পত্তি বিলাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন—অনেকগুলি ধেনু খুল্লপিতামহদিগকে দিয়াছিলেন। বনগঞা গিরি স্বয়ং গোচারণের মাঠে গিয়া বাছিয়া বাছিয়া গাভী খেদাইয়া আনিতে লাগিলেন। রাখালেরা বাধা দিলে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া একটি রাখালকে অস্ত্রাঘাতে নিহত করিলেন। এই দুষ্কর্ম্মের জন্য দয়ার্দ্র-হৃদয় শঙ্কর তাঁহাকে যথোচিত ভৎর্সনা করিলেন। পিতামহগণ এই সংবাদ পাইয়া শঙ্করের আবশ্যক বহু দ্রব্যাদি স্বেচ্ছায় প্রত্যর্পণ করিলেন। এতন্মাত্রেই তাঁহারা তুষ্ট হইলেন না। পুনরায় বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালনের জন্য তাঁহারা শঙ্করদেবকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। শঙ্করদেব তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর যৌতুক-স্বরূপ বহু ধন লাভ করিলেন। পিতামহগণ তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেও বিস্মৃত হইলেন না। তাঁহারা—

একশত তাম্রগিরি দিয়া তাক অধিকারী—
শঙ্করক পাতিলা গোমস্তা।

কিন্তু— শঙ্করে জামাইক মাতি বুলিলা সাদরে আতি
তুমি চৰ্চ্চিবাহা তন্ত্রিগণ।

পড়িলোহো শাস্ত্র দুঃখে গৃহক বসিয়া সুখে
করিবোহো অর্থক বিচার ॥ কণ্ঠভূষণ ১৬ পৃঃ

শঙ্করদেবের খুল্লপিতামহ জয়ন্তের পুত্র শতানন্দ; তৎপুত্র জগদানন্দ (পরে রাম রায়) শঙ্করদেবের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। ইনি অতি সুপণ্ডিত ও কাব্যামোদী। শঙ্কর-দেবের শাস্ত্রচর্চ্চার অভিলাষ শুনিয়া জগদানন্দ কহিলেন "দাদা, যদি তুমি অনুমতি কর, আমার বাড়ীতে একটি দেবগৃহ (১৯) নির্ম্মাণ করি; তথায় নির্জ্জনে শাস্ত্রালোচনার বিশেষ সুবিধা হইবে।" শঙ্করদেব সানন্দে সম্মত হইলেন। রামরাম গুরুও ইঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। দেবগৃহ নির্ম্মিত হইলে পর তথায় প্রাত্যহিক শ্রীমদ্ভাগবত-চর্চ্চা ও কৃষ্ণ-কথালাপ আরম্ভ হইল।

তৎকালে আসামে ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ ছিল, কবি রাম রায় (২০) তৎপ্রণীত "গুরুলীলা" গ্রন্থে তাহা এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন :—

কামাখ্যা দেবীর রাজ্য কামরূপ নাম।
চারি জাতি যথেষ্ট প্রবর্ত্তে অনুপাম ॥
রজক নাপিত ধোবা ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র।
ইত্যাদি জাতির কিছু নাহি চল ছিদ্র ॥
আনদেশে নিজ বৃত্তি মাত্র আচরয়।
বালক জন্মিলে দাহ্ন নাড়িক ছেদয় ॥
শিবদুর্গা গ্রামদেব পূজয় সতত।
হরিভক্তি করন্তা নাহিক ই রাজ্যত ॥

দৈত্যারি ঠাকুরও আসামের তদানীন্তন অবস্থাবর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

ই দেশত পূর্ব্বকালে নাছিল ভকতি।
নানা ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোক করিল সম্প্রতি ॥
নানা দেব পূজয় করয় বলিদান।
হাঁস ছাগ পার * কাটে অসংখ্য প্রমাণ ॥
তপ জপ যজ্ঞ দান তীর্থস্নান করে।
স্বর্গ নরকত আয়াযাত করি মরে ॥

গীতা ও ভাগবতচর্চ্চা করিতে করিতে শঙ্করদেব ভাবিতে লাগিলেন :—

---

(১৯) ইহাই আসামে 'নাম ঘরের' সূচনা বলিয়া বোধ হয়।

(২০) ইনি শঙ্করদেবের ভ্রাতা রাম রায় নহেন। ইনি ব্রাহ্মণ ও দেব দামোদরের শিষ্য। তাঁহার রচিত 'গুরুলীলা' গ্রন্থ দেব দামোদরেরই চরিত-গ্রন্থ।

* পার—পারাবত, কবুতর।

দৈবকীনন্দন এক　　বেদমাত্র শাস্ত্র এক
দৈবকী-নন্দনে কৈলা থাক।
কর্ম্ম এক তান সেবা　　মন্ত্র এক তান নাম
জানিবা নিশ্চয় করি আক॥
ইয়াক না জানি নরে　　ঘোর সংসারত মরে
নানা দুঃখ কর্ম্মক আচরি।
কৃষ্ণগুণ নাম ধর্ম্ম　　লোকত প্রচার করো
সুখে যাউক সংসার নিস্তরি॥

শুভক্ষণে শ্রীমন্ত শঙ্কর এই সাধু সংকল্প হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং কৃষ্ণ-কথা আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন।

কথিত আছে, ত্রিহুতদেশীয় জগদীশ মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ জগন্নাথকর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শ্রীক্ষেত্র হইতে শঙ্করদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইতে আগমন করেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, শ্রীমন্ত শঙ্কর শুধু শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছেন এমন নহে, উহার মূল সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করিয়া পদ পর্য্যন্ত রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। ভাষায় রচিত পদগুলি আবার এরূপ সহজবোধ্য ও বিশুদ্ধ হইয়াছে যে, ঐ গুলি দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

টেম্বুয়ানিবন্ধের হোক্করা কুঞ্জিয়া গিরির পুত্র গয়াপাণি তীর্থযাত্রিদের সমভিব্যাহারে শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তিনি আঢ্যলোকের সন্তান; সুতরাং তাঁহার সঙ্গীরা জগন্নাথ দর্শনের পর অন্যান্য তীর্থে যাইতে সোৎসাহে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। তীর্থ-ভ্রমণে তাঁহারও অনিচ্ছা ছিল না। কথিত আছে, আর তীর্থ-ভ্রমণ না করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে ইনি জগন্নাথকর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হন। গয়াপাণি এইরূপ স্বপ্নাদেশের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু আদেশ পালন করিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি একদা শঙ্করদেব যে গৃহে বসিয়া রাম রাম গুরু ও জগদানন্দের সহিত কৃষ্ণ-কথার আলোচনা করিতেছিলেন তথায় উপাস্থিত হইলেন এবং শঙ্করদেবের সহিত কথা-প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন :—

তত্রৈব গঙ্গা যমুনাচ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থাণি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদার কথাপ্রসঙ্গঃ॥

গয়াপাণি শ্লোক পাঠ করিলেন বটে কিন্তু অর্থ করিতে পারিলেন না। তখন শঙ্করদেব এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন :—

কৃষ্ণর উদার কথার প্রসঙ্গ যথাত হোরে নিশ্চয়।
গঙ্গা গোদাবরী আদি যত তীর্থ নিবাস তথা করয়॥

শ্লোকার্থ শুনিয়া জগন্নাথের স্বপ্নাদেশের মর্ম্ম গয়াপাণির হৃদগত হইল; কারণ তিনি দেখি-

লেন, তাঁহার স্বদেশেই শঙ্করগৃহে উদার অচ্যুত-কথা-প্রসঙ্গ হইতেছে, সুতরাং আর তাঁহার অন্তর্তীর্থ ভ্রমণে প্রয়োজন কি? তিনি বিস্ময়ে পুলকিত হইয়া শঙ্করদেবের শরণ লইলেন। ইনিই শঙ্করদেবের সর্ব্বপ্রথম ভক্ত রামদাস।

ক্রমে শঙ্কর-মাধবের সম্মিলন হইল। মহাপুরুষ মাধবদেবের পূর্ব্ববৃত্তান্ত এই। বাণ্ডুকা-(২১) নিবাসী গোবিন্দগিরি 'ভুঞা' পদে নিযুক্ত হইয়া টেম্বুয়ানিবন্ধে আগমন করেন, এবং দারান্তর গ্রহণ করিয়া রামরাই কেতাই খাঁ প্রভৃতি জ্ঞাতিসহকারে তথায় উপনিবিষ্ট হন। আহমদিগের দৌরাত্ম্যে তিনি টেম্বুয়ানিবন্ধ হইতে পত্নীসহকারে পলায়ন করেন। পথে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া হরশিঙ্গা বড়ার আশ্রয়ে কিছুকাল যাপন করেন। তথায় তাঁহার এক পুত্র জন্মে। ইনিই মাধব। পশ্চাৎ এক কন্যা হয়। কন্যা বয়ঃস্থা হইলে তিনি টেম্বুয়ানিবন্ধে গিয়া পূর্ব্বোক্ত গয়াপাণিকে কন্যাদান করেন এবং পত্নীকে জামাতৃগৃহে রাখিয়া মাধবকে লইয়া পূর্ব্বভবন বাণ্ডুকাতে চলিয়া যান। এতদ্দিন পর্য্যন্ত সুযোগ অভাবে মাধবের বিদ্যাশিক্ষা কিছুই হয় নাই।

কতোদিন মানে আছি সেহি থানে বুঢ়া আতা (২২) আনন্দত।
মাধবদেবক পঢ়াইলা সমস্ত কায়স্থিকা বৃত্তি যত॥
আনো শাস্ত্র যত পঢ়াইলা সমস্ত গদ্য পদ্য সংস্কৃত।
ন্যায় তর্ক নীতি শিখাইলা সম্প্রতি আনো যত কর্ম্ম নিত্য॥

গোবিন্দ তান্ত্রিক-অনুষ্ঠানপরায়ণ ঘোর শাক্ত ছিলেন। সুতরাং মাধবও সেইরূপ ধর্ম্মশিক্ষাই লাভ করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মাধব বাণ্ডুকা ত্যাগ করিয়া টেম্বুয়ানিবন্ধে মাতার নিকট ফিরিয়া আসেন ও ভগ্নীপতি গয়াপাণির গৃহে মাতা ও ভগ্নীর সহিত বাস করেন। আহমদিগের দৌরাত্ম্যে টেম্বুয়ানিবন্ধে তিষ্ঠিতে না পারিয়া তথাকার লোকেরা ধুঞাহাটা বা বেলগুড়ি (২৩) অঞ্চলে চলিয়া যান। মাধব পিতৃসম্পত্তি লাভের আশায় ধুঞাহাটা হইতে পুনরায় বাণ্ডুকাতে গমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে শঙ্করদেবের সাক্ষাৎকার পাইয়া গয়াপাণি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বাণ্ডুকা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় পথে জননীর সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়া মাধব মাতার আরোগ্য কামনায়

(২১) বাণ্ডুকা কোথায় নিশ্চয় করা সুকঠিন। ভারতী ৩২ খণ্ড নবম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ লিখিয়াছেন "মাধবের ভাগিনেয় রামচরণের বংশধর বামুনার বর্ত্তমান অধিকারীবংশীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে আমি অবগত হইয়াছি যে, এই বাণ্ডুকা বর্ত্তমান ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোনও গ্রাম। সম্প্রতি কীর্ত্তিনাশা পদ্মা ইহাকে গ্রাস করিয়াছে।" শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া মহাশয় তৎপ্রকাশিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন "বাণ্ডুকা ধরলা নৈর (যাক আজি কালি ধলা বোলে) তীরত আছিল"

(২২) বুঢ়াআতা অর্থাৎ গোবিন্দগিরি। ইনি আসামে দীঘল পুরিয়া গিরি নামেই পরিচিত হন। এতদ্ভিন্ন 'কাণলমা' বা 'লামকাণা' নামেও ইনি অভিহিত হইতেন। "কাণ লম্বা দেখি আসামে দিলেক তান কাণলমা নাম।" দৈত্যারি ঠাকুর। (২৩) এইস্থান টেম্বুয়ানিবন্ধের উত্তরে।

'জোড়া পাঁঠা বলি' মানস করেন। গৃহে আসিয়া মাধব দেখিলেন, জননী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন। দেবীপূজার সময় সন্নিহিত হইলে তিনি 'জোড়া পাঁঠা বলির' উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পূজার দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য কিছু তাম্বুল বিক্রয়করা আবশ্যক হইল। তাম্বুল লইয়া হাটে যাইবার সময় মাধব ভগ্নীপতিকে দুইটি শ্বেত ছাগ কিনিয়া আনিতে বলিয়া গেলেন। গয়াপাণি তখন রামদাস হইয়াছেন। মাধব তাহা জানিতেন না। হাট হইতে আসিয়া মাধব জিজ্ঞাসিলেন "পাঁঠা কই ?" গয়াপাণি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "গৃহস্থের ঘরে অনেক পাঁঠা আছে।" মাধব প্রত্যহই পাঁঠার কথা জিজ্ঞাসা করেন আর গয়াপাণি 'আনিব' 'আনিব' মুখে বলেন কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই করেন না। ক্রমে পূজার দিন নিকট-বর্ত্তী হইল। আর বিলম্ব করা চলে না। মাধব গয়াপাণিকে কহিলেন "চল, পাঁঠা নিয়া আসি।"

গয়াপাণি। পাঁঠা কি করিবে ?

মাধব। অ্যাঁ! তুমি জান না, দেবীকে 'জোড়া পাঁঠা' মানস করিয়াছি ?

গয়াপাণি। তা'ত শুনিয়াছি। কিন্তু পাঁঠা কাটিলে কি হয় জান ?

মাধব। কি হয় ?

গয়াপাণি। যে পাঁঠা বলি দেয় সে পরজন্মে পাঁঠা হয়, আর পাঁঠা মানুষ হইয়া তাহাকে—

মাধব। (সক্রোধে) আচ্ছা, বলি দেয় দিবে! তুমি পাঁঠা আনিবে কিনা বল ?

গয়াপাণি। ভাল, আমার কথাটাই একবার বুঝিয়া দেখ না কেন!

মাধব। তোমার ওসব কথা আমি শুনি না। কে তোমাকে এসব কথা বলিয়াছে ?

গয়াপাণি। যেই বলুক না কেন এসব শাস্ত্রের কথা!

মাধব। শাস্ত্র! তুমি আমাকে শাস্ত্র শিখাইতে চাও ?

গয়াপাণি। তা কি পারি! তবে ইচ্ছা হয়, চল, যে শাস্ত্রে এ কথা আছে, সেটা একবার দেখিয়া আসিবে।

মাধব ও গয়াপাণি ভোজনে বসিয়াছিলেন। এসব কথা শুনিয়া ক্রোধে মাধবের আর আহার হইল না। উভয়েই তাড়াতাড়ি আচমন করিয়া উঠিয়া বসিলেন। আবার তর্ক আরম্ভ হইল। গয়াপাণির কথা শুনিতে শুনিতে কোন্ শাস্ত্রে এসব কথা আছে জানিতে মাধবেরও কৌতূহল জন্মিল! তিনি গয়াপাণির সঙ্গে শঙ্কর-সন্নিধানে চলিলেন।

মাধব ও শঙ্করদেবের ঘোর তর্কযুদ্ধ উপস্থিত হইল। আসামে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব এই প্রথম। মাধবের শাস্ত্রচর্চ্চাও অল্প ছিল না। উভয়েই স্ব স্ব মতপোষক বহু তন্ত্র ও পুরাণে অভিজ্ঞ ছিলেন। সেই সকল গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া একে অপরের মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন।

দুই হস্তো তোলন্ত শাস্ত্র দুই হস্তো খণ্ডন্ত।
দুয়ো কথা কন্ত দুয়ো দুয়োক নমানন্ত॥

মাধবে শাস্ত্রক দেখাই প্রবৃত্তি কহন্ত।
নিবৃত্তি দেখাই তাক শঙ্করে খণ্ডন্ত ॥
প্রভাতরে পরা তিনি পর বেলি গৈল।
দুই হন্তরো কথা সাঙ্গ তথাপি ন ভৈল ॥

এই দ্বৈরথ-যুদ্ধে শঙ্করদেবই বিজয়ী হইলেন। তিনি স্বীকার করিলেন মাধবও তত্তুল্য শাস্ত্রদর্শী। সমস্ত পুরাণের উপর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া শঙ্কর কহিলেন :—

সকলে পুরাণ যেন প্রকাশ চন্দ্রর ॥
কোটি সূর্য্যসম প্রকাশয় ভাগবত।
কাব্য পুরাণর কিছু নাহিকে মহত্ব ॥
ভারতপুরাণ ব্যাস ঋষি করিলন্ত।
যার যেন জাতি-ধর্ম্ম সবে বিহিলন্ত ॥
চারিয়ো বেদের করিলন্ত শাখাভেদ।
তথাপিতো নুগুচে মনর তান খেদ ॥
পশুহিংসা ধর্ম্ম বিহিলন্ত জগতত।
সি কারণে সুস্থ নাই ব্যাসর মনত ॥
বৈকুণ্ঠর শাস্ত্র ইতো মহাভাগবত।
নারায়ণে কহিলন্ত ব্রহ্মার আগত ॥
ব্রহ্মা নারদত কৈলা নারদে ব্যাসত।
ব্যাসে করিলন্ত পাছে মহাভাগবত ॥

কথিত আছে, মাধবদেব শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার করিলে পর শঙ্করদেব এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন :—

যথা তরোর্ম্মূল নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ ভুজোপশাখা।
প্রাণোপহারশ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং তথাচ সর্ব্বার্হ্চনমচ্যুতেজ্যঃ ॥

অর্থাৎ

বৃক্ষমূলে জলদিলে ডালে পত্রে পুষ্পে ফলে সমস্তরে তৃপিতি হোয়য়।
প্রাণের ভোজনে যেন ইন্দ্রিয় তৃপিতি হোয়ে কৃষ্ণের পূজনে দেবগণ ॥

মাধব কুতার্কিক ছিলেন না। তাই পরাজিত হইয়া তিনি যাহা সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন তাহা আঁকড়াইয়া ধরিলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি ভগ্নীপতিকে কহিলেন, "তুমি শঙ্করদেবের নিকট আজ আমায় আনিয়া বড় উপকার করিলে। আমার বোধ হইতেছে, তোমার কৃপায় যিনি জ্ঞান-রশ্মিতে অজ্ঞানান্ধ-চক্ষু উন্মীলন করেন, আমি সেই পরম গুরুর সাক্ষাৎ পাইলাম।"

মাধবের দেবীপূজা আর হইল না। অষ্টমী তিথি সমাগত দেখিয়া তিনি ধূপ, দীপ ও

তাম্বূলসহকারে নৈবেদ্য রচনা করিলেন এবং রাম রাম গুরুর সন্নিহিত হইয়া বলিলেন "গুরো! এই নৈবেদ্য তুমি শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া দাও।" রাম রাম গুরু সহাস্যে মাধবের গৃহে আসিয়া নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলেন। সেই উৎসৃষ্ট নৈবেদ্য লইয়া মাধব শঙ্করদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। শঙ্করদেব কহিলেন, "কিহে মাধব! কাল তোমার দেবীপূজা হইবে, আজ যে নৈবেদ্য লইয়া আসিলে!" মাধব দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "প্রভো! এ দেবীর প্রসাদ নহে। এই নৈবেদ্য রাম রাম গুরু শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।" একথা শুনিয়া শঙ্করদেব আহ্লাদে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। এবং পুত্র রামানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন "বৎস! এই প্রসাদ তুলিয়া রাখ! আমি স্বয়ং ইহা ভক্ষণ করিব।" এইরূপে মাধব-বিজয় সম্পন্ন হইল।

তখন শঙ্করদেব রাম রামগুরু প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন "মাধবের বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তোমরাও সকলে তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের শরণ লও।" এখন হইতে প্রকাশ্যে দীক্ষা আরম্ভ হইল। মাধব, রামদাস, শঙ্করের জামাতা হরি প্রভৃতি একান্তমনে শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইলেন। শঙ্করদেব মাধবকে এই উপদেশ করিলেন :—

শঙ্করে বোলন্ত মাধবের মুখ চাই।
ভকতির সাধন সৎসঙ্গ বিনে নাই॥
ভগবতি নির্গুণার পৃথক সাধন।
সৎসঙ্গ ভক্তির কথা শুনা দিয়া মন॥
প্রথমতে মহন্তর সুশ্রূষা করিবেক।
শুদ্ধভাব দেখি তান কৃপা মিলিবেক॥
কহিবন্ত ধর্ম্ম ধরিবন্ত শুদ্ধমতি।
হরিকথা প্রসঙ্গত উপজিব রতি॥
কৃষ্ণ হৈবেক প্রেম দৃঢ়ভক্তি জাত।
দেহ ব্যতিরেকে আত্মা জানিবা সাক্ষাত॥
কৃষ্ণর পরম কৃপা হৈবে তাক প্রতি।
সর্ব্বজ্ঞতা আদি গুণ মিলিবে সম্প্রতি॥

মাধব-বিজয়ের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। শাক্তসমাজে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। শ্রীধর ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ মিশ্র বামনাচার্য্য, রত্নাকর কন্দলি প্রভৃতি অগ্রণী ব্যক্তিরা অন্যান্য সামাজিকদিগকে আহ্বান করিয়া সভা পাতিয়া বসিলেন। সকলেরই মুখে একই কথা, 'শঙ্কর গোমস্তা নাকি ভক্তির পথ প্রকাশ করিতেছে? যদি সকলেই এক শরণিয়া হইয়া পড়ে, দেবীপূজাদি ক্রিয়াকাণ্ড না করে, তবে ধর্ম্ম রহিল কোথায়?' শ্রীধর ভট্টাচার্য্যের কিছু তর্ক-শাস্ত্রে অধিকার ছিল। তিনি সকলকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন "ভয় নাই, শঙ্করের উদ্ভাবিত সমস্ত মতে দোষারোপ করিয়া তাহা খণ্ডন করিব, নিশ্চয় বলিতেছি, তোমরা

তাহা দেখিতে পাইবে।" শঙ্করদেবকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিয়া প্রশ্রয় দেওয়া অকর্ত্তব্য মনে করিয়া, ব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য্য, কহিলেন "শঙ্কর সামান্য লোক, উহার সহিত আবার বিচার কি? একাকী বসিয়া যাহা ইচ্ছা করুক, তোমরা কেহ উহার কথায় কাণ দিও না। তাহা হইলে লজ্জা পাইয়া সে আপনা আপনি নিরস্ত হইবে!" কবিরাজ মিশ্র বোধ হয় শ্রীমদ্ভাগবতের কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি শঙ্করদেবের ভগবদ্ভক্তিরও কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন "না হে না, শঙ্করকে এরূপ তাচ্ছীল্য করিলে চলিবে না। শঙ্কর পরমপণ্ডিত ও ভগবদ্ভক্ত। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানশীল ব্রাহ্মণ হইতেও ভগবদ্ভক্ত বহুগুণে শ্রেষ্ঠ!" তখন রত্নাকর কন্দলি কহিলেন :—"ভাল ভাল! যদি শঙ্করকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারা নাই যায়, আমি বলি এক কাজ কর। 'ভকত'-দিগকে দেখিলেই নিন্দা করিতে আরম্ভ কর। বিস্তর নিন্দাবাদ শুনিতে শুনিতে 'ভকতের দল' তাহাদের মত অবশ্যই ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে।" এই কথায় অনেকেই "সাধু! সাধু!" বলিয়া সম্মতিসূচক উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 'ইহাতেও যদি 'ভকত-দিগের' দমন না হয়, তখন অন্য উপায় উদ্ভাবিত হইবে।' সভা ভঙ্গ হইল, সকলেই ঘরে ঘরে চলিয়া গেলেন; কিন্তু কাহারও মনে শান্তি রহিল না।

মাধবদেব দেবীপূজা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভক্ত হইলে পর ক্রমেই একটি দুইটি করিয়া লোক শঙ্করোপদেশে শ্রীকৃষ্ণপদে শরণ লইতে আরম্ভ করিল। 'ভকতদিগের' সংখ্যা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই বৈষ্ণবাচারের ঘটা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপে শঙ্করদেব নির্জ্জন গৃহকোণ হইতে বহির্গত হইয়া প্রচার-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন।

মাধবদেবের পিতা দীঘল পুরিয়া গিরির সহিত কেতাই খাঁ নামক তাঁহার যে জ্ঞাতি আসামে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন, উপরোক্ত বুঢ়া খাঁ তাঁহারই পিতা। কেতাই খাঁ সম্পর্কে শঙ্করদেবের পিসা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিলেন। ইনিই তৎকালে গাঙ্গ মৌ (২৪) অঞ্চলের 'ভূঞা' পদে আসীন ছিলেন। ইঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমস্ত পণ্ডিতদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হইয়াই শঙ্করদেব সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিচারে পরাস্ত করিয়া ভক্তিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিবেন বলিয়া কল্য প্রকাশ করিয়াছেন। সমস্ত ভক্তগণ মালা হাতে সভায় যাইবার জন্য সজ্জিত হইয়া রহিয়াছেন। তখন শঙ্করদেব ভাবিতেছেন :—"কল্য ক্রোধবশে যে কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা ভাল হয় নাই। এই ভারতভূমিতে বেদ-বিধি ও ধর্ম্ম ব্রাহ্মণই রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেক অব্রাহ্মণ আছেন বটে, কিন্তু ইঁহাদিগকে এই প্রকার প্রকাশ্যে অপমান করিলে সমগ্র ব্রাহ্মণকুলের অবমাননা হইবে। ভাল, আমি ব্রাহ্মণদিগের মুখেই হরিনাম ব্যক্ত করিব।" মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিয়া তিনি রাম রাম গুরু, মাধব ও রামদাস ইত্যাদি ভক্তগণসহ বুঢ়া খাঁর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

(২৪) গাঙ্গ মৌ ব্রহ্মপুত্রের উত্তরপারে আধুনিক দরঙ্গ জিলার অন্তর্গত।

পণ্ডিতদিগের মধ্যে রত্নাকর কন্দলী কিছু লঘুহৃদয় ছিলেন। ইনিই পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, নিন্দাবাদ দ্বারা ভক্তদিগকে নিরস্ত করিতে হইবে। শঙ্করদেব সভাস্থ হইয়া ইঁহার সন্নিহিত হইলেন এবং সবিনয়ে কহিলেন :—"গুরো! আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, বিবেচনা করিয়া আমাকে একটা ব্যবস্থা দিন।" শঙ্করের বিনয়পূর্ণ জিজ্ঞাসায় কন্দলী মনে মনে বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহার মনে কিছু অভিমানও জন্মিল। কারণ তিনি ভাবিলেন, উপস্থিত পণ্ডিতসমাজের মধ্যে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াই শঙ্করদেব তাঁহার ব্যবস্থাপ্রার্থী হইয়াছেন। সুতরাং তিনি শঙ্করদেবের প্রিয়বাক্য কথনের জন্য স্বয়ং প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। শঙ্করদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "পাপীলোকের শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকার আছে, না নাই ?"

কন্দলী কহিলেন "পাতকীর কোনও কর্ম্মে অধিকার নাই।" শঙ্করদেব জিজ্ঞাসার ভাবে অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সকলেই সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিলেন।

শঙ্কর। "পাতকীর হরিনাম গ্রহণে অধিকার আছে, না নাই ?

কন্দলী। হরিনাম গ্রহণে সকলেরই অধিকার আছে।"

শঙ্করদেব আবার ব্রাহ্মণমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আবার মস্তকান্দোলনে সকলে সম্মতি দিলেন।

শঙ্কর। "পাতকী ব্যক্তির প্রদত্ত ভোজ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে কি ?"

কন্দলী। "পাপীর বস্তু গ্রহণে পাপ হয়।" এবারও মাথা নড়িল।

তখন শঙ্করদেব বুঢ়া খাঁকে ডাকিলেন। বৃদ্ধ বুঢ়া খাঁ 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা' ধর্ম্ম আচরণ করিতেছিলেন। তিনি আসিয়া কম্পিত কলেবরে দণ্ডায়মান হইলে শঙ্করদেব কহিলেন "এই ব্রাহ্মণ প্রভুরা বলিতেছেন, পাপীর কোন কর্ম্মে অধিকার নাই এবং পাপীর প্রদত্ত অন্ন গ্রহণীয় নহে। আপনি এই শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক অকপটে বলুন আপনি পাপী না পুণ্যাত্মা।"

বৃদ্ধ বুঢ়া খাঁ, "বাবা, আমি আবার পুণ্যাত্মা! আমি ঘোর পাপী।" এই বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। তখন শঙ্করদেব দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "প্রভুগণ! এই ব্যক্তি স্বয়ং বলিতেছেন ইনি পাপী; সুতরাং ইঁহার পিতৃলোকের কর্ম্মে অধিকারই নাই। আর আপনারা ইঁহার অন্নভোজন করিয়াছেন। সুতরাং আপনাদেরও পাপস্পর্শ হইয়াছে। এখন দেখিতেছি এক হরিনাম গ্রহণ ব্যতীত আপনাদের আর কোনও কর্ম্মে অধিকার নাই। অতএব একবার হরিধ্বনি করুন!" এই বলিয়া শঙ্করদেব হরিবোল হরিবোল বলিতে লাগিলেন। অমনি সমস্ত ভক্তগণ হরিবোল হরিবোল বলিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। হরিনামের উচ্চ ধ্বনিতে শ্রাদ্ধবাসর কম্পিত হইল—আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আসামে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল!

শঙ্করদেব

চতুর্থ প্রবন্ধ

শঙ্করদেবের দৃঢ় কৃষ্ণভক্তিতে কি প্রকারে আসামে বৈষ্ণবাচার প্রবর্ত্তিত ও হরিনামের উচ্চধ্বনি সমুত্থিত হইল পূর্ব্ব-প্রবন্ধে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকমাত্রেই এই সংসারে অবিশ্বাসী ও বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা যৎপরোনাস্তি নিগৃহীত হইয়াছেন; অধিক কি অনেককেই বিপক্ষের প্রবল জিঘাংসার নিকট প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। কিন্তু ভগবানের কি অপূর্ব্ব মহিমা! এই সকল দৃঢ় বিশ্বাসীরা কিছুতেই স্বমত ত্যাগ করেন নাই। পরন্তু সর্ব্বপ্রকার বিপদ আপদের মধ্যেও স্থাণুবৎ অটল ও অবিচলিত থাকিয়া স্ব স্ব মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মহাপুরুষ শঙ্করদেবের জীবনেও এই মহাজনসুলভ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

উত্তরোত্তর পরাজয়ের পর শাক্তগণ ভক্তি ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ত্যাগ করিলেন। এদিকে শঙ্করদেব রাম রায়কে ডাকিয়া এক জগন্নাথ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে কহিলেন, এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাকালে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে বহু অর্থ দান করিলেন। শঙ্করদেব ব্রাহ্মণদিগকে জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন "ইনিই কি ঈশ্বর?" ব্রাহ্মণেরা বলিলেন "ইনি ঈশ্বর বই কি? ইনি সাধু মহান্তের স্থাপিত।" শঙ্করদেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "সাধু কাহাকে বলেন? এবার ব্রাহ্মণেরা স্পষ্টই বলিয়া ফেলিলেন :—

জানা যিতো জনে হরি ভকতি করয়।
তা সবাকে সাধু বুলি, বিপ্র সবে কয়॥

"তবে আর হরিভক্তদের বিদ্বেষ করেন কেন?" শঙ্করদেবের এই কথায় ব্রাহ্মণেরা প্রকৃতই লজ্জাবোধ করিলেন। তখন শঙ্করদেব—

উচ্চ করি সমস্ত্যাত হরি বোলাইলন্ত।
সভা বিসর্জ্জিয়া পাছে গৃহক্ গৈলন্ত॥

সেই দিন ব্রাহ্মণেরা হরিনাম লইলেন বটে, কিন্তু তাহা মৌখিক। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কি প্রকারে সঞ্চারিত হয় শঙ্করদেব তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। গীতা ও ভাগবতাদির চর্চ্চা করিলে দৃঢ় কৃষ্ণভক্তির সঞ্চার হইতে পারে এই ভাবিয়া শঙ্করদেব এক দিবস ব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন 'শুভ মাঘ মাস উপস্থিত, আপনি পরম পণ্ডিত; আমাদের একান্ত ইচ্ছা আপনার মুখে গীতা শ্রবণ করি।" ব্রহ্মানন্দ গীতা পাঠ করিতে সম্মত হইলেন। তখন শঙ্করদেব উপস্থিত ভক্তদিগকে কহিলেন "ইনি গীতাশাস্ত্র পাঠ করিবেন, ইঁহাকে কিছু অর্থ দান করা উচিত।" তখন ভক্তগণ সকলেই কিছু কিছু অর্থ দান করিলেন। অনেক অর্থ সঞ্চিত হইল।

দক্ষিণ হস্তক পাতিলন্ত ব্রহ্মানন্দে।
দিবাক লাগিল বিত্ত মনত আনন্দে ॥
কতো এক তোলা কতো তিনি মহাবিত্ত।
অৰ্দ্ধ তোলা তুচ্ছ নুহি দেন্ত রঙ্গ চিত্ত ॥
তেখেনে পাইলেক বিপ্রে বিত্ত এক পোষ।
বিত্ত পাই চিত্ত করে উল্লস মাল্লস ॥

ব্রহ্মানন্দ যথাসময়ে পুনরায় গীতা পাঠ করিলেন। অনেক দক্ষিণাও পাইলেন। শঙ্করদেব তখন কহিলেন "গুরো! এই যে কৃষ্ণকথা পাঠ করিলে, সেই কৃষ্ণপদে তোমার শরণ লওয়া উচিত।" ব্রহ্মানন্দ এবং ক্রমে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা গীতা ও ভাগবতচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। তার পর—

ভকতের দ্বেষ্যভাব সবেয়ো এড়িলা।

শাক্তদিগের প্রতিকূলাচরণ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে পর যথারীতি কীর্ত্তন ও নাম-প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। ভক্তদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি ও ভক্তিধর্ম্মের প্রচার হইতে লাগিল। সর্ব্ব প্রথম ভক্তিশাস্ত্র সমূহের ভাষাগ্রন্থ রচনা ও প্রচার করিয়া শঙ্করদেব ভক্তিতত্ত্ব সকল জনসাধারণের বোধসুলভ করিয়া তুলিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং এবং অন্যের দ্বারা অনেক গ্রন্থের ভাঙ্গনি প্রকাশ করিলেন। নিম্নলিখিত মুদ্রিত অসমীয়া গ্রন্থে শঙ্করদেবের ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়—

১। শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধ অনাদি পাতন।
২। ঐ অষ্টম স্কন্ধ অমৃত মথন ও দেবাসুর-যুদ্ধ।
৩। ঐ ঐ বলি-ছলন স্কন্ধ।
৪। ঐ দশম ও একাদশ স্কন্ধ।
৫। বড় গীত ভটিমা ও গুণমালা।
৬। বৈষ্ণবী-কীর্ত্তন বা নাম-কীর্ত্তন।
৭। বৈষ্ণব-কীর্ত্তন।
৮। কীর্ত্তন।
৯। রামায়ণর উত্তরাকাণ্ড।
১০। লীলামালা।
১১। রুক্মিণীহরণ।
১২। হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান।
১৩। সীতা-সয়ম্বর প্রভৃতি কয়েক খানি নাটক।

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে রামায়ণ দশম ও একাদশ স্কন্ধ অতি বৃহৎ। ঐ গুলির রচনায় বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ শঙ্করদেব অতি বাল্যকাল হইতে শেষ

বয়সপর্য্যন্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি অদ্বিতীয় কবি প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানটি (২৫) তাঁহার শৈশব-রচনা। এই পুথির বন্দনাটি পাঠ করিলেই বুঝা যায়, তখনও কৃষ্ণ-নামে তাঁহার দৃঢ়তা জন্মে নাই। হরিশ্চন্দ্রকর্ত্তৃক রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তদুপলক্ষে বিশ্বামিত্র ঋষিকে সমগ্র রাজ্যদান ও আত্মবিক্রয় দ্বারা দক্ষিণা সংগ্রহ এই সকল কার্য্যই এই উপাখ্যানে প্রকৃতিপুঞ্জসহ হরিশ্চন্দ্রের সশরীরে স্বর্গারোহণের হেতুভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু :—

তন্ত্র মন্ত্র যজ্ঞ যত তপ তীর্থ কোটি শত
হরিনাম অধিক সবাতে। (কীর্ত্তন ৪৭৬ পৃঃ)।

ইহাই উত্তরকালে শঙ্করদেব ও তাঁহার ভক্তগণকর্ত্তৃক উদ্‌গীত হইয়াছিল। এক হরিশ্চন্দ্র-উপাখ্যান ব্যতীত শঙ্করদেব আর যাহা কিছু লিখিয়াছেন তৎসমস্তই ভক্তিশাস্ত্র-মূলক। শেষবয়সে রাজা নরনারায়ণের অনুরোধে তিনি সমগ্র কৃষ্ণলীলা একটি কবিতায় নিবদ্ধ করিয়া "কৃষ্ণগুণমালা" রচনা করেন।

ভক্তিশাস্ত্রের প্রচারে শঙ্করদেবের আজীবনব্যাপী প্রয়াস বহু ফলোপধায়িনী হইয়াছিল। একেত তাঁহার কবিত্বশক্তি অতুলনীয় তদুপরি বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও ভক্তিতত্বের প্রচারে ঐকান্তিকতা হেতু তাঁহার রচনা সর্ব্বত্র মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। পৌরাণিক বৃত্তান্তসকল বর্ণনায় তিনি শুধু মূলের অনুবাদ করিয়াছেন এমন নহে; প্রায়শঃ বিভিন্ন পুরাণবর্ণিত বৃত্তান্তমালা একত্র গ্রথিত করিয়াছেন। তদ্দ্বারা ঐ গুলি লোকের অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তাঁহার রচনায় যে যে স্থলে মূল শ্লোকের অনুবাদ দেখা যায়, ঐ গুলি তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতররূপে কেহই পদ্যে অনুবাদ করিতে পারিবেন কি না সংশয়স্থল। তাঁহার রচনায় আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ঐ গুলিতে স্বকপোল কল্পিত কথার সংমিশ্রণ অধিক নহে। ইহার ফলে তাঁহার রচনা তর্কস্থলে প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ৮ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে "চৈতন্য-চরিতামৃত" রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরু জীব গোস্বামী বৃন্দাবনে ঐ গ্রন্থ প্রচার করিতে দেন নাই। তিনি এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, সমগ্র ভক্তিশাস্ত্রের সার ঐ গ্রন্থে ভাষায় নিবদ্ধ হইয়াছে। উহা পাঠ করিয়া লোকে অনায়াসে ভক্তিতত্ব বুঝিতে পারিবে। তৎপর মূলশাস্ত্র পাঠে কাহারও আগ্রহ থাকিবে না। শঙ্করদেবকর্ত্তৃক ভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারে কেহই এইরূপ বাধা দিতে পারেন নাই। ফলে আসামের বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে শঙ্কর-মাধব রচিত কীর্ত্তন, দশম নাম-ঘোষা প্রভৃতিই শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। ঐ গুলি যে সকল মূল সংস্কৃত পুরাণাদি

(২৫) 'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানের' প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে ৬০০ শতেরও অধিক পদ দেখিতে পাওয়া যায়। সংশোধিত মুদ্রিত গ্রন্থে ৫১২টি মাত্র পদ আছে। ৬০৪ সংখ্যক পদটি এই :—"চণ্ডালের বাণি হেন মনে জানি, মনে হৈবা পরিতোষ।" ১৩১১ সালের কার্ত্তিক মাসের 'প্রদীপ' দ্রষ্টব্য।

হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার চর্চা এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। জীব গোস্বামীর নির্দ্ধারিত প্রণালীর উপকারিতা থাকিতে পারে; কিন্তু জ্ঞানবোধসুলভ ও অনায়াস-লভ্য হইলে তাহারও যে কিছু শুভফল না আছে এমন নহে। শঙ্কর-মাধব রচিত ভক্তিশাস্ত্রগুলি আপামর-সাধারণের মধ্যে যেরূপ বহুল প্রচারিত হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ঐ পুথিগুলির অসংখ্য পদ লোকের মুখে মুখে সতত উচ্চারিত হইতেছে। ঐ গুলির অর্থবোধের জন্য জটিল ও দার্শনিক টীকা নিষ্প্রয়োজন। আবৃত্তিমাত্র ঐ গুলি বোধগম্য হইয়া থাকে। অধুনা সংস্কৃতশাস্ত্রাদি মুদ্রিত ও অনুবাদসহকারে প্রচারিত হওয়ায় তর্কস্থলে শঙ্কর-মাধবের উক্তির মূল নির্দ্দেশেও অন্তরায় উপস্থিত হয় না।

শঙ্করদেবকর্ত্তৃক ভক্তিশাস্ত্রের প্রকাশহেতু শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব লোকসমাজে প্রচারিত হইতে লাগিল। তদুপরি রাম রাম গুরু, মাধব, রামদাস প্রভৃতি মহা মহা ভক্তদের সহিত নাম-কীর্ত্তন, কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। শঙ্কর ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—লোকে সাগ্রহে শুনিতে লাগিল—কীর্ত্তন ও ভাওনার আনন্দে সকলে মাতিয়া উঠিতে লাগিল—দ্রুতবেগে দেশে ভক্তিধর্ম্মের প্রচার হইতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শঙ্করদেব বড়পেটাঅঞ্চলে অধিষ্ঠান করিলে পরই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। উপর আসামেও তিনি বহুকাল ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু উপর-আসামে তিনি নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারেন নাই। স্থানে স্থানে তিনি দীর্ঘকাল ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারে তাঁহাকে নানা বিঘ্ন ও বিপত্তির সহিত দৃঢ়তা সহকারে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

বরদোয়ার "আতা আরুভক্ত-সংবাদ" নামক এক পুথিতে শঙ্করদেব কোন্ স্থানে কত কাল বাস করেন, তাহার নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

স্থান	কাল
আলিপুখুরি	১৩ বৎসর।
বরদোয়া	২১ বৎসর।
তীর্থ-ভ্রমণ	১২ বৎসর।
বরদোয়া	২১ বৎসর।
কোমরছেদা	৬ মাস।
গাজ-মৌ	৫ বৎসর। (জগদীশকর্ত্তৃক ভাগবত আনয়ন)।
বেলগুরি বা ধুঞাহাটা	১৫ বৎসর। (মাধব-সম্মিলন)।
কপলা	৬ মাস।
পালন্দি	৬ মাস। (নারায়ণ ঠাকুর-সম্মিলন)।
কুমার কুচি	১ বৎসর।
পাটবাউস	১৬ বৎসর। (গুরু দামোদর ও হরিগুরু সম্মিলন)।

"আতা ভক্ত-সংবাদে" (২৬) শঙ্করদেবের জীবিতকাল ১০৫ বৎসর বলিয়া সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। রামচরণ ঠাকুর প্রণীত (২৭) চরিত্র পুথি হইতে "তের মন্দ ছকুড়ি" এই পদ উদ্ধৃত করিয়া কোন কোন প্রবন্ধলেখক বলেন, শঙ্করদেবের জীবিতকাল তের কম ছয় কুড়ি অর্থাৎ ১০৭ বৎসর। কেহ কেহ দেড় মন্দ ছকুড়ি" এই পাঠান্তর সিদ্ধান্ত করিয়া ১১৮॥০ বৎসরে উপনীত হন। তাহা হইলে জন্মশক ১৩৭১ হয়।

দ্বিজ রামানন্দ প্রণীত চরিত্র-পুথিতে ১৩৭১ সাল জন্মকাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই পুথি শঙ্করদেবের পুত্র রামানন্দকর্ত্তৃক রচিত নহে। ইহা ভবানীপুরিয়া গোপাল আতার পথাবলম্বী রামানন্দ নামে এক ব্যক্তির লিখিত। উহা মহাপুরুষীয় সন্ত সাধুর গ্রহণীয় নহে (২৮) পরবর্ত্তীকালে লিখিত রুদ্রযামল (২৯) ও চরিত্র-সংহিতার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শঙ্করদেবের জন্ম-শক ১৩৭১ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রমাণিক চরিত্রপুথিতে জন্মশকের অনুল্লেখহেতু ঐ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধঃ হওয়া যায় না। "আতাভক্ত-সংবাদের" বিবরণী বিশ্বাস করিতে হইলে শঙ্করদেবের জন্মশক ১৩৮৫ হয়। তাহার সহিত প্রথমবার তীর্থ-ভ্রমণ পর্য্যন্ত ৪৬ বৎসর যোগ দিলে ১৪৩১ শক পাওয়া যায়,

(২৬) 'বিজয়া'—জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যায় "মহাপুরুষ ও শঙ্করদেব" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(২৭) এই রামচরণ ঠাকুর মহাপুরুষ মাধবদেবের ভাগিনেয়, শঙ্করদেবের সর্ব্বপ্রথম ভক্ত রামদাসের পুত্র এবং চরিত্র-লেখক দৈত্যারি ঠাকুরের পিতা রামচরণ কি না নিঃসন্দেহে বলা যায় না। ইঁহার রচিত সমগ্র পুথি এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য। স্থানে স্থানে ইহার ভণিতাযুক্ত পুথির যে যে অংশ পাওয়া যায়, ঐ গুলি একত্র সংযোজন করিয়া সমগ্র পুথির উদ্ধার করা সুকঠিন। প্রবাদ এই যে, এই সুবৃহৎ পুথি শুদ্ধাচারে রক্ষা করিতে না পারিলে অনর্থ ঘটিবে, এরূপ আশঙ্কা করিয়া কেহ উহা বহু লোকের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি কেহ সমগ্র পুথি এক স্থানে রক্ষার উদ্যম করেন নাই। এই পুথির রচয়িতা পূর্ব্বোক্ত রামচরণ হইলে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রামাণ্য বলিতে হইবে। কিন্তু ইহার বর্ণনা এরূপ বহু বিস্তৃত যে, এরূপ বিশদ চরিত্র-গ্রন্থ থাকা সত্বেও পরবর্ত্তী লেখকেরা কি জন্য ক্ষুদ্রতর চরিত্র গ্রন্থ সকল রচনা করিলেন একথার মীমাংসা করা যায় না। আর একটি কথা কণ্ঠভূষণের চরিত্র পুথিতে শঙ্করদেবের চরিত্র প্রায়শঃ মানবচরিত্ররূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। দৈত্যারি ঠাকুর শঙ্করদেবের ব্যবহারের জন্য এক দরজি কর্ত্তৃক চারিহস্তবিশিষ্ট জামা তৈয়ারি করিবার কথা উল্লেখ করিয়া অলৌকিক ব্যাপারের ইঙ্গিতমাত্র করিয়াছেন। আর রামচরণ ঠাকুরের রচিত পুথিতে অলৌকিক বৃত্তান্তের এরূপ বহুল সমাবেশ যে, এই গ্রন্থ পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করিতে দ্বিধা উপস্থিত হয়।

(২৮) ২য় ভাগ "জোনাকী" দ্রষ্টব্য।

(২৯)
খ বাণ বিশ্ব বেদকে শশাঙ্ক গণিতেশাকে।
শ্রীমৎ শঙ্করনামাসৌহবতীর্ণঃ কলৌ যুগে।
বিন্দু রস বেদ চন্দ্র শাকে শঙ্করসংজ্ঞকঃ।
নবভাবং সমুৎসৃজ্য ভাদ্রমাসি স্বাগাৎপদম্। (রুদ্রযামলম্।)
শাকে শুভ্রাংশু সপ্ত জ্বলন শশিমিতো যোহবতীর্ণো ধরিত্র্যাম্।
স শ্রীশ্রীশঙ্করঃ শ্রীহরি পদ-রশমৎ ব্যোমরস।ব্ধি চন্দ্রে। চরিত্র-সংহিতা।

সুতরাং ঐ শকে অদ্বৈত-সভায় শঙ্করদেবের উপস্থিতি-সম্বন্ধে অপ্রত্যয় উপস্থিত হয় না। যাহা হউক, অনেকেই অধুনা ১৩৭১ শক শঙ্করদেবের জন্মশক বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন এবং "আতা ভক্ত-সংবাদে" ১৪ বৎসর বাদ পড়িয়াছে মনে করেন। তাঁহাদের মতে আলিপুখুরি ও বরদোয়ার তীর্থভ্রমণের পূর্ব্বে ১০ বৎসর ও বেহারে ২ বৎসর ৬ মাস এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়ার সময় ১ বৎসর ধরিয়া মোট ১১৯ বৎসর হইবে। এই হিসাবে ৪৪ বৎসর বয়সের সময় শঙ্করদেবের প্রথম তীর্থযাত্রার কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

উপরোক্ত মন্তব্যসহ আতাভক্ত-সংবাদের বিবরণীর প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তীর্থ-ভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াই শঙ্করদেব ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন নাই। সম্ভবতঃ তিনি বহুকাল ভক্তিশাস্ত্রের চর্চ্চা ও গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। ধুঞাহাটা বা বেলগুড়িতেই প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ হয়। ঐ স্থানে শঙ্করদেব ১৬ বৎসর ছিলেন। ঐ সময় মধ্যে ভক্ত রামদাসের দীক্ষা ও মাধব-সম্মিলন হইলে পর শাক্তদিগের সহিত বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। বিপক্ষেরা রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া ফললাভ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু শঙ্করদেবও যে রাজানুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন এমন নহে। বিশেষতঃ তদানীন্তন আহমরাজ-দিগের বিচার-প্রণালীর যেরূপ পরিচয় চরিত্রপুথিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ রাজ্যে নিরুপদ্রবে বাস করা সম্ভবপর ছিল কি না সংশয়স্থল। প্রধানতঃ যে ঘটনায় শঙ্করদেব ধুঞাহাটা পরিত্যাগ করেন তাহা এই ;—আহমরাজ হাতী ধরিবার জন্য খেদা পাতিয়া ভূঞাদিগকে লোকজনসহ গড় রক্ষা করিতে আদেশ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ গড় ভাঙ্গিয়া হাতী পলায়ন করে। তখন রাজা ভূঞাদিগকে ধরিয়া আনিতে আদেশ দেন। এই সংবাদ পাইয়া সকলেই পরিজনদিগকে নৌকায় তুলিয়া পলাইতে লাগিলেন। শঙ্করদেব পলায়নের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় আহমেরা আসিয়া পড়িল। কথিত আছে, এই সময় শঙ্করদেব এক লম্ফে একটা চৌদ্দ হাত গড়খাই পার হইয়া গিয়াছিলেন। আহমেরা তাঁহাকে ধরিতে পারিল না ; কিন্তু তাঁহার জামাতা হরি ও মাধবদেবকে ধরিয়া লইয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে মাধব হরিকে কহিলেন, "শত্রুরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণ সংহার করিবে। যদি অগ্রে তোমায় বধ করে, আমি তোমায় হরিনাম শুনাইব, আর যদি প্রথমে আমাকে হত্যা করে তবে হরিনাম শুনাইবার ভার তোমার উপর রহিল।" আহমেরা মালা ও কমণ্ডলুধারী দেখিয়া মাধবদেবকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু হরিকে খড়্গাঘাতে নিহত করিল। কথিত আছে, হরির ছিন্ন মুণ্ড "রাম রাম" উচ্চারণ করিয়াছিল।

মাধবদেব আহমদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শঙ্করদেব ও অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া শঙ্করদেবের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার মুখে জামাতার শোচনীয় পরিণাম ও তাঁহার অন্তিমকালীন দৃশ্যের বর্ণনা শুনিয়া শঙ্করদেব দর-দরিত ধারায় প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই শঙ্করদেব ধুঞাহাটা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এমন বোধ

হয় না। তাঁহার চরিত্র পুথিতে দেখা যায়, রাজা নরনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করিলে পর তাঁহার ভ্রাতা প্রসিদ্ধ চিলারায় সসৈন্যে অগ্রগামী হইয়া আহমদিগের রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা নরনারায়ণ পরম ধার্ম্মিক ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার যশঃ ও কীর্ত্তি-কাহিনী লোক মুখে শুনিয়া দলে দলে লোক উপর আসাম হইতে তাঁহার রাজ্যে বাস করিবার জন্য চলিয়া যায়। দৈত্যারি ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

ধুঞাহাটা হন্তে শুনে লোক সমাচার।
গীত কবিত গুণ শুনয় রাজার।
তার রাজ্যে যাইবে মন সমস্ত প্রজার॥
সেই সময়ত নরনারায়ণ রাজা।
মারিবে আসাম রাজ্য সাজি লৈল প্রজা॥
আন হয়া লোক পাহ করি বাজু দিল।
আপন ইচ্ছায় লোক সমস্তে আসিল॥

ইতিহাসে দেখা যায় ১৪৬৮ শকে রাজা নরনারায়ণ আহম রাজ্য আক্রমণ করেন। "আতা ভক্ত সংবাদের" বিবরণ অনুসারে শঙ্করদেব ১৪৭২ শকে অর্থাৎ যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ার ৪ বৎসর মধ্যে ধুঞাহাটা ত্যাগ করেন। শঙ্করদেবের জন্ম শক ১৩৭১ বলিয়া গ্রহণ করিলে ধুঞাহাটা ত্যাগের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ১০০ বৎসর হয়; সুতরাং আতা ভক্ত সংবাদের বিবরণ ইতিহাস ও চরিত্র পুথির অবিরোধী বলিয়া অধিকতর নির্ভর যোগ্য বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে এবং শঙ্করদেবের জন্ম শক ১৩৭১ বলিয়া গ্রহণ করিতে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকেরা যে সংশয় প্রকাশ করেন, তাহা অহেতুক বোধ হয় না।

শঙ্করদেবের যত গুলি চরিত্র পুথি আছে, তাহার প্রত্যেক খানিতেই তৎকর্ত্তৃক চৈতন্য দর্শন বর্ণিত হইয়াছে। আর উক্ত হইয়াছে যে তিনি ধুঞাহাটা হইতে বড়পেটায় গেলে পর অনেক শিষ্য সহকারে তীর্থযাত্রা করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন।

আতাভক্ত সংবাদ অনুসারে ১৪৭২ শকের পরে এই ঘটনা ধরিতে হইবে। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। কারণ ১৪৬৫ শকে চৈতন্যের তিরোভাব হইয়াছে। সুতরাং ধুঞাহাটা হইতে শঙ্করদেব কর্ত্তৃক তীর্থযাত্রা কল্পনা না করিলে তৎকর্ত্তৃক চৈতন্যদর্শন অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার জন্ম শক ১৩৭১ ধরিলে বড়পেটা হইতে তীর্থ-যাত্রা করিয়া চৈতন্যদর্শন আরও অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে শঙ্করদেবের জীবনের অনেক ঘটনার ন্যায় তৎকর্ত্তৃক চৈতন্যদর্শন তাঁহার চরিত্র পুথিতে বড়পেটা গমনের পর বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু উহা পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধে বলিয়াছি, শ্রীচৈতন্য অবতাররূপে স্বীকৃত হইবার পূর্ব্বেই শঙ্করদেব নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রকার ভজন চর্চ্চায় বিরত থাকিয়া গৌরহরি শুধু নামকীর্ত্তন প্রচারের যে উদ্যম করেন, শঙ্করদেব তাহার প্রতিরোধী ভাব লইয়াই দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মহাপুরুষীয় সাহিত্যে

নদীয়ার উল্লেখ ভূরি ভূরি পাওয়া বটে, কিন্তু কুত্রাপি নদীয়া ও তদ্দেশীয় শিক্ষার প্রতি সম্ভ্রম-ব্যঞ্জক ভাবের বর্ণনা দেখা যায় না। বরং তদ্বিপরীত ভাবই লক্ষ্য হইয়া থাকে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। যে পণ্ডিত গৌড়েশ্বরের সভায় চণ্ডীবর কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, উক্ত হইয়াছে, তিনি নদীয়া হইতে আসিয়াছিলেন এবং বিদ্যার পরিচয় প্রদর্শনার্থ রাশীকৃত পুথি বলদের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া সঙ্গে লইয়া চলিতেন! গয়াপাণি শঙ্করদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া "তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থই করিতে পারিলেন না। উক্ত হইয়াছে, ইনিও নবদ্বীপেই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! শঙ্করদেব স্বয়ং নবদ্বীপ ও তথাকার শিক্ষা ও লোকচরিত্রসম্বন্ধে এবম্প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এমন প্রমাণ নাই। তিনি প্রাপ্ততেজ চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ষোড়শাক্ষরী নাম মন্ত্র (৩০) আসাম হইতে বিদূরিত করিয়া চতুরক্ষর মন্ত্র (৩১) প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের তরঙ্গ আসামে আসিয়া সাগরতটপ্রহত উর্ম্মির ন্যায় ফিরিয়া গিয়াছিল। সুতরাং শঙ্করপথাবলম্বী মহাপুরুষীয় লোকেরা নদীয়ার সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাশীলতা দেখাইলে উহা অস্বাভাবিক মনে করিবার হেতু নাই। চরিত্র-পুথিতে আছে, শঙ্করদেব রূপ-সনাতন-প্রেরিত প্রচারকের মুখে বৃন্দাবনের বৃত্তান্ত শুনিয়া বৃন্দাবন দর্শনে উৎসুক হন। শিষ্যদিগকে বৃন্দাবন-গমনে উদ্বুদ্ধ করিতে তিনি বলিয়াছিলেন :—

> আসা একেলগে সবে যাঁও বৃন্দাবন।
> আছে বৃন্দাবন দাস হয়োঁ দরিশন ॥
> যি সব ভক্তির ভাগ করিছো বেকত।
> দুই মুই পুছি তাস্ত লৈবাহা সম্মত ॥ (৩২)

এতদ্দ্বারা রূপ-সনাতন ও বৃন্দাবন দাস প্রভৃতির প্রতি তাঁহার যথোচিত শ্রদ্ধার ভাবই প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ শঙ্করদেব ধর্ম্মপ্রচারে চৈতন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও তৎপ্রতি অশ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তাঁহার চরিত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

> শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্র আছন্ত যথাত।
> তৈলন্ত শঙ্কর-সূর্য্য প্রবেশ তথাত ॥

এই বাক্যটিতে উভয় মহাত্মারই স্বরূপ যথাসঙ্গত উক্ত হইয়াছে বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য চন্দ্রের ন্যায় কোমল মধুরদর্শন—প্রেমের গলিত ধারা, আর শঙ্কর সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপূর্ণ

---

(৩০) হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

(৩১) রামনারায়ণ কৃষ্ণহরি।

(৩২) মাধবদেবের কৌশলে শঙ্করদেব বৃন্দাবন গমনে নিরস্ত হন। যদি তিনি যাইতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আসাম ও বঙ্গের বৈষ্ণব-সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য দূরীভূত হইয়া উভয় সম্প্রদায়ের একীকরণ হইয়া যাইত। অন্ততঃ বাঙ্গালা বৈষ্ণব-সাহিত্যে শঙ্করদেব ও তদনুসঙ্গী ভক্তদের বিবরণী পাওয়া যাইত। অন্যপক্ষে মহাপুরুষীয় সাম্প্রদায়িক সাহিত্যে বৃন্দাবনবাসী ভক্তদের বিবরণ-সম্বন্ধেও দৈন্য লক্ষিত হইত না।

উজ্জ্বল—জ্ঞানের প্রখর রশ্মি। শঙ্করদেবের জীবদ্দশাতেই চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের তরঙ্গ আসাম হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত এবং চট্টগ্রাম হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। শঙ্কর-দেব তাহা অনবগত ছিলেন না, কিন্তু দেখা যায়, রূপ-সনাতন ও বৃন্দাবন দাসের প্রতিই তাঁহার আকর্ষণ অধিক, ইহার কারণ কি? রূপ ও সনাতনই চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতের লেখক। সুতরাং ইঁহারা সকলেই শঙ্করদেবের ন্যায় জ্ঞান-চর্চ্চায় নিযুক্ত; কেহই জ্ঞানশূন্য ভক্তিমার্গের পথিক নহেন!

শঙ্করদেব কর্ত্তৃক চৈতন্যদর্শন উল্লেখ করিয়া কণ্ঠভূষণ লিখিয়াছেন :—

চৈতন্য গোসাইক তথা ভৈল দরিশন।
দুইকে দুই না চাহিলা নাহিকে সম্ভাষণ॥
মুহূর্ত্তেক মানে দুয়ো চাহি আছিলন্ত।
নিবর্ত্তিয়া আসি বাসা ঘরে রহিলন্ত॥

দৈত্যারি ঠাকুর এই বৃত্তান্ত আরও কিছু সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন :—

শঙ্করর নাম শুনি কৃষ্ণচৈতন্যর।
মিলিল আনন্দ বাঢ় ভৈলন্ত মঠর॥
দুয়ার মুখত আছি রহিলন্ত চাই।
দুয়ো নয়নর নীর ধারে বহি যাই॥
শঙ্করয়ো নয়নর নীর বহে ধারে।
পথ হৈতে নিরখিয়া আছন্ত সাদরে॥
কতক্ষণ দুইকো দুই চাই প্রেমমনে!
পশিলা মঠত লৈয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে॥
নমাতিলা দুইকো দুই নিদিলা উত্তর।
পরম হরিষ মনে চলিলা শঙ্কর॥

দ্বিজ রামরায় প্রণীত দেব দামোদরের চরিত "গুরুলীলা" গ্রন্থে আছে :—

কণ্ঠভূষণর মুখে শুনিছে শঙ্কর।
কৃষ্ণ যে চৈতন্য হুয়া হৈছে অবতার॥
ব্রহ্মানন্দ আচার্য্যোও কহিছে পূর্ব্বত।
ব্রহ্ম হরিদাসে পাছে কৈলা শঙ্করত॥
সেই কথা শুমরি শঙ্কর মৌন ভৈলা।
রাম রাম গুরু সমে উচর চাপিলা॥
অবনত হুয়া দুই নমিলা সাক্ষাৎ।
পূর্ব্বাপর পুছিলন্ত কথা যত যত॥

শঙ্করর আগে না মাতিলা মহাজ্ঞানী।
কমণ্ডলু জল ঢালি বুঝাইলা আপনি ॥
শঙ্করেও বুঝিলন্ত সেই অনুমানে।
এক যে শরণ ধর্ম্ম চৈতন্যার স্থানে ॥

সুপ্রসিদ্ধ কথাভাগবতকার দেব দামোদরের শিষ্য পরমভাগবত ভট্টদেব কবিরত্ন-বিরচিত "সৎসম্প্রদায়-কথা" আর একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহাতে লিখিত হইয়াছে :—

"শ্রীশঙ্করে পূর্ব্বে দামোদর-মুখে চৈতন্যার বার্ত্তা শুনি দেখিবে ইচ্ছা আছিল; বিষয় ব্যগ্রে না পাইল। পাচে রাম রায় বড়ুব্যাক গোমস্তা পাতি রাম রাম গুরু সমে মণিকুটে গৈলা। পাচে মাধব দর্শন হুই রত্নপাঠকের মুখে ভাগবত শুনি বোলে হে রত্নপাঠক, এহি শাস্ত্র ইঠাইত কোনে প্রবর্ত্তাইল। পাঠকে বোলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্ত্তাইল। শঙ্করে বোলে এখন প্রভু চৈতন্য কত আছে। পাঠকে বোলে এই গোফাতে আছিল; এখন যাই ওড়েষাত আছে। এই শুনি শঙ্করে রাম রাম গুরু সহিতে পশ্চিমে চলি ওড়েষাক গৈলা। পাচে ঠাকুর দর্শন হুই চৈতন্যার মঠর দ্বারে গৈলা। তাতে ব্রহ্ম হরিদাস দেখি বোলে তোরা দুই কৈত থাকা। শঙ্করে বোলে আমি পূর্ব্বদেশী কায়স্থ এন্তে রাম রাম ব্রাহ্মণ; মহাপ্রভুক দেখিতে চাঁও। ব্রহ্ম হরিদাসে বোলে এখন মহাপ্রভুব্রতী সম্ভাষণা নকরে, কমনে দেখিবা। যদি দেখিতে চোঁবা কিছো বিত্ত ভাঙ্গি কীর্ত্তন আরম্ভা। কীর্ত্তনর লোভে ওলাইতে দেখিবা। এই শুনি শঙ্করে বিত্ত ভাঙ্গি কীর্ত্তন আরম্ভিলা। পাচে মহাপ্রভু তাতে ওলাই বহু মহন্তর মধ্যত দুই প্রহর নৃত্য করি অলক্ষিতে গৈলেক। পাচে শঙ্করে তাঙ্ক লক্ষিবে না পারি পুনু হরিদাসত পুচিলা; বোলে হে ব্রহ্ম হরিদাস প্রভুক চিনি না পাইলো তান কি লক্ষণ। হরিদাসে বোলে প্রভুর রূপ গৌরাঙ্গ, মুণ্ডিত মুণ্ড গলত কণ্ঠী হাতে জপমালা, কটিত কপিন, মুখে হরিবোল, প্রেমে বিভোল, এহি লক্ষণ। তাঙ্ক দেখিতে আউর উপায় কহো। যেখন প্রাতসে ঠাকুরর জলশঙ্খ বাদ্য হয়, তেখনে দ্বার মেলে। সেহি বেলা মহাপ্রভু সাগর স্নানে যাই। সেহি বেলা দ্বারত থাকি দুয়ো অবশ্যে দেখিবা। এহি শুনি শঙ্করে রাম রাম গুরু সহিতে প্রাতসে যাই দ্বারতে রহিল। পাচে জলশঙ্খ বাদ্য হৈল, কপাটো মেলিল। সেহি সময়ে চৈতন্যো কমণ্ডলু লই দ্বারর ওলাই রামরামর মাথে উঝট লাগিল; তাতে মহাপ্রভু চারিনাম উচ্চারিল। সেই তান মন্ত্র ভৈলা। পাচে সাগরত স্নান করি ফিরি আহন্তে তান স্বরূপ দেখি পাবর থোজে প্রণাম করি ব্রহ্ম হরিদাসক বোলে গুরু তোমার প্রসাদত প্রভুক দেখিলো, জন্ম সাফল ভৈল। এখন এই খানি প্রভুত পোচা কলিত কাত ভক্তি রহিবেক, আর সিদেশত বা হরিনাম কোনে দিবেক। এহি শুনি হরিদাসে চৈতন্যাত পুছিলে বোলে মহাপ্রভু পূর্ব্বদেশী দুই প্রাণী আসি কাতরে পুচিছে বোলে কলিত কাত ভক্তি রহিবেক; আমাক বা কি আজ্ঞা করে; সিদেশত হরিনাম কোনে দিবেক। এহি শুনি চৈতন্যে বোলন্ত, হে ব্রহ্ম হরিদাস, ভক্তি প্রেমরস উচ্চত ন রহে নামত বহে। ব্রজেকে

নিষ্কিঞ্চন অনন্ত ভক্তি রহিবেক। হের দেখাঁও, এহি বুলি কমণ্ডলুর জল গহ্বরে ঢালিল। পাচে উচ্চে ন বহি জল নামে বহিল। আরু বোলন্ত সিদেশক গৈতে শঙ্করক জানো। সি বর মনুষ্য, তাঙ্ক আমার এই আজ্ঞা। আমার শিষ্য কণ্ঠভূষণর মুখে ভাগবত শুনি শঙ্করে গীত পদ করিবেক, আরু গজপতি রায় পুরুষোত্তমে করা সাতশ শ্লোকর নামমালিকা খেনির ঘোষা করিবেক। আর রাম রাম বিপ্রকে জানি, তাঙ্ক এই আজ্ঞা যি চারি নাম পাইছে, তাকে ব্রহ্ম বুলি ধরিবেক, আর এই বত্রিশ শ্লোকে শরণ পটলখানি রাম রামে নি মোর শিষ্য দামোদরর হাতত দিবেক। সেই পটল ক্রমে সিদেশত হরির নাম দিবেক, এই আমার আজ্ঞা কই পঠাব্। পাচে ব্রহ্ম হরিদাসে ওলাই আহি চৈতন্যর এই সকল আজ্ঞাকে শঙ্করত রামরামতো কই শঙ্করকো দিলে নামমালিকা রাম রামক দিলে শরণ পটলখানি। পাচে দুখানি দবনার মালাদি দুইকো পঠালে। পাচে শঙ্করে রাম রাম গুরু সহিতে চৈতন্যর মঠক প্রদক্ষিণে প্রণামি পুনু ঠাকুরকো প্রণামি তান প্রসাদ নির্ম্মাল্য লই কামরূপে রাম রায় বরুয়াত সকল বার্ত্তা কই পাটবাউসীত গৃহ বান্ধি প্রতিমা থাপিলা। পাচে কণ্ঠভূষণক আনি ভাগবত প্রসঙ্গ পাতি দামোদরক বার্ত্তা দিলা।"

কণ্ঠভূষণ, দৈত্যারি, দ্বিজ রাম রায়, ভট্টদেব ইঁহারা সকলেই প্রায় সমসাময়িক লেখক। ইঁহাদের রচনায় অগ্রপশ্চাৎ নির্ণয় করা সুকঠিন। আর ইঁহাদের প্রত্যেকেই স্বনাম ধন্য চরিত্রবান সাধুপুরুষ। ইচ্ছাপূর্ব্বক ইঁহারা স্ব স্ব রচনায় মিথ্যা কথা লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন, এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। মোটামুটি চারি জনের লিখায় বৃত্তান্তঘটিত সামঞ্জস্যও আছে। যথা—

(১) শঙ্কর ও চৈতন্যের পরস্পর দেখা হইয়াছিল, কিন্তু কথোপকথন হয় নাই।

(২) এই সাক্ষাৎ উড়িষ্যাতে হইয়াছিল।

(৩) শঙ্করদেব সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে চৈতন্যের নিকট কোনও উপদেশ লাভ করেন নাই।

এতদতিরিক্ত যে সকল বৃত্তান্তঘটিত অনৈক্য আছে, তাহার সামঞ্জস্য-সাধনের জন্য এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এই লেখকদের মধ্যে সকলেই শঙ্করদেবসম্বন্ধীয় কথা অন্যের নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন। সুতরাং শুনা কথায় যে কিছু কিছু অমিল থাকিবে ইহাতে বিচিত্রতা কি? ফলতঃ শঙ্কর ও চৈতন্যের সাক্ষাৎ হইয়া থাকিলে উহা উড়িষ্যাতেই হইয়াছিল। আর এই সাক্ষাতের পর শঙ্করদেব উপর-আসামে ফিরিয়া আসিয়া পশ্চাৎ পাটবাউসীতে গিয়াছিলেন, এরূপ ধরিয়া লইলে, এই বৃত্তান্ত অনৈতিহাসিক মনে করিবার কোনও হেতুই থাকে না। ভট্টদেব চৈতন্য দর্শনের পর আসামে প্রত্যাবর্ত্তন ও পশ্চাৎ পাটবাউসী গমন স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় লেখকেরাও শ্রীচৈতন্যকে শঙ্করদেবের দীক্ষাগুরু বা উপদেষ্টা বলিয়া কুত্রাপি উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা এইমাত্র বলেন যে, শ্রীক্ষেত্রে দূর হইতে সংকীর্ত্তন-মধ্যে নৃত্যপরায়ণ গৌরের প্রেমাবেশ দেখিয়া শঙ্করদেব জ্ঞান চর্চ্চায় বীতস্পৃহ হন এবং কীর্ত্তন, বড়গীত ও জাওনা

প্রভৃতির প্রচারে অধিকতর অনুরাগী হইয়া উঠেন। এই কথার সমর্থনের জন্য কতকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়। চৈতন্য-দর্শনের অব্যবহিত পরেই দৈত্যারি ঠাকুর শঙ্করদেবের প্রেমের আবেগে পুনঃপুনঃ আত্মবিস্মৃতির ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হইয়াছে, রাম রায় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শঙ্করদেব রাম-চরিত্র-বর্ণন করিতেছিলেন, কিন্তু কোন্ সময়ে উহা ছাড়িয়া কৃষ্ণ-কথা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই! কৃষ্ণনাম লইতেই প্রেমে তাঁহার প্রাণ আকুল হইতেছে! "ভক্তি-রত্নাবলী" পুথি আনীত হইলে পর উহাতে এক কৃষ্ণের শরণ কোথায় ?" এই বলিয়া শঙ্করদেব অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। পশ্চাৎ উহার শেষাংশ পঠিত হইলে পর উহাতে এক কৃষ্ণের শরণ দেখিয়া তিনি ঐ পুথি মস্তকে লইয়া আহ্লাদে নৃত্য করিয়াছিলেন! বস্তুতঃ ভগবৎ-প্রেমিক কতক্ষণ শুষ্ক শাস্ত্র-চর্চ্চায় তৃপ্ত থাকিতে পারেন ? প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিকের এমন দিন আপনিই উপস্থিত হয়, যখন নাম গ্রহণ মাত্র ঈশ্বরের স্বরূপ বোধ হইয়া থাকে। ক অক্ষর দেখিতেই কৃষ্ণ নামে দেহ পুলকিত হইয়া উঠে!

শঙ্করদেবের অনুসঙ্গীদের মধ্যেও অনেকেই মহা প্রেমিক ছিলেন। স্বয়ং শঙ্করদেব রাম রাম গুরুকে "মহাপ্রেমধারী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দৈত্যারি ঠাকুর লিখিয়াছেন, একদা কীর্ত্তনের মহাধুম লাগিয়া গিয়াছে। রাম রাম গুরু ও রামদাস এই দুইজন ওঝা কীর্ত্তন করিতেছেন, মাধব দেব তাল ধরিয়াছেন আর আনন্দ-মূর্ত্তিস্বরূপ শঙ্করদেব সাক্ষাতে রহিয়াছেন, সমস্ত লোক প্রেমানন্দ-রসে বিভোর তখন :—

কংশ বধ ঘোষা রাম রাম গুরু গান্ত।
সেহি সময়ত প্রেম উপজিল তান্ত॥
অম্বষ্ঠ সহিতে কুবলয় হাতী মারি।
ভৈলা রঙ্গশালাত প্রবেশ রাম হরি॥
কান্ধত হস্তির দান্ত শিশুগণ সঙ্গে।
ওহি পদ রাম রাম গুরু গান্ত রঙ্গে॥
সমস্তে লোকক প্রেম পরশি আছয়।
তান গায়ে চেতন গিয়ান নাহি কয়॥
প্রেমানন্দ সমুদ্রত মজিল সমুলি।
কান্ধত লৈলন্ত এক গোটা তম্ভ তুলি॥
স্বভাবে বাহিবে দুই মুনিষে পারয়।
আরু গোড় পুতি ঘরে লাগায়া আছয়॥
এক ঠেলা মারি তাক দুই হাতে ধরি।
কৌতুকে কান্ধত লৈয়া যান্ত লীলা করি॥

ভক্ত রামদাসও মহাপ্রেমিক ছিলেন। একদা প্রহ্লাদ-চরিত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে

তাঁহার প্রহলাদ ভাবাবেশ হয়। সেই সময় কীর্ত্তন-ঘরের ভিতর আগুন জ্বলিতেছিল। "এত প্রহ্লাদের অগ্নিকুণ্ড" এই বলিয়া তিনি তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়েন।

প্রেমে পরশিছে নাহি গাবত চেতন।
অগনিত লৈয়া পড়িলন্ত তেতিক্ষণ॥
তাতে পড়ি আনন্দতে পদক বোলন্ত।
সমস্ত সমাজে হরি হরি উচ্চ রন্ত॥

সঙ্গীতের সম্মোহিনী-শক্তি, রূপ ও ভক্তির সহিত যে বাঙ্গালাদেশে জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালীকে আর বলিয়া দিতে হইবে না। সেই কীর্ত্তনের আদিকালে যখন গৌরহরি হাতে হাতে তালি দিয়া প্রথমে—

"হরি হরয়ে নমঃ নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

এই পদে রাগ যোজনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দুই একটি অন্তরঙ্গ লোক উহার মাদকতায় আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। ক্রমে গৌরের দলে সঙ্গীতবিশারদ দুই একটি লোক আসিয়া জুটিল। কেহ এক জোড়া মন্দিরা আনিয়া ঐ রাগে তাল-যোজনা করিয়া দিল। কেহ শঙ্খ আনিল, কেহ করতাল লইল; ক্রমে মৃদঙ্গও আসিল। এই সকল প্রীতিকর বাদ্যযন্ত্রের সুস্বর-লহরীর দ্বারা বর্দ্ধিত-মাধুরী সংকীর্ত্তনের মধ্যে যখন 'সোণার বরণ' গৌরের নৃত্য আরম্ভ হইল, তখন উহার মাদকতা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল! ক্রমে ক্রমে যখন রাগ-রাগিণী ও তালের বৈচিত্র্য এবং ভক্তদিগের রচিত পদের নব নব ভাবের দ্বারা গৌরের নৃত্য চালিত হইতে লাগিল, তখন উহার আকর্ষণীশক্তি সহস্রগুণ বাড়িয়া গেল! সেই মন্ত্র ও জপের যুগে গৌরের সংকীর্ত্তনের দল যখন প্রথম পথে বাহির হইল, তখন লোকে বিস্ময় ও বিরক্তিসহকারে বলিতে লাগিল, "এরা এ সব কি পাগলামি করিতেছে! কৃষ্ণনাম লইতে হয়, ঘরের কোণে বসিয়া মনে মনে নাম জপ কর, এত উচ্চ চীৎকার কেন?" কিন্তু হায়! এ ভাব কতক্ষণ থাকিল! যাহারা একটু কাণ পাতিয়া শুনিল, চক্ষু মেলিয়া দেখিল, তাহারাই আকৃষ্ট হইল! মন্ত্র-জপ গোপনেই কর্ত্তব্য মনে করিয়া যাহারা কাছে আসিল না, তাহারা রক্ষা পাইল। যে নিকটে আসিল সেই মজিল। পণ্ডিতমণ্ডলী নিম্বফল সদৃশ তিক্ত শাস্ত্ররাশি ঘাঁটিতে লাগিলেন, আর গৌরের ভক্তদল সুধাসদৃশ কৃষ্ণ-প্রেমরস পান করিতে লাগিলেন। দেশের অনেক জগাই-মাধাই উদ্ধার হইয়া গেল। এখন গৌরের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে নানা আবিলতা সঞ্চিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তন উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এখনও সংকীর্ত্তন-প্রভাবে দুই চারিটি জগাই-মাধাই উদ্ধার না হইতেছে, এমন নহে।

আসামে শঙ্করদেবের প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তন মূলতঃ বাঙ্গালাদেশের সংকীর্ত্তন হইতে কিঞ্চিৎ

বিভিন্ন (৩৩)। কিন্তু এদেশে শঙ্করদেবই যে সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে উহাই প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহাতে সংশয় নাই। শঙ্করদেব কীর্ত্তনের কিরূপ অনুরাগী ছিলেন, তদ্রচিত নানা রাগযুক্ত বহুসংখ্যক কীর্ত্তন, বড়গীত নাটক প্রভৃতিই তাহার নিদর্শন। কীর্ত্তনের প্রভাবে আসামে হরিনাম কিরূপ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নিরক্ষর চণ্ডাল পর্য্যন্ত মাছ ধরিয়া নৌকায় আসিতে আসিতে সুস্বরে কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে আসিতেছে শুনিয়া শঙ্করদেব বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছিলেন! আর একদিন পথে যাইতে যাইতে শঙ্করদেব শুনিলেন, দুইটি রাখাল বালক সুললিত স্বরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেছে! শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন! তাঁহার প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তনের মহিমায় চণ্ডাল ও রাখালবালক পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে, ইহা দেখিয়া তিনি প্রেমাশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আর ভাবিতে লাগিলেন :—

কিনো মহাভাগ্য আজি লোকক মিলিল।
বালকো বান্ধব কৃষ্ণ বুলিয়া জানিল ॥

(৩৩) আধুনিক সংকীর্ত্তন ও বড়গীত দেখিয়া চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তন ও শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তনের তুলনা সমীচীন নহে। চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তন বহু পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, অন্য পক্ষে শঙ্কর-মাধব প্রবর্ত্তিত বড়গীত প্রায়শঃ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের মধ্যে শব বাহনকালে "হরি হরয়ে নমঃ নমঃ কৃষ্ণ-যাদবায় নমঃ" ইত্যাদি যে রাগে গীত হয়, তাহা অনেকটা চৈতন্যের সমকালীন সংকীর্ত্তনের অনুরূপ। উহার সহিত আসামের বড়গীতের পার্থক্য অতি সামান্য। আদিকালেই আসামের কীর্ত্তনে "শ্রীখোল" ও উদ্দণ্ড নৃত্য বর্জ্জিত হইয়াছিল। প্রাচীন মহাপুরুষীয় সাহিত্যে দেখা যায়, মৃদঙ্গের উচ্চরোল শুনিয়া দেব দামোদরের গাত্রে জ্বর আসিয়াছিল।

শঙ্করদেব

পঞ্চম প্রবন্ধ

ধুবাহাটা হইতে শঙ্করদেব একেবারে ভক্তদলসহ বড়পেটায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এমন নহে। ক্ষুদ্র নৌকায় সমস্ত দ্রব্যসম্ভার ও পরিজনবর্গকে তুলিয়া দিয়া তাঁহাকে ও অন্যান্য ভক্তদিগকে ভিন্ন ভিন্ন নৌকায় রওয়ানা হইতে হইয়াছিল। পাঁচ সাত ঘর মাত্র ভক্ত তিনি সঙ্গে লইয়াছিলেন। অন্যেরা পশ্চাৎ গিয়াছিলেন। দুইটি নিঃসম্বল ভক্ত কাহারও নৌকায় স্থান না পাইয়া ক্ষুণ্ণমনে বসিয়াছিল। মাধবদেব উহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া স্বীয় নৌকার কিছু দ্রব্য নদীতে ফেলিয়া দিয়া নৌকায় ঐ ভক্ত দুইটির স্থান করিয়াছিলেন। শঙ্করদেবের প্রভাবে বৈষ্ণবদিগের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ প্রীতিবন্ধন হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র ঘটনাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

শঙ্করদেব বর্ত্তমান বড়পেটা অঞ্চলে নৌকা ত্যাগ করিয়া পালন্দী (৩৪) নামক স্থানে রহিলেন। মাধব বরাদি গ্রামে (৩৫) বুঢ়াদলৈর গৃহে কিছুকাল থাকিয়া নিজ বড়পেটাতে বাস করিলেন। দুই তিনবার স্থান ত্যাগ করিয়া শঙ্করদেব "জগৎ পবিত্র পাটবাউসী" সত্রে অধিষ্ঠিত হন। তৎকালে ঐ স্থানের অবস্থা কিরূপ ছিল কণ্ঠভূষণ তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

> বেত বাঁশ তারা বনে ব্যাপি আছে বড়পেটা গ্রাম যুরি।
> কোন খানে ঘর বাড়ী সাজাইবন্ত শঙ্করে চাহন্তে ফুরি॥
> গণক পারাত ঘর সাজাইলন্ত কতোদিন বঞ্চি তাত।
> কুমার পারাত ঘর সাজাইলন্ত মিলিল দুঃখ মনত॥
> তাহার দক্ষিণে ঘর সাজাইলন্ত মনত আতি হরিষে।
> পাটবাউসী সত্র নামত প্রসিদ্ধ সর্ব্বজনে যাক ঘোষে॥

ক্রমে নানা স্থান হইতে ভক্তগণও তথায় আসিতে লাগিলেন।

> রাম রাম গুরু গোসাই দামোদর হরি গুরু বসিলন্ত।
> জয়ন্তি মাধব রতিকান্ত দলৈ রাম রায় আসিলন্ত॥

---

(৩৪) এই স্থান বর্ত্তমান বড়পেটার অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে 'চূণপড়া' ভিটি আছে। সম্প্রতি ঐ ভিটিতে ১৪ হাত দীর্ঘ ১০ হাত প্রস্থ ইটের দেওয়াল আছে। চারি কোণে চারিটি গম্বুজ। পশ্চিমদিকে দ্বারহীন প্রবেশ-পথ। উহার উপরেও দুইটি গম্বুজ। দ্বারের দুই পার্শ্বে কাষ্ঠনির্ম্মিত জয়-বিজয়ের প্রতিমূর্ত্তি। এই ভিটিতে প্রত্যহ রাত্রিতে প্রদীপ দেওয়া হইয়া থাকে।

(৩৫) বর্ত্তমান বড়পেটা সত্র হইতে এই স্থান প্রায় ১ মাইল দূরবর্ত্তী।

হরিদাস বাণিয়া বুঢ়া দৈবজ্ঞ আর মহাকালী রাম।
উদার গোবিন্দ বলভদ্র আরু বসিলন্ত বলরাম ॥
ডম্বুরিয়া গোবিন্দ কণ্ঠ যে ভূষণ গোকুলচাঁদ বসিলন্ত।
চান্দসাই আরু কেরোলা বাঢ়ৈ আসিলা দাস অনন্ত॥
রত্নাকর কালি বিয়াস কলাই ভক্ত সমে রঙ্গ মনে।
শঙ্করর পাশে গৈয়া বসিলন্ত প্রণমিয়া একমনে ॥

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ শঙ্করদেবের পূর্ব্বপরিচিত; অনেকে নূতন দীক্ষিত। পালন্দীতে থাকা কালে ভক্ত নারায়ণ দাস শঙ্করদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাহার বৃত্তান্ত এইরূপ— পালন্দীতে ভাস্কর নামক এক সঙ্গীতবিশারদ সুকণ্ঠ বিপ্র শঙ্করদেবের নিকট আসেন ও তৎকৃত কীর্ত্তন রাগরাগিণী সহ গাহিতে অভ্যাস করেন। ঐ সকল কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তিনি শঙ্করদেবের উপদেশে পরম কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন। শঙ্করদেবের সহিত কিছুকাল কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিয়া তিনি তীর্থভ্রমণ দ্বারা পবিত্র দেহ হইতে মানস করেন এবং শ্রীক্ষেত্র-অভিমুখে যাত্রা করেন।

বরনগর(৩৬) গ্রামে ভবানন্দ নামে এক ধর্ম্মনিষ্ঠ বণিক ছিলেন। তিনি অদ্বৈতাচার্য্য প্রবর্ত্তিত (৩৭) ষোলনাম মন্ত্র গ্রহণের উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় ভাস্করের মুখে শঙ্করদেবের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহা ত্যাগ করিয়া পালন্দীতে আসিয়া শঙ্করদেবের সন্দর্শন লাভ করেন। ইনি শঙ্করদেবের প্রভাবে এরূপ অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দর্শনমাত্র দণ্ডবৎ প্রণিপাত করেন। তাঁহার ঈদৃশ দৈন্য দেখিয়া শঙ্করদেব নারায়ণ স্মরণ করেন, এবং পশ্চাৎ ভবানন্দ শঙ্করদেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার নারায়ণ দাস, এই নামকরণ করেন। ইনি শঙ্করদেবের একজন প্রধান ভক্ত। চরিত্র-প্রভাবে ইনি ব্রহ্ম হরিদাসের সহিত তুলনীয়। বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই উভয়েই প্রহ্লাদের অবতারস্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছেন(৩৮)। ইঁহার যত্নে বহুলোক শঙ্করদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। জয়ন্তীর মাধব, পরমানন্দ, শিমলীয়া-নিবাসী শ্রীরাম, বলরাম, মুকুন্দ, গোপাল ও মাধব এই তিন ভ্রাতা প্রভৃতি অনেকেই ভক্ত নারায়ণ দাস কর্ত্তৃক শঙ্কর সকাশে আনীত হইয়াছিলেন।

(৩৬) এইস্থান এখনও এই নামে পরিচিত।

(৩৭) এখনও বড়পেটা অঞ্চলে স্থানে স্থানে চৈতন্যপন্থীদের সত্র আছে। ইঁহারা বলেন, শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য চারিদিকে চারিপুত্র প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে একজন এতদ্দেশে আসিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কথিত আছে, প্রচারান্তে অদ্বৈত-তনয় স্বীয় বাসগৃহের অভ্যন্তর হইতে অন্তর্দ্ধান করেন। চৈতন্য-পন্থীদের বিশ্বাস, তিনি একস্থানে অন্তর্দ্ধান করিয়া অন্যত্র আত্মপ্রকাশ করেন। এইহেতু তাঁহার তিরোভাব—তিথিতে শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান হয় না। উৎসবমাত্র হইয়া থাকে।

(৩৮) "ভক্ত নারায়ণদাস" প্রবন্ধে ইহার বিশেষ বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধ কলিকাতা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩১৯ সালের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সকল ভক্তদিগের দীক্ষা-গ্রহণের বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে গেলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়ে। পরমানন্দ এক বৃদ্ধার পুত্র। কীর্ত্তনে ইহার অনুরাগ উপস্থিত হইলে পর ভক্ত নারায়ণ দাস ইহাকে তিন কাহন কড়ির ঋণ-দায় হইতে মুক্ত করিয়া সত্রে আনেন।

শিমলীয়ার শ্রীরামের সংসারে আর কেহই ছিল না। ঘরে ঘরে স্বেচ্ছায় কাজ করিয়া ইহার দিনপাত হইত। ইহার দিন বৃথা যাইতেছে দেখিয়া নারায়ণদাস ইহাকে সত্রে আসিতে কহেন। কিন্তু এই ব্যক্তি কহিল, "এক গৃহস্থের ধান কাটিয়া দিতে প্রতিশ্রুত আছি। উহা না করিয়া কোথাও যাইতে পারি না।" ইহার সাধুতার এইরূপ পরিচয় পাইয়া নারায়ণদাস ইহাকে যথাসময়ে সত্রে আনিলেন।

দ্বিজ চক্রপাণি ভক্ত নারায়ণদাসের কুলপুরোহিত ছিলেন। তাঁহার শিশু পুত্র রাম পীড়িত হইলে পর চিকিৎসার জন্য ভক্ত নারায়ণ দাসের গৃহে পত্নী ও শিশুকে রাখিয়া যান। ব্রাহ্মণী ভক্ত নারায়ণ দাসের গৃহে বিস্তর কৃষ্ণকথা শুনেন। শিশু আরোগ্য হইলে পর গৃহে গিয়া তিনি স্বামীকে ভৎ´সনা করিয়া কহিলেন :—

শুদ্রর মুখত আমি কথাক শুনিলো।
আমার ব্রাহ্মণ জন্ম কি সক সাধিলো ॥

চক্রপাণি পত্নীকে ধমকাইয়া বলিলেন—"ভালত কৃষ্ণ ভক্তির কথা বলিতেছ! তোমার পরামর্শে ৬০।৭০ ঘর যজমান ত্যাগ করিলে কি খাইব!" এই বলিয়া তিনি একখানি পত্রে গোটা পঁচিশেক শ্লোক লিখিয়া শঙ্করদেবের সভা জয় করিতে চলিলেন। পথে মাধবদেব পত্রখানি দেখিয়া তাহার নিম্নে আর একটি শ্লোক লিখিয়া দিলেন। ঐ শ্লোকটি পাঠ করিয়া চক্রপাণি "বুঝিলাম" এই বলিয়া পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং ভক্ত নারায়ণদাস ও মাধব দেবের সহিত শঙ্কর-সন্নিধানে উপনীত হইয়া রাম রাম গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। চক্রপাণির ৬০।৭০ ঘর শিষ্যও তাঁহার অনুবর্ত্তন করিল। এই চক্রপাণিই চরিত্র-লেখক কণ্ঠভূষণের পিতামহ।

মাধবদেব ও নারায়ণদাস গণক কুশীতে থাকিতেন। মহাকালীরাম মাধবদেবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। এই ব্যক্তি অতি শুদ্ধমতি বৈষ্ণব ছিলেন। কথিত আছে, একদা মাধবদেবের গৃহাগমনে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার অপেক্ষায় থাকিতে থাকিতে ইনি কৃষ্ণরূপ চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দর্শন দেন। মহাকালীরাম নানা মনোময় দ্রব্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন। সর্ব্বাঙ্গে নানা বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়া একটি পায়ে খড়ম দিয়াছেন, এমন সময় মাধবদেব আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। মহাকালীরাম ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া মাধবদেবকে স্নানীয় দিতে গেলেন। গৃহে কৃষ্ণ-মূর্ত্তি দেখিয়া মাধবদেব প্রেমে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। শ্রীমূর্ত্তির এক পায়ে খড়ম নাই দেখিয়া, মাধবদেবকে এরূপ 'কদর্থনা' করিয়াছে সন্ধান করিয়া সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। অতঃপর মহাকালীরামের সৌভাগ্যের প্রশংসা ভক্ত-সমাজে পরিকীর্ত্তিত হইতে লাগিল

পাটবাউসীতে সত্র স্থাপিত হইলে পর ক্রমে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক গুরুদেবদামোদর ও হরি গুরু তথায় আসিলেন। দলে দলে লোক শঙ্করদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে লাগিল। প্রত্যহ হাজার হাজার লোক সত্রে আসিতেছে যাইতেছে। অহোরাত্র কৃষ্ণ-কথালাপ, ভাগবত-পাঠ ও কীর্ত্তন হইতেছে। দলে দলে লোক শক্তিপূজা ত্যাগ করিয়া 'এক শ্রীকৃষ্ণে শরণ' লইতেছে!

প্রথমে শাক্তগণ শঙ্করদেব ও তাঁহার ভক্তদিগের উদ্দেশ্য নানা বিদ্রূপপূর্ণ কবিতা ও ছড়া রচনা করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। শঙ্করদেবও 'পাষণ্ডমর্দ্দন' নামক কীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন। এই কীর্ত্তনটির ঘোষা বা ধূয়া এই :—

১। কলির ধর্ম্ম হরি নাম জান।
পাপীর নিন্দাত নিদিবা কাণ ॥
২। হরি ও হরি রাম মুরারি।
কীর্ত্তনর নিন্দা সহিতে নারি ॥
৩। ত্রাহি ত্রাহি রাম মোরে।
মই মজিলো সংসার ঘোরে ॥
৪। রাম সে জীবন রাম সে প্রাণ।
রাম বিনা নাহি বান্ধব আন ॥

এই কীর্ত্তনটি ঐতিহাসিক-হিসাবে খুব মূল্যবান। প্রতিপক্ষের পরাজয়ের জন্য শঙ্করদেব প্রধানতঃ যে সকল শাস্ত্র অবলম্বন করিতেন তাহা এই কীর্ত্তনে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদান্তের মর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া এই কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চাৎ একাদশ স্কন্ধ, আগম, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, পদ্মপুরাণ, সূতসংহিতা, চতুর্থ স্কন্ধ, দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় স্কন্ধ, তৃতীয় স্কন্ধ, পঞ্চম স্কন্ধ, ষষ্ঠস্কন্ধ, সপ্তম স্কন্ধ, অষ্টম স্কন্ধ, নবম স্কন্ধ, দশম স্কন্ধ, ক্রমান্বয়ে উল্লিখিত হইয়াছে। এই কীর্ত্তনের একটি উপদেশ এই :—

পুরাণ সূর্য্য মহাভাগবত।
বেদান্তরো ইতো পরম তত্ব ॥
আক সুবুদ্ধি ফুরে নিন্দা করি।
তার মুখ চাই বুলিবা হরি ॥

আর একটি—

বিষ্ণু বৈষ্ণবক করে ধিক্কার।
কাটিবে আটিল জিহ্বাক তার ॥
শাস্তি করিবাক যেবে না পারি।
গুচিবে কর্ণিত অঙ্গুলি গারি ॥

ক্রমে বিপক্ষবাদীরা এই দিকে কিছু করিতে না পারিয়া অন্য উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বে তাঁহারা বিদ্বেষ করিয়া শঙ্করদেবের বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। কারণ শঙ্করদেব তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক শাস্ত্রদর্শী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। আর আহম রাজগণ ব্যক্তিগতভাবে শঙ্করদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বিদ্বেষ্টা ছিলেন না। এবার প্রতিপক্ষগণ অতি অনায়াসে শঙ্করদেব ও তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রতি রাজার বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বালিত করিতে সমর্থ হইলেন। শঙ্করদেবের কঠোরতর পরীক্ষার কাল উপস্থিত হইল।

কোচবংশীয় নৃপতিরা শাক্ত-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। নরনারায়ণ রাজার পিতা বিশ্বসিংহের সময়েই কামাখ্যাদেবীর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত ও তাঁহার পূজা-সেবার ঘটা অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। রাজা নরনারায়ণের নিকট শাক্তেরা যখন জানাইলেন যে, শঙ্করদেব দেবীর পূজা নিষেধ করিয়াছেন তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি শঙ্করদেবকে ধরিয়া আনিতে "গড়মলি" পাঠাইয়া দিলেন এবং আরক্ত-নয়নে বলিলেন :—

চারি গড়মলি যাই আন শঙ্করক।
অনাচার করি নষ্ট করিল রাজ্যক॥
করিব বিচার এহু নিষ্ঠ হই যেবে।
ছাইবো দামা সত্যে শঙ্করের ছালে তেবে॥
নিষ্ঠ করি বোলো মাংস হেঙ্গালে খুয়াইবোঁ।
শঙ্করের হাড়ে নিষ্ঠে অগনি পুয়াইবোঁ॥

দেওয়ান চিলারায় শঙ্করদেবের হিতৈষী ছিলেন।* ইনি বৈষ্ণবদিগের প্রতিও প্রীতি-ভাবাপন্ন ছিলেন। ইঁহারই ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া শঙ্করদেব "সীতাসয়ম্বর নাটক" রচনা করেন। শঙ্করদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামানন্দকে ইনি রাজ-সরকারে একটি কর্ম্মও দিয়াছিলেন। দৈত্যারি ঠাকুর লিখিয়াছেন, স্বয়ং শঙ্করদেব—

কতো দিন ঘরে আছিয়া শঙ্করে বেহারক লাগি লৈ।
আসিলন্ত যাই চিলা রায় ঠাই কারখানার দলৈ হৈ॥

ইহা কিরূপ কারখানা স্পষ্ট বুঝা যায় না। কিন্তু ইহা শঙ্করদেবের অর্থাগমের একটি উপায় ছিল। তিনি পাটবাউসী হইতে প্রত্যহ তাম্বিকুচি স্থিত এই কারখানায় যাইতেন। শঙ্করদেবকে ধরিয়া নিবার জন্য কঠোর রাজাদেশ প্রচার হইবামাত্র শঙ্করদেব পুত্র রামানন্দ ও চিলারায়ের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন এবং রাজ-প্রেরিত গড়মলি আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। তাঁহাকে না পাইয়া গড়মলিরা ভক্তনারায়ণদাস ও গোকুল চাঁদকে ধরিয়া লইয়া গেল। ভক্তদ্বয় হরিনাম করিতে করিতে বন্দীভাবে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। "শঙ্করদেব কোথায়?" পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াও ইঁহারা কিছুই

* ইনি শঙ্করদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী রামরায়ের এক কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বলিতে পারিলেন না। ইহারা সত্য-গোপন করিতেছেন মনে করিয়া রাজা ইহাদের প্রতি উৎপীড়নের আদেশ করিলেন। নয়নানন্দ কোটোয়াল ইহাঁদিগকে লইয়া গেল। চারিজন খাঁড়াধারী লোক ইহাঁদের উপর বহু অত্যাচার করিল কিন্তু কোন ফল হইল না। তখন কোটোয়াল রাজাকে জানাইল ইহারা শঙ্করদেব কোথায় প্রকৃতই জানে না। যে গড়মলি ইহাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছিল সে অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিল :—

যেতিক্ষণে আমি নারায়ণক ধরিলো।
এক অক্ষর দর্প বাণি মু শুনিলো॥
শঙ্করর বার্ত্তা আরু শোধয় আমাত।
পলাইবার শুনি ে, করে অসংখ্যাত॥

ইহাদের সরলতায় এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজার ক্রোধ কিছু প্রশমিত হইল, তিনি ইহাদিগকে শঙ্করদেব ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। (৩৯) ইহারা দুর্গা নাম গ্রহণ করে না, দেবীর পূজা করে না জানিয়া নৃপতি পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া বিস্তর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া ইহাদিগকে দেবী-প্রণাম করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু এই দৃঢ় কৃষ্ণনিষ্ঠ ভক্তদ্বয় নির্ভয়ে ও অসঙ্কোচে রাজার মুখের উপরেই বলিলেন :—

কৃষ্ণত শরণ পশি আবে কেনে
আনক মাথা দঞাইবোঁ।

এই কথায় রাজ-ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি অর্পিত হইল। রাজা ইহাদিগকে প্রহার করিতে গড়মলিকে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ জমাদারেরা ভক্তদ্বয়কে লইয়া গেল। বাঁশের গড়কা লাগাইয়া নিষ্পেষণ করিতে করিতে ভক্ত নারায়ণদাসের একটি হাত ভাঙ্গিয়া গেল।

তভোঁ নাহি দুঃখ সহসিত মুখ
হরি বুলি দেন্ত ডাক।

'অঠার জোড়া কঠা' ভক্তদিগের দেহ নিষ্পেষণ করিতেছে। আর ভক্তদ্বয় কি করিতেছেন? তাঁহারা উন্মত্তবৎ

রামনাম গান্ত কৌতুক করন্ত কতো হো গীত গায়ন্ত।
প্রেম উপজয় গাব শিহরয় কান্দন্ত কতো হাসন্ত॥

---

(৩৯) 'মন্ত্র-চূড়ামণি' নামক এক হস্তলিখিত পুথিতে আছে ভক্তনারায়ণদাস ও উদার গোবিন্দকে রাজ-সভায় ধরিয়া নিয়া গিয়াছিল। ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই (১) শূদ্র হুয়া গুরুনাম লৈছে। (২) ভাগবত পঢ়য় তাহার মূল ভাঙ্গি পদ করিছে। (৩) শূদ্র হুয়া সৎসঙ্গ দিয়য়। (৪) তপ যপ যাগ যজ্ঞ ন করয়। (৫) বেদ আরু গঙ্গা তুলসী না মানে। (৬) ব্রাহ্মণর নির্ম্মাল্য ন লয়য়। (৭) মনুষ্যক ভকত বুলি হরিকো অধিক দেখয়। (৮) প্রতিমা না মানে। (৯) অন্ত্যজাতিকো ভক্তি ও জ্ঞান দিয়য়।

কতো বাগড়ম্ভ উঠিয়া নাচন্ত ফুরন্ত কতো লবড়ে।
অষ্টাদশ জোর কঠা ঝাত করি শোলকি আপুনি পড়ে॥

হায়, মূঢ় ধৰ্ম্মদ্বেষিগণ! ভগবদ্ভক্তের বাহ্য দেহের উপর অত্যাচার করিতে পার, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় প্রহারে বিদ্ধ করিবে কিরূপে? ইহাদের ভক্তিভাব দেখিয়া রাজা ও রাজ-পরিষদেরা বিস্মিত হইলেন। রাজা স্বয়ং আর নিপীড়ন না করিয়া ইহাদিগকে ভুটিয়াদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কারণ তাহা হইলে এই দৈত্যপুরীর প্রহ্লাদ দুটি তাঁহার রাজ্য হইতে একেবারে নিঃসংশয়রূপে বিদূরিত হইবে।

নারায়ণদাস ও গোকুলচাঁদকে সুপুষ্ট ও সুন্দরদেহ দেখিয়া ভুটিয়ারা সানন্দে লইয়া গেল। ভক্তদ্বয় বিপদভঞ্জন হরিনাম স্মরণ করিতে করিতে ভুটিয়াদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ইহাদের জ্বলন্ত ধৰ্ম্মবিশ্বাসের প্রভাব ভুটিয়ারা সহ্য করিতে পারিল না। কথিত আছে পথে নানা দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া ইহাদিগকে 'দেব মানুষ' মনে করিয়া ভুটিয়ারা ফিরাইয়া দিয়া গেল। মধু ও হরি নামক দুইজন প্রহরী ভুটিয়াদের নিকট হইতে ভক্তদ্বয়কে লইয়া রাজাদেশ অপেক্ষায় এক বাজারে রহিল।

ভক্তদ্বয় অহর্নিশি হরিধ্বনি করিতেছেন। বাজারের লোক ইহাদের ভক্তিভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল:—

দুইর দুইত প্রীতি নামত একান্ত মতি
থাকে দুয়ো হরিগুণ গাই।
অনেক দোকানীগণে বেরি আসি সেইখানে
থাকে রঙ্গে দুই হস্তকো চাই॥
কতোক্ষণ চাহি আছি মাথার নামায়া পাচি
যাত যিবা বস্তু আছে আনি।
চাউল ডালি বাঙ্গন মৎস্য খড়ি তৈল লোণ
আগত পেল্লাই দেই আনি।

রাত্রিতে দৈবাৎ নারায়ণ দাসের পদ-শৃঙ্খল খসিয়া পড়িল। নারায়ণ দাস টের পাইয়া হরিকে ডাকিয়া তুলিলেন এবং কহিলেন "আমার পায়ের শৃঙ্খল খসিয়া গিয়াছে, ভাল করিয়া লাগাইয়া দাও।" বন্দীর এইপ্রকার সাধুতা দেখিয়া হরির চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই রাত্রিতেই সে স্বপ্ন দেখিল, ভক্তের উদ্ধারকারী হরি শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মহস্তে আবির্ভূত হইয়া ভক্তদ্বয়কে অভয় দান করিতেছেন। মধুও রাত্রিতে সেইরূপ স্বপ্ন দেখিল। পরদিবস হরি ও মধু নারায়ণ দাসের পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিল এবং

পূৰ্ব্বর স্বভাব সমস্তে এড়িয়া নিশ্চয় করিয়া মন।
গুণ চিন্তামণি পুথি আগে থৈয়া কৃষ্ণত লৈলা শরণ॥

এদিকে শঙ্করদেব রাজভয়ে পরিজনদিগকে স্থানান্তরে রাখিয়া একাকী দেওয়ান চিলারায়ের

নিকট উপস্থিত হইলেন। দেওয়ান কহিলেন "যদি আপনি পণ্ডিতদিগকে নিরস্ত করিতে পারেন, আমি রাজার কোপানল হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিব।"

শঙ্করদেব কহিলেন "পণ্ডিতদিগকে আমার অণুমাত্র ভয় নাই, কিন্তু রাজা অন্যায় করেন বলিয়াই আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি।" দেওয়ান শঙ্করদেবকে আশ্রয় দিয়াছেন এ কথা রাজার কর্ণগোচর হইল। তিনি শঙ্করদেবকে রাজসভায় পাঠাইয়া দিতে দেওয়ানকে অনুরোধ করিলেন।

রাজা নরনারায়ণ প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তাও কম ছিল না। তিনি প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার সভা ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতমণ্ডলীতে পূর্ণ ছিল। শঙ্করদেবের পণ্ডিতজনোচিত সম্ভ্রমব্যঞ্জক শান্ত ও সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনমাত্র তিনি তৎপ্রতি প্রসন্ন হইলেন। স্বয়ং সিংহাসন হইতে নামিয়া চৌরাঘরে আসিয়া বসিলেন এবং আলাপ করিবার জন্য শঙ্করদেবকে তাঁহার সন্নিহিত হইতে আদেশ করিলেন। রাজা যে 'চৌরা ঘরে' বসিলেন তাহার ভিটি তিন হাতেরও অধিক উচ্চ। ঐ ঘরে উঠিবার জন্য সাতটি খটখটি অর্থাৎ ধাপ। শঙ্করদেব এক একটি ধাপ উঠিতে লাগিলেন এবং রাজ মাহাত্ম্য-নির্ণায়ক এক একটি শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্রমে গৃহে উঠিয়া রাজ-সকাশে "মধুদানব দারণ দেববরং" সুললিত তোটকচ্ছন্দে রচিত এই স্তব পাঠ করিলেন। রাজা তাঁহার বিদ্যাবত্তা দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে কম্বল-আসনে উপবেশন করিতে কহিলেন। এইরূপে শঙ্করদেবের সমাদর করিয়া রাজা তাঁহাকে সেই দিনের জন্য বিদায় করিলেন;

পরদিবস পণ্ডিতগণসহ বিচারের জন্য সভা আহূত হইল।

> ব্রাহ্মণ সকলে শ্লোক গোটেক পঢ়ন্ত।
> সরাসরি দশোটায়ো শঙ্করে তোলন্ত ॥

দুঃখের বিষয়, এই সকল বিচারের বিষয়গুলি কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই। বুঢ়াভাষা নামক এক পুথিতে কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে। ঐ পুথি শঙ্করদেবের পৌত্র পুরুষোত্তম ঠাকুরের রচিত বলিয়া বোধ হয়। এই পুথির বিবরণ সম্পূর্ণ কল্পিত। কারণ ইহাতে লিখিত আছে "পুরাণ সংখ্যা কত?" এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতেরা অষ্টাদশ পুরাণ নির্দ্দেশ করিলে পর শঙ্করদেব অষ্টাদশ সহস্র পুরাণ-সংখ্যা স্থির করিয়া কয়েক হাজার নাম আবৃত্তি করিলেন।

শঙ্করদেবের সহিত বিচারে সভাপণ্ডিতেরা পরাজিত হইলেন। রাজা নরনারায়ণ পরম প্রীত হইয়া শঙ্করদেবকে কহিলেন "আমি কতকগুলি শব্দ বলিতেছি এই গুলি একত্র করিয়া অর্থযুক্ত শ্লোক রচনা করিতে হইবে। আমি স্বয়ং এই শব্দগুলি দ্বারা আটটি শ্লোক রচনা করিতে পারি।" শঙ্করদেব একটি একটি করিয়া সাতটি শ্লোক রচনা করিয়া অর্থ ও ব্যাখ্যা করিলেন। রাজা তাহা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং কহিলেন "আমি এই সকল অর্থ নিজেও কল্পনা করি নাই। যাহা হউক, আরও যতপ্রকার হয় আপনি

রচনা করুন।" শঙ্করদেব সানুনয়ে বলিলেন "আমার আর এতাধিক শক্তি নাই। এই পর্য্যন্ত যাহা করিলাম তাহাও আপনার অনুজ্ঞা বলেই করিতে সমর্থ হইয়াছি।" রাজা তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিলেন এবং বুঝিলেন শঙ্করদেব আরও শ্লোক রচনায় সমর্থ হইয়াও শুধু রাজসম্ভ্রম রক্ষার জন্য আর অধিক অগ্রসর হইতেছেন না। তাঁহার এইরূপ ঔদার্য্যে রাজা নরনারায়ণ অধিকতর পরিতুষ্ট হইলেন। সেইদিন হইতে তিনি শঙ্করদেবের গুণের অতিশয় পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

পশ্চিম হইতে এক পণ্ডিত রাজা নরনারায়ণের সভা জয় করিতে আসিলেন। তিনি এক এক দেশ জয় করিয়া তাহার নিদর্শন স্বরূপ হস্তে এক একটি বলয় ধারণ করিতেন। তাঁহাকে প্রভূত তেজসম্পন্ন দেখিয়া রাজা নরনারায়ণ বলিলেন "আমার সভায় বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছেন। তাঁহারা আপনাকে পরাস্ত করিলে আমার বিশেষ পৌরুষ নাই। আমি শূদ্র দ্বারা আপনাকে বিচারে যদি পরাস্ত করিতে পারি তবেই নিজকে প্রকৃত গৌরব-ভাজন মনে করিব।" বিচারের দিন স্থির হইল, পণ্ডিত বাসা করিয়া অপেক্ষায় রহিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ শঙ্করদেবের বিবরণ জ্ঞাত হইয়া তিনি কিরূপ পণ্ডিত দেখিতে আসিলেন। কথায় কথায় তাহারা শঙ্করদেবকে বলিল শূদ্রের ভাগবত পাঠে অধিকার নাই।" শঙ্করদেব এ কথা অস্বীকার করিয়া প্রমাণ দেখাইলেন(৪০) ব্রাহ্মণে ভাগবত পড়িলে ব্রহ্মত্ব লাভ হয়, ক্ষত্রিয়ে পড়িলে রাজ্য সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, বৈশ্যে পড়িলে ধনবৃদ্ধি হয়, আর শূদ্রে পড়িলে সমস্ত পাপ হইতে দ্রুত মুক্ত হয়।" শঙ্করদেব এক শ্লোক আবৃত্তি করিয়া কহিলেন "তবে দ্বিজ-বন্ধুরা বেদ-পাঠ করিতে পারেন না।" তাহারা একথা মানিয়া লইলে শঙ্করদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "দ্বিজবন্ধু কাহাকে বলেন?" উহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা অর্থ বলিল। শঙ্করদেব কহিলেন "এই অর্থও হয় কিন্তু দ্বিজবন্ধু শব্দের আরও অর্থ আছে।" আর কি অর্থ আছে? উহারা জানিতে চাহিলে শঙ্করদেব কহিলেন "তাহা আমি বলিয়া দিব কেন? আপনারা বলুন না পারেন পরাজয়-স্বীকার করুন, আমি অন্য অর্থ বলিয়া দিতেছি।" উহারা গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিব, এই বলিয়া চলিয়া গেল। গুরুদেব দ্বিজবন্ধু শব্দের ফাকিতে পড়িয়া পরদিবস পলায়ন করিলেন। রাজা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া আনন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন।

তৎপরদিবস হইতে শঙ্করদেব প্রত্যহ রাজ-ভবনে যাইতে লাগিলেন। রাজা তাঁহার এরূপ বশীভূত হইয়া পড়িলেন যে, কথিত আছে তিনি শঙ্করদেবের নিকট হইতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষা-গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু শঙ্কর রাজা ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীলোককে দীক্ষা দান করিতে সম্মত হন নাই।

---

(৪০) শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম অধ্যায় তৃতীয় স্কন্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ দ্বাদশ অধ্যায় ৬৫-৬৯ শ্লোক দেখ।

ইহার পর তিনি কখন রাজধানীতে কখন পাটবাউসীতে এবং কিছুকাল তীর্থভ্রমণে যাপন করিয়াছিলেন। রাজানুগ্রহ-লাভের পর তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারে আর বাধা রহিল না। দ্রুতগতিতে হরিনাম-ধ্বনি সমগ্র আসামময় পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। কথিত আছে, হেড়ম্বরাজ দীক্ষা-গ্রহণ-মানসে শঙ্করদেবের নিকট দূত প্রেরণ করিলে মাধবদেব ও নারায়ণ দাস প্রেরিত হন। ইঁহাদের উপদেশে রাজা বলিদানের জন্য রক্ষিত নয়জন বন্দীকে মুক্তিদান করেন। এই হেড়ম্বরাজ কোনও দূরবর্ত্তী কাছাড়ী রাজা হইতে পারেন। ফলতঃ শঙ্করদেবের প্রচার-ফলে আসামে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বহুদূরব্যাপী ও সর্ব্ব বর্ণের মধ্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মাধবদেব স্বরচিত গুরুভটিমাতে লিখিয়াছেন :—

পণ্ডিত মান বেদ বাখানি
গরব কয়লি সব চুর।
গীত কবিত্বগুণ শঙ্করদেবর
কীরিতি গয়ো বহুদূর।

শ্রীউমেশচন্দ্র দে।

কামরূপের ইতিহাসের উপকরণ

(গত ১৪ই কার্ত্তিক শুক্রবার, ১৩২১,

কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতা)

প্রাচ্য-ভারতের অন্যতম সুপ্রাচীন রাজধানী আদ্যাশক্তি-মহামায়ার মহাপীঠের অন্তর্গত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-সভ্যতার লীলাস্থান এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে আসিয়া কতই পূর্ব্ব-স্মৃতি—কতই গৌরব গাথা—কতই দেশের কথা প্রাণে জাগিয়া উঠিতেছে। যতই এই পুণ্যপীঠের কথা ভাবি, যতই ইহার পুরাকাহিনী আলোচনা করি, ততই আমি আত্মহারা হইয়া পড়ি—ততই এই পুণ্যক্ষেত্রের প্রত্যেক তীর্থস্থান, ইহার প্রতি পল্লী, প্রতি বনস্থলী আমার কাণে কাণে যেন কত প্রাণের কথা —যেন কত গৌরবের গাথা শুনাইয়া দেয়। বর্ষাধিক পূর্ব্বে যাহা অলীক স্বপ্ন বলিয়া মনে করিতাম,—সহজে যাহা বিশ্বাস করিতে চাহিতাম না—এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহা বাস্তব-ঘটনা —ধ্রুব সত্য বলিয়া মনে করিতেছি। ইতিহাসানভিজ্ঞ বিদেশীর রচনা পড়িয়া কিছুকাল পূর্ব্বে কতই ভ্রান্ত ছিলাম—সেই অলীক রচনায় আস্থা স্থাপন করিয়া সুসভ্য আসামবাসীর নিকট আমি কতই অপ্রিয়-ভাজন হইয়াছিলাম। সুখের বিষয়, অল্পদিন মধ্যে সেই ভ্রম ধরা পড়িল। আমার পরম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় সেই ভ্রম সংশোধনে সহায় হইয়া আমার চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হইলেন; সেই সঙ্গে আসামের পুরাতত্ত্ব, আসামের সভ্যতার ইতিহাস, আসামের পুণ্যকীর্ত্তি-কথা আলোচনা করিবার আগ্রহ আসিল। আমি আসাম ও আসামবাসীকে কিরূপ ভক্তির চক্ষে পবিত্রভাবে দেখিয়া থাকি, বিশ্বকোষে "কামরূপ" ও "প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর" শব্দে তাহার কিছু কিছু ব্যক্ত হইয়াছে। বহুদিন হইতেই আমার আসাম দেখিবার সাধ—আসামবাসীর সহিত মিশিবার সাধ—আসামের পুরাতত্ত্ব-আলোচনা করিবার সাধ ছিল, কিন্তু বিশ্বকোষ-প্রকাশরূপ গুরুতর কার্য্যে লিপ্ত থাকায় এতদিন মনের বাসনা মনেই চাপা ছিল। আজ দুই বৎসরের অধিক হইল, বিশ্বকোষ শেষ হইয়াছে—সেই সঙ্গে আমারও নানা স্থানে ঘুরিয়া আমার চিরদিনের অভিলাষ প্রত্নতত্ত্ব ও সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ-সংগ্রহের সুবিধা উপস্থিত হইয়াছে।

পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই আমি "বঙ্গের জাতীয়-ইতিহাস" নামে বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস প্রকাশে ব্রতী হইয়াছি, অবশ্য বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, বিশ্বকোষ-কার্য্যে জড়িত থাকায় এই মহাকার্য্যে আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারি নাই, এই কয়বর্ষমধ্যে মাত্র চারিখণ্ড জাতীয় ইতিহাস প্রকাশে সমর্থ হইয়াছি। পূর্ব্বেই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের বিস্তৃত ইতিহাস দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয়, তৎপরে বিশ্বকোষ-সমাপ্তির পর এই দুইবর্ষ মধ্যে বৈশ্যকাণ্ড ও রাজন্যকাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এখন আশা হইয়াছে, ঈশ্বর না করুন, যদি কোন বাধা-

বিপত্তি না ঘটে, তাহা হইলে প্রতিবর্ষে এক এক খণ্ড জাতীয় ইতিহাস প্রকাশে সমর্থ হইতে পারিব।

বিংশতি বর্ষের অনুসন্ধানের ফলে আমি অন্যূন তিনশত প্রাচীন কুলগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি, তৎপাঠে আমার ধারণা হইয়াছে যে, আমাদের প্রাচ্য-ভারতের আর্য্যবংশধর চিরদিন সামাজিক বা জাতীয় ইতিহাসের আবশ্যকতা অবগত ছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব জাতীয় বংশ-মর্য্যাদা বা কুল-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বরাবর স্ব স্ব কুলকাহিনী বা জাতীয় সামাজিক কুলেতিহাস রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, আরও জানিতে পারিয়াছি, বংশক্রম বা কুলেতিহাস রক্ষা করা আর্য্যজাতির বিশেষত্ব। আরও বিশেষভাবে বুঝিয়াছি যে, বঙ্গের প্রাচীন সামাজিক ও জাতীয় ইতিহাসের সহিত মিথিলা, আসাম ও উড়িষ্যার প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। আমাদের বঙ্গের এবং মিথিলার কুলপঞ্জীসমূহ হইতে পাইয়াছি—এক সময়ে মিথিলা, গৌড়, কামরূপ ও উৎকলবাসী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ পরস্পর নানা সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন—কত মৈথিল-সন্তান গৌড় বা কামরূপবাসী হইয়া আসামী বা বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, আবার কত কামরূপের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-সন্তান বঙ্গবাসী হইয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন। এইরূপ কত গৌড় বা উৎকলবাসী কামরূপের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছেন। স্থূলদৃষ্টিতে সাধারণ-ভাবে এই সকল পরিচয় নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়, রীতিমত অনুসন্ধান—রীতিমত গবেষণা, সমগ্র উচ্চ হিন্দু-সমাজের সহানুভূতির প্রয়োজন।

বঙ্গের বিপুল কুলগ্রন্থ ও প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, যদি আমাদের এই বিশাল হিন্দু-সমাজের একখানি প্রকৃত দেশের ও দশের ইতিহাস আমরা দেখিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের প্রাচ্য-ভারতের প্রাচীন আর্য্য-সভ্যতার লীলাস্থলী মিথিলা ও প্রাগ্‌জ্যোতিষের পুরাতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব ও ইতিবৃত্তের সহিত গৌড়-বঙ্গ ও উৎকলের প্রত্নতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও জাতীয় ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে। তাই কএক বর্ষ হইতে আমি বাঙ্গালার পুরাতত্ত্বের সহিত উৎকলের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধেও বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া আসিতেছি। সাধু যাহার উদ্দেশ্য ভগবান্ তাহার সহায়। তাই উৎকলের প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় যখন ব্যাপৃত হইলাম, তখন ভগবান্ উৎকলের গড়জাতসমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রাজা বলিয়া সম্মানিত ময়ূরভঞ্জের মহারাজ-বাহাদুরকে জুটাইয়া দিলেন। সেই প্রাতঃস্মরণীয় সামন্ত-মহারাজের উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে ময়ূরভঞ্জের প্রত্নতত্ত্ব-উদ্ধারকল্পে উৎকলের ইতিবৃত্ত-সংগ্রহে সুবিধা হইল। ময়ূরভঞ্জ ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রাচীন স্থান-পরিদর্শন ও তত্রত্য নানা প্রাচীন পুথির সাহায্যে যে তত্ত্ব উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা Archæological Survey Reports of Mayurabhanja বা "ময়ূরভঞ্জের প্রত্নতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে কতকাংশ প্রকাশ করিয়াছি। মহারাজ ময়ূরভঞ্জাধিপের শোচনীয় পরিণাম আপনারা অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমার একটি উদ্দেশ্য সাধনে বাধা পড়িল। কিন্তু আমি হতাশ হইলাম না।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

মহামায়া সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় এই কামরূপের পুরাতত্ত্ব ও সামাজিক ইতিহাস আলোচনার সুযোগ উপস্থিত হইল।

মাননীয় গৌরীপুর-রাজ প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর স্বেচ্ছায় আমায় আহ্বান করিয়া আসামের সামাজিক-ইতিহাসের কতকাংশ উদ্ধারের ভার এই দীন-হীনের উপর অর্পণ করিলেন। আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে, মাননীয় রাজা-বাহাদুর এই সামাজিক ইতিহাস প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন এবং সেই গ্রন্থ "কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির" নামে প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। সংবৎসরকাল কামরূপ-অনুসন্ধান সমিতির পক্ষ হইতে গৌরীপুরের রাজা বাহাদুরের উৎসাহে আসামের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া নানা লোকের সাহায্য লইয়া এখানকার পুরাবৃত্ত ও সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধান করিতেছি। অনুসন্ধানের সহিত আমার দিন দিন উৎসাহবৃদ্ধি হইতেছে। যদিও দেখিতেছি—আসামবাসী বর্ত্তমান জনসাধারণের স্ব স্ব জাতীয় ও সামাজিক ইতিহাস-রক্ষার প্রতি তাদৃশ যত্ন নাই, কিন্তু অতি পূর্ব্বকাল হইতে অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আসামবাসী ইতিহাস-রক্ষার উপযোগিতা বিলক্ষণ বুঝিতেন। এক দিন এই আসামের প্রতি বিভাগের, প্রত্যেক রাজবংশের, প্রত্যেক সামন্ত-বংশের, প্রত্যেক সম্ভ্রান্তবংশের জাতীয়-ইতিহাস ছিল, আসামে যে শত শত সত্র রহিয়াছে, সেই সকল সত্রাধিকারীর ধারাবাহিক ইতিহাস ছিল, কত শত বৈদেশিক-আক্রমণে, কত শত ধর্ম্ম-বিপ্লবে, তাহার উপর জলপ্লাবন, গৃহদাহ প্রভৃতি কত শত নৈসর্গিক অত্যাচারে সেই সকল অমূল্য ইতিহাস অধিকাংশ নষ্ট হইলেও এখনও যাহা আছে, তাহা যৎসামান্য নহে। আসামের নানা সত্রে, নানা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে, ও অবস্থাহীন নানা কুলীন পরিবারের গৃহে এখনও বহু চরিত্র-গাথা, বহু রাজবংশাবলি, বহু সামন্তবংশ ও বহু সম্ভ্রান্তবংশীয় কুলীন পরিবারের পুরুষনামা ও বহু বুরুঞ্জীর সন্ধান পাইতেছি। আমার পরম-সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় আসাম-গবর্মেণ্টের উৎসাহে ছয় মাসের অনুসন্ধান-ফলে তাহার কিয়দংশমাত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারই নিকট শুনিতেছি—এখনও আসামের নানা স্থানে ঐরূপ সহস্র সহস্র পুথি রক্ষিত আছে বা অযত্নে নষ্ট হইতেছে। আমারও ক্ষুদ্র চেষ্টায় ইহার অল্প কিছু সংগ্রহ করিতে পারিতেছি।

আমি এখানে আপনাদের নিকট তাহার কিছু নমুনা দিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মিথিলা, গৌড়-বঙ্গ, আসাম, ও উৎকলের সামাজিক ইতিহাস একত্র আলোচিত না হইলে আমরা প্রাচ্য-ভারতের পূর্ণ বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জাতীয় বা সামাজিক ইতিহাস উদ্ধার করিতে পারিব না, এখানে তাহারও কএকটি উদাহরণ দিতেছি।

আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রত্ন-তত্ত্বের কিছু কিছু আলোচনা করেন, তাঁহারা জানেন যে, জলপাইগুড়ির নিকট হইতে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের এবং এই কামরূপ হইতে বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

"বভূব রাঢ়াধিপ-লব্ধজন্মা তিগ্মাংশুচণ্ডো নৃপবংশকেতুঃ।
শ্রীধূর্ত্তঘোষো নিশিতাসিধারো নির্ব্বাপিতারিব্রজগর্ব্বলেশঃ ॥১
আসীত্ততোপি সমরব্যবসায়সার বিস্ফূর্জ্জিতাসিকুলিশক্ষতবৈরিবর্গঃ।
শ্রীবালঘোষ ইতি ঘোষকুলাব্জজাতো মার্ত্তণ্ডমণ্ডলমিব প্রথিতঃ পৃথিব্যাং ॥২
তস্যাভবদ্ধবলঘোষ ইতি প্রচণ্ডদণ্ডঃ সুতো জগতি গীতমহাপ্রতাপঃ।
যেনেহ যোধতিমিরৈকদিবাকরেণ বজ্রায়িতং প্রবল বৈরিকুলাচলেষুঃ ॥৩
ভবানীষা পরা মূর্ত্ত্যা সীতেব চ পতিব্রতা।
সদ্ভাবা নাম তস্যাভূদ্‌ভার্য্যা পদ্মেব শার্ঙ্গিণঃ ॥৪
তস্যা ঈশ্বরঘোষ এষ তনয়ঃ সপ্তাংশুধামা জয়-
ত্যেকো দুর্দ্ধরসাহসঃ কিমপরং কান্ত্যা জিতেন্দ্রদ্যুতিঃ ॥"

অর্থাৎ রাঢ়াধিপ হইতে যিনি জন্মলাভ করিয়াছেন, তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রচণ্ড প্রতাপশালী ছিলেন বলিয়া নৃপবংশকেতু হইয়াছিলেন। সেই ধূর্ত্তঘোষের সুশাণিত অসি-ধারায় শত্রুকুলের গর্ব্বলেশ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। তাহা হইতে রণনীতিকুশলতায় দক্ষ, বিস্ফূর্জ্জিত তরবারিরূপ বজ্রাঘাতে বৈরিবর্গ-নিধনকারী, শ্রীবালঘোষ ঘোষকুল-কমলে জন্মগ্রহণ করিয়া মার্ত্তণ্ড-মণ্ডল-স্বরূপ প্রথিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ধবলঘোষ নামে এক পুত্র জন্মে, তাঁহার শাসনদণ্ড প্রচণ্ড ছিল বলিয়া জগতে তাঁহার মহাপ্রতাপ গীত হইয়াছিল। ইহলোকে যোদ্ধৃবর্গরূপ রণতিমির-নাশে সূর্য্যতুল্য এবং বৈরিকুলাচলের পক্ষে বজ্রতুল্য যাহার কার্য্য ঘোষিত হইত, তাঁহার ভবানীর অভিন্নামূর্ত্তি, সীতার ন্যায় পতিব্রতা এবং বিষ্ণুর লক্ষ্মীর ন্যায় সদ্ভাবানাম্নী এক ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহার পুত্র ঈশ্বরঘোষ সপ্তাংশুর আলয় অর্থাৎ অগ্নির ন্যায় জয়শীল ছিলেন।

উদ্ধৃত তাম্রশাসনের প্রমাণে আমরা বেশ বুঝিতেছি যে, রাঢ়দেশে এক সময় ঘোষবংশ রাজত্ব করিতেন, সেই ঘোষবংশে বালঘোষের জন্ম, এই বালঘোষই নিজ তেজোবীর্য্য-প্রভাবে এ দেশে আধিপত্য-লাভ করেন। রাঢ়দেশে ঘোষবংশ যে মহাসামন্তরাজরূপে আধিপত্য করিতেন, তাহা উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা হইতে বাহির হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে—

"তদ্বংশজঃ সোমঘোষঃ শ্রীকর্ণস্য কুলানুগঃ।
পুত্রস্তে অরবিন্দাখ্যঃ পৌত্রাণাং দ্বয়মেব চ ॥
আদিত্যশূরনৃবরৈঃ দত্তাস্তে বাসমুত্তমম্।
জয়জানঃ গ্রামনামো বাসার্থেন দদৌ নৃপঃ ॥
ততশ্চতুর্দিক্ষু গ্রামং সপ্তবিংশ শতানি চ।
সামন্তরাজরূপেণ একচক্রাবধিং দদৌ ॥"

উক্ত প্রমাণ হইতে বলা যাইতে পারে, উত্তররাঢ়ীয় ঘোষবংশের বীজপুরুষ সোমঘোষ মহারাজ আদিত্যশূরের নিকট মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জয়জান হইতে বর্দ্ধমান জেলার

অন্তর্গত একচাকা পর্য্যন্ত ২৭০০ খানি গ্রাম লাভ করেন এবং এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের সামন্তরাজ-রূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

উক্ত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলগ্রন্থে "বেদোত্তরাষ্টশতাব্দে শাকে কুম্ভস্থভাস্করে" অর্থাৎ ৮০৪ শকে ফাল্গুনমাসে মহারাজ আদিত্যশূরের সভায় সোমঘোষের আগমন-সংবাদ লিখিত হইয়াছে। এ অবস্থায় আমরা পাইতেছি যে, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে রাঢ়দেশে ঘোষরাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং এই ঘোষরাজবংশীয় বালঘোষই প্রথম কামরূপ-অঞ্চলে আগমন করেন। এই বালঘোষের পুত্র ধবলঘোষ রাঢ়ের ধর্ম্মমঙ্গলসমূহে কাঙুর বা কামরূপ-অঞ্চলের বিদ্রোহী নৃপতি ধবল বা ধলরায় নামে অভিহিত হইয়াছেন। ধর্ম্মমঙ্গলসমূহ হইতে জানিতে পারি যে, কাঙুরের বিদ্রোহী ধলরায়কে শাসন করিবার জন্য গৌড়েশ্বর লাউসেনকে এখানে পাঠাইয়াছিলেন। লাউসেনের হস্তে পরাজিত হইয়া ধলরায় গৌড়েশ্বরের আনুগত্য-স্বীকার করেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে গৌড়াধিপ ১ম মহীপালের সময় লাউসেনের অভ্যুদয়। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের তাম্র-শাসনের লিপি-কালও ঐ সময়ের বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য ধলরায় বা ধবলঘোষ গৌড়েশ্বর ১ম মহীপালের অধীনতা-স্বীকারের সঙ্গে মহামাণ্ডলিক বা প্রধান সামন্তরাজ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তৎপুত্র ঈশ্বরঘোষও তাই মহামাণ্ডলিক উপাধিতেই পরিচিত হইয়াছিলেন। আসামের শিরোমণি ভূঞা শব্দ ও মহামাণ্ডলিক শব্দ একার্থবাচী। ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন হইতে আরও জানা যায় যে, তিনি জটোদায় স্নান করিয়া ঢেক্করী হইতে উক্ত তাম্রফলক নিব্বোকশর্ম্মাকে দান করিয়াছিলেন। পুণ্যতোয়া জটোদা এক্ষণে গোয়ালপাড়া সহরের উত্তরপূর্ব্বে "জইয়া" নামে প্রবাহিত হইতেছে। কামরূপ ও গোয়ালপাড়ার অধিবাসী অদ্যাপি উপর-আসামের অধিবাসীর নিকট "ঢেকরী" নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। ঢেকরী শব্দ তাঁহারা যে ভাবেই ব্যবহার করুন, এই নামটি নিতান্ত আধুনিক নয়; তাহা ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, লাউসেনের পিতা কর্ণসেন যে সেনভূমে রাজত্ব করিতেন, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ অতিপূর্ব্বকাল হইতে ঢেকর বা ঢেকুর নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবতঃ রাঢ়ীয় ঘোষবংশ সেই ঢেক্কর হইতে এ অঞ্চলে আসিয়া জন্মভূমির নামানুসারে নিজ রাজধানীরও ঢেক্করী নামকরণ করেন। এই ঢেক্করী রাজধানী ক্রমে গোয়ালপাড়া হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত ঢেকরী বা ঢেকৃরী নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই ঢেকরীর ভাষাসম্বন্ধে ভাষাতত্ত্ববিদ্ সর্ জর্জ্জ গ্রীয়ার্সন সাহেব তাঁহার Linguistic Survey of India (Vol V. pt. I. p. 414) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"The pronunciation of the vowels appears to approach more nearly to that of Bengali than does standard Assamese."

অর্থাৎ ঢেকরীভাষার স্বরোচ্চারণপ্রণালী প্রচলিত আসামী-ভাষা অপেক্ষা বঙ্গভাষার অতি নিকটবর্ত্তী। ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন ও বর্ত্তমান ঢেকরী-ভাষার স্বরোচ্চারণ-প্রণালী

হইতে বলা যাইতে পারে যে, অতি পূর্ব্বকাল হইতেই কামরূপে রাঢ়বাসীর সংস্রব হইয়াছিল। এখনও তাই আসামের ভূঞাগণের আদিপরিচয়-প্রসঙ্গে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, গৌড় হইতেই ভূঞাগণ এদেশবাসী হইয়াছিলেন। তবে এখানকার কোন কোন আধুনিক চরিত্র-গ্রন্থে লিখিত আছে, কমতেশ্বর দুর্লভনারায়ণের সময়ই খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দে এদেশে গৌড় হইতে বারভূঞার শুভাগমন হইয়াছিল। মহাপুরুষ শঙ্করদেব এই বারভূঞার অন্যতম চণ্ডীবরের অধস্তন বংশধর। আসামের আধুনিক ইতিহাসে বা বুরুঞ্জীতে চণ্ডীবরই প্রথম শিরোমণি ভূঞা নামে পরিচিত। কিন্তু এক্ষণে ঢেক্করীর মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দী হইতেই এখানে মহামাণ্ডলিক বা শিরোমণি-ভূঞাবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এখানে নানা সময়ে বিভিন্ন ভূঞাবংশের অভ্যুদয় হওয়ায় আসামের বিভিন্ন-চরিত্র ও বুরুঞ্জীগ্রন্থে বারভূঞার চরিত্র ও অভ্যুদয় বিভিন্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক বিভিন্ন চরিত্র-গ্রন্থে মতভেদ থাকিলেও তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। নানা সময়ের তাম্রশাসন, শিলা-লিপি ও বংশ-পরিচয় আলোচনা দ্বারা তাহার সত্যতা অবধারণ করিতে হইবে।

ঈশ্বর-ঘোষের কিছুকাল পরে আমরা কামরূপপতি বৈদ্যদেবের সন্ধান পাই। এই বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি তাঁহার ৪র্থ রাজ্যাঙ্কে প্রাগ্‌জ্যোতিষ-ভুক্তির অন্তর্গত কামরূপমণ্ডলে বাড়াবিষয়ে সন্তিবড়া ও মন্দরা নামক গ্রামের কতকাংশ বারেন্দ্রবাসী কৌশিকগোত্র শ্রুতি-স্মৃতি-তত্ত্ববিদ্ শ্রীধর নামক ব্রাহ্মণকে দান করেন। সুতরাং এই দানপত্র হইতে বলা যাইতে পারে, বৈদ্যদেব প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি হইয়াছিলেন। উক্ত তাম্রশাসনে বৈদ্যদেবের বংশ-পরিচয় আছে, তাহা হইতে জানিতে পারি, বৈদ্যদেবের পিতামহ যোগদেব ও গৌড়েশ্বর ৩য় বিগ্রহপালের প্রধান মন্ত্রী ও দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিলেন। যোগদেবের পুত্র বৈদ্যদেবের পিতা বোধিদেবও গৌড়েশ্বর রামপালের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী ছিলেন। স্বয়ং বৈদ্যদেবও রামপালের পুত্র কুমারপালের প্রধান অমাত্য ও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়বন্ধু ছিলেন। কামরূপপতি তিগ্মদেব গৌড়েশ্বরকে উপেক্ষা করিয়া বিদ্রোহী হইলে বৈদ্যদেব তাঁহাকে পরাজিত করিয়া এখানকার আধিপত্য-লাভ করেন। এই তাম্রশাসনে বৈদ্যদেবের কনিষ্ঠভ্রাতা বুধদেব দানে কল্পতরুসদৃশ ও মহাধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে স্পষ্টই আছে যে, তিনি কনিষ্ঠভ্রাতা বুধদেবের পরামর্শেই বারেন্দ্র শ্রীধরকে কামরূপে গ্রাম দান করিয়া এখানে বাস করাইয়াছিলেন। এদিকে বারেন্দ্র-কায়স্থগণের তিন শতবর্ষ পূর্ব্বে রচিত কাশীদাসের আদি ঢাকুরগ্রন্থে বৈদ্যদেবের এইরূপ পূর্ব্ব-পরিচয় পাইয়াছি,—

"দেববংশ মহাবংশ কাণসোণায় অবতংস
খ্যাতি ভাতি সর্ব্বলোকে কয়।
কতই রাজা মন্ত্রী পাত্র কতবা কুল সুপবিত্র
সপ্তগোত্র গৌড়ে প্রচরয়॥

মৌদ্গল্য শাণ্ডিল্যরাজ পরাশর ভরদ্বাজ
বাৎস্য ঘৃতকৌশিক আলম্যান।
কি কব কুলের কীর্ত্তি যাবচ্চন্দ্র বসুমতী
করণে শ্রীকরণ অভিধান॥
রাঢ়ী মধ্যে সবে গণ্য আলমান বারেন্দ্র ধন্য
রাজসভায় বহুত সম্মান।
রাজার দক্ষিণ হস্ত জ্ঞানে গুণে সুপ্রশস্ত
দাতা ভোক্তা গৌড়ে গরীয়ান্॥
শিখিধ্বজ অগ্রগণ্য সর্ব্বত্র অশেষ মান্য
শ্রীকেশব তান বংশধর।
অঙ্গে বঙ্গে তার সূত্র ধরেছিল কুলছত্র
কিবা কব মহিমা অপার॥
পূর্ব্ববাস ছাড়ি অঙ্গে একদেব আইলা বঙ্গে
তাহার বংশে যোগদেব নাম।
বিদ্যাবুদ্ধে বৃহস্পতি মহামন্ত্রী মহামতি
রাজবশ সর্ব্বত্র সুনাম॥
তাহার নন্দন চারি সবে অস্ত্র-শাস্ত্রধারী
বোধি, জ্ঞান, মধু, শ্রীধর।
বোধিদেব জ্যেষ্ঠপুত্র সেই হইল মহাপাত্র
পিতৃনাম করিলা উজ্জ্বল॥
জ্ঞানের সুজ্ঞান কথা আছে রাষ্ট্র যথাতথা
মধুকর দেব কুলহর।
শ্রীধর স্বভাবে খাটো কুলে শীলে বড় আঁটো
ধন দৌলত করিল বিস্তর॥
বোধির সন্তান তিন কেহ আঁট কেহ হীন
বুধ বৈদ্য শ্রীকুল সুধীর।
জ্যেষ্ঠ বৈদ্য নৃপমান্য কাণ্ডুরে হইল ধন্য
স্থানত্যাগে খাট হইল বীর॥
বুধদেবের এক ধারা সমাজে রহিল তারা
আর ধারা উত্তরে মিশিল।
কুলদেব কুলশ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ মাঝেতে-জ্যেষ্ঠ
কুলসভায় পূজিত হইল॥

উদ্ধৃত কুল-পরিচয় হইতে বেশ বুঝিতেছি, বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজে বৈদ্যদেবের জন্ম। কামরূপে আধিপত্যলাভের সহিত এখানেই তাঁহার বংশধরগণ বাস করেন। তাঁহার ভ্রাতৃ-বংশ অদ্যাপি বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজে বিদ্যমান ও বিশেষ সম্মানিত। এই বংশ কাণসোণার দেব বলিয়া পরিচিত। ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যদেব কামরূপে উক্ত শাসনপত্র দান করেন, তাহারও বহু পূর্ব্ব হইতে কাণসোণার সহিত কামরূপের সম্বন্ধ। আমাদের পরম-সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অল্পদিন হইল, ভগদত্তবংশীয় প্রাগ্‌জ্যোতিষ পতি সুপ্রসিদ্ধ ভাস্করবর্ম্মার যে তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন তাহা হইতেই আমরা পাইয়াছি যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কিছুদিনের জন্য রাঢ়ের কর্ণসুবর্ণে বা কাণসোণায় মহারাজ ভাস্করবর্ম্মা আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে, সেই সময় হইতেই রাঢ়ের সহিত কামরূপের ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ আরম্ভ হইয়াছিল।

বারেন্দ্র কায়স্থবংশীয় রাজা বৈদ্যদেবকেও আমরা পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরঘোষের ন্যায় গৌড়েশ্বরের একজন মহামাণ্ডলিক বলিয়াই মনে করি। তবে মহামাণ্ডলিক নাম শুনিয়া তাঁহাকে কেহ এক জন সামান্য ভূস্বামী বলিয়া মনে করিবেন না। "মণ্ডল" শব্দের আভিধানিক অর্থ "দ্বাদশ-রাজক", "ন্যায়মণ্ডলে দ্বাদশরাজকে চ" ইতি বিশ্বপ্রকাশ। অর্থাৎ দ্বাদশটি সামন্তরাজ বা বারভূঞার উপর যিনি কর্ত্তৃত্ব করেন, তিনিই মণ্ডল বা মাণ্ডলিক। মাণ্ডলিকের উপর যিনি কর্ত্তৃত্ব করিতেন তিনিই মহামাণ্ডলিক। তাঁহার অধিকার সাধারণ রাজপদবাচ্য ব্যক্তির অধিকার অপেক্ষা শতগুণ অধিক ছিল—

"যো রাজা তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্ম [illegible]

সুতরাং ঈশ্বরঘোষ বা বৈদ্যদেব সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। কামরূপের মধ্যে [illegible]নে বৈদ্যদেবের রাজধানী ছিল, সেই স্থান অদ্যাপি বৈদ্যগড় বা বৈদ্যের গড় না[illegible] হইতেছে। সম্ভবতঃ মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষ ও বৈদ্যদেবের বংশই আসাম-অঞ্চলে শিরোমণি ভূঞা নামে প্রথম পরিচিত হন। আসামের বুরুঞ্জীসমূহে যে অরিমত বা আরিমত্ত রাজার উল্লেখ আছে, তিনিই সেই প্রাচীন মাণ্ডলিক বা ভূঞাবংশের হস্ত হইতে প্রাগ্‌-জ্যোতিষ অধিকার করিয়া উক্ত বৈদ্যগড়ে কিছুদিন আধিপত্য করিয়াছিলেন। এই নৃপতি সম্বন্ধে অসমীয়া-রাজবংশাবলী নামক প্রাচীন পুথিতে এইরূপ লিখিত আছে—

"লৌহিত্যর বীর্য্যে জাত ভৈলা আরিমত। রাজা হুই পাট করিলন্ত বেহারত॥
তৈর পরা আসি রামচন্দ্রক সংহরি। কামরূপ থানে রৈলা মাটিগড় করি॥১২
জেঠাইত আরিমত্তে বান্ধিলা নগরী। বৈদ্যগড় বুলি তাকে কহে নরনারী॥"

কোন কোন আধুনিক বুরুঞ্জীকার লিখিয়াছেন যে, এই রাজার মুখ অনেকটা আরিমাছের মত হইয়াছিল বলিয়া, ইনি আরিমত বা আরিমত্ত নামে পরিচিত হইয়াছেন। বাস্তবিক ইহার প্রকৃত নাম রায়-অরিদেব বা রায়ারিদেব, তাহা সম-সাময়িক তাম্রশাসন হইতে পাওয়া গিয়াছে। রায়ারিদেবের তাম্রশাসনে তৎকর্ত্তৃক গৌড়াধিপ পরাজয়ের প্রসঙ্গ আছে।

পূর্ব্বতন মাণ্ডলিক বা ভূঞাগণ গৌড়াধিপের অধীনতা স্বীকার করিতেন, কিন্তু রায়ারিদেবের হস্তে তাঁহাদের পরাজয়ের সহিত গৌড়ের সহিত কামরূপের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। কিছু-দিন পরে আবার ভুঁঞাগণ প্রবল হইয়া, রায়ারিদেব বা আরিমত্তকে অথবা তাঁহার বংশধরকে পরাজয় করিলেন। প্রতাপনগরে রাজধানী হইল। সেই সময় হইতে বৈদ্যগড় পরিত্যক্ত হইয়াছে। বলিতে কি, এই সময় হইতে কোচবিহারাধিপ বিশ্বসিংহের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত কামরূপে ভূঞারাজগণের আধিপত্য চলিয়াছিল, যেরূপ শিববংশী ও ইন্দ্রবংশী-রাজগণের ইতিহাস ধারাবাহিকরূপে পাওয়া যাইতেছে, দুঃখের বিষয় ভুঁঞারাজগণের সেরূপ ধারাবাহিক ইতিহাস এখনও বাহির হয় নাই। বিশ্বসিংহের অভ্যুদয়ের সময় ভুঁঞারাজগণের কিরূপ প্রতাপ ও প্রতিপত্তি ছিল, অসমীয়া-ভাষায় রচিত নারায়ণগমটার পরিচয়-গ্রন্থ হইতে তাহার বিস্তৃত পরিচয় পাইয়াছি—

"কামরূপী কায়স্থগণর অগ্রগণি। বিসয়া সবর মধ্যে জাহাক বাখানি ॥
তান বংশাবলি শুনিয়োক পাতি কাণ। পূর্ব্বত আচিল নামে গমঠা নারাণ ॥৫॥
কামরূপী ভয়ে কম্পে প্রতাপ জাহার। আচিলেক বারভুঁঞা জার অধিকার ॥৬
ধনে জনে ধান্তে তাক কেহ সম নুই। ইত্যাদি
বিশ্বসিংহ নামে রাজা বেহারত খ্যাত। দেববংশ উৎপত্তি শিবর সংজাত ॥৭॥
বিদুরর সম বুদ্ধি মন্ত্রণা জতেক। যুদ্ধে বিশারদ যেন কার্ত্তিক প্রত্যেক ॥
ভাটিরাজ্য বশ্য করিলন্ত যুদ্ধ কড়ি। কামরূপী কর সাধিবেক মন কড়ি ॥৮॥
অতি আরম্বরে আসিলন্ত মহারাজ। শুনি বারভুঁঞা আসি পাতিলা সমাজ ॥
রঙ্গালিয়া গন্ধর্ব্ব ভুঁঞাক আদি করি। বারভুঁঞা বাউনীর আসিলা বেগ ধরি ॥৯॥
ক্ষেত্রর রাজেন্দ্র ভুঁঞা জগতে বিশেষ। আন পরগণার ভূঞা আসিল নিঃশেষ ॥
নারাণগমঠা সমস্তর অধিকার। সবে আসি বসি মেল করিলেক সার ॥১০॥
সমস্ত ভূঞাক চাই নারাণ বদতি। বিশ্বসিংহ রাজা আসি আচণ্ড সম্প্রতি ॥
কামরূপ লৈইবেক করি আসিলেন্ত। আমারো যুদ্ধক প্রতি করিত আরম্ভ ॥
গন্ধর্ব্ব ভূঞাই অতি আনন্দ মনত। কবাড়পত্রক লেখিলন্ত কাকতত ॥১৩॥
সত্য করি মেল গোট কোরিবা দুজনে। যুদ্ধর সভার মিলাইলন্ত তারক্ষণে ॥১৪॥
ছিলে খড়্গা চর্ম্ম ঘোরা সমস্তে আনিলা। বিশ্বসিংহ রাজা সনে যুদ্ধক পাতিলা ॥
কতিপয় বৎসর যুদ্ধ করিলন্ত। একে মতে রাজা যুদ্ধে নু আবস্ত ॥" ১৫ ইত্যাদি

তৎপরে শিরোমণি ভুঁঞা ও তাঁহার অধীন বারভুঁঞা রাজা বিশ্বসিংহের কূট-কৌশলে কিরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকৃত বিস্তৃত জনপদ কিরূপে কোচ-রাজের শাসনাধীন হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ উক্ত কুলগ্রন্থে রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, শিরোমণি ভূঞা কায়স্থ হইলেও তাঁহার অধীন বারভুঁঞা মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উভয় জাতিই ছিলেন। এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ আসামের নানাস্থানে বিদ্যমান। তাঁহাদের অনেকের নিকট এখনও বহু

কুল-পরিচয়ের পুথি বা বংশলতা রহিয়াছে। ঐ সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিলে আমরা আসামের সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের বহু উপকরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইব। বুরুঞ্জী ও রাজবংশাবলী নামক গ্রন্থসমূহ মধ্যে কামরূপের ইতিহাসের যে অংশ অস্পষ্ট ও অন্ধকারাবৃত আছে, আমরা পূর্ব্বোক্ত পারিবারিক কুলগ্রন্থসমূহ হইতে সেই সেই অংশ উদ্ধার করিতে পারিব, তাহাতে কামরূপের ইতিহাসের গৌরবজনক অধ্যায় প্রকাশিত হইবে। মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে আনন্দ! আর আমাদের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি, ইঁহার গল্প করিতে কি আমাদের আনন্দ নাই? আইস, আমরা সকলে মিলিয়া জন্মভূমির ইতিহাসের অনুসন্ধান করি।" আজ মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রের মত আমিও আহ্বান করিতেছি—আসুন, আসামের অধিবাসী জন্ম-ভূমির প্রিয়-সন্তান, জন্মভূমির বিগত স্মৃতি কীর্ত্তন করিবার জন্য—অতীত গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হউন। যাঁহার যেরূপ শক্তি—তদনুরূপ স্ব স্ব জন্মভূমি—স্ব স্ব জন্ম-কেন্দ্র—স্ব স্ব সমাজ ও জাতির ইতিহাস উদ্ধারে—উপকরণ-সংগ্রহে অগ্রসর হউন। পুণ্যস্থান প্রাগ্‌জ্যোতিষের ইতিহাস উদ্ধার হইলে কেবল আসাম বলিয়া নহে, বা সেই সঙ্গে বাঙ্গালা বলিয়া নহে, সমস্ত প্রাচ্য-ভারত গৌরবান্বিত হইবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্গের পালরাজগণ

বাঙ্গালার পালরাজগণ জাতিতে কি ছিলেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। পালরাজগণও আপনাদিগকে কোথায়ও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন নাই বা দেবতা হইতে তাঁহারা ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন এরূপ কথার অবতারণাও তাঁহারা করেন নাই। রামচরিত বা রামপালের কাহিনী-লেখক কবি সন্ধ্যাকর নন্দী পালরাজগণের পরিচয় দিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, পালরাজগণ "দৈত্যবিষ্ণু"র বংশধর। "দৈত্যবিষ্ণু" সর্ব্ব বিদ্যাবিশারদ হইলেও যুদ্ধবিশারদ বলিয়া খ্যাত ছিলেন না। যশোবর্ম্মাদেব যখন পুনঃ পুনঃ আক্রমণে বঙ্গদেশ বিধ্বস্ত করিতেছিলেন, সেই সময়ে জনৈক "দৈত্যবিষ্ণু"র বংশধর আপনার বীরত্বে ও রণনীতির প্রতিভায় বঙ্গদেশ উদ্ধার করিয়া ৭৭০খৃষ্টাব্দে বঙ্গে আপনার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেন। ইহার নাম "বাপ্পট" দেব।

আমরা লৌকিক ধর্ম্মশাখার কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গল পাঠে জানিতে পারি যে, ধর্ম্মপালের বল্লভা দেবী নাম্নী এক পরিত্যক্তা স্ত্রী ছিল। এই রমণী বনে শ্রীধর্ম্মের আরাধনা করিতেছিলেন। একদা বরুণদেব ধর্ম্মপালের রূপ-পরিগ্রহ করিয়া বল্লভার গর্ভে এক পুত্রোৎপত্তি করেন, এই পুত্রের নাম দেবপাল। ধর্ম্মপালের বাক্‌পাল নামে এক ভ্রাতা ছিলেন। এই অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করিলে বলিতে হইবে, দেবপাল বাক্‌পালের তনয় নহে। যে দিক্ দিয়াই বিচার করা যাউক না কেন, এই সকল প্রবাদ দ্বারা ইহাই বিশ্বাস হয় যে, পালরাজগণ বর্ণসঙ্কর ছিলেন বলিয়াই কোথায়ও আপনাদের জাতির কথা উত্তর কালের লোকের জন্য লিখিয়া যান নাই। ধর্ম্মমঙ্গলের কানুরপালায় এই ঘটনার বিশদ বর্ণনা আছে। এইরূপ অবস্থায় পালরাজগণ যে কি প্রকারে 'সাগরান্বয়' হইতে পারেন, তাহা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। লোকের পার্থিব উন্নতি হইলে আত্মমর্য্যাদা বৃদ্ধির উপর বড় ঝোঁক পড়িয়া যায়। নিজের কথা নিজে বলিলে লোকে তাহা সহজে বড় বিশ্বাস করিতে বা মানিতে চাহে না। সে জন্য লোক আপনার শ্রেষ্ঠত্ব পরের মুখ দিয়া বলাইয়া থাকে। বর্ত্তমান আসামও পালরাজগণের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। পরবর্ত্তীকালে আমরা দেখিতে পাইতেছি, পাল-সামন্তরাজ আসামের বৈদ্যদেব পালরাজ মদনপালকে আপনার একখানা তাম্রশাসনে চন্দ্রবংশোদ্ভব ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রকটিত করিয়াছেন। পালরাজগণ জানিতেন, তাঁহারা পতিত জাতি, তাই তাঁহারা তাঁহাদের অভ্যুদয়ের সময়ে বা পরে আপনাদের জাতির সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। পতিতজাতির অভিধানেই তাঁহারা সন্তুষ্ট ছিলেন। ধর্ম্মপালের সমসাময়িক একজন লেখক ধর্ম্মপালকে "রাজভাট" বংশীয় লোক বলিয়াছেন। খুব প্রশস্ত ভাবে ইহার অর্থ করিলেও কোন রাজার সেনানীর বংশধর ভিন্ন অন্য অর্থ আমাদের মনে আইসে না। ভাটগণ হিন্দুরাজগণের স্তুতিপাঠক ছিলেন।

ব্যপ্পটের পুত্র গোপাল বা লোকপাল। গৌড়ের প্রজাশক্তি আপনাদিগের রক্ষার জন্য বহিঃশত্রুর আক্রমণে বাধা দেওয়ার নিমিত্ত সকলে একমত হইয়া গোপালকে আপনাদের রাজা করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে বসাইয়াছিল। বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহাই একমাত্র প্রজাশক্তি কর্ত্তৃক অধিপতি নির্ব্বাচিত নহে। পরবর্ত্তী ইতিহাসেও ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। ইতিহাসপাঠক এসম্বন্ধে প্রেসিডেন্সি কলেজের তদানীন্তন ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক টনি (Tawney) সাহেবের প্রাচীন ভারতে রাজনির্ব্বাচন প্রবন্ধ পাঠ করিলে অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন। প্রজাপুঞ্জের আহ্বানে বিনা রক্তপাতে পালবংশ বঙ্গের সিংহাসনলাভ করিয়াছিলেন। বৈবাহিক বা উত্তরাধিকারী সূত্রে বা বিজয়ে তাঁহারা গৌড়ের নরপতিত্ব লাভ করেন নাই। প্রজাসাধারণ প্রেমভরে মাথা পাতিয়া তাঁহাদের শাসনগ্রহণ করে। যে সময়ে গোপালদেব গৌড়ের সিংহাসন প্রাপ্ত হন, সে সময়ে গৌড়ের বড় শোচনীয় দশা। তৎকালে আসামরাজ বঙ্গের পূর্ব্বাংশ বিজয় করিয়া আপনার শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছিলেন। পরিত্যক্ত কাশ্মীর রাজকুমার জয়াপীড় আসিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আপনার বিজয়পতাকা উড্ডীন করেন, পরন্তু গৌড়-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া রাজাকে অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করেন। অপরদিকে গুর্জ্জরাধিপতি বৎসরাজ বঙ্গ ও গৌড় জয় করিয়া বাঙ্গলায় রাজপুত্র আকর্ষণ করিয়া স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালে বঙ্গদেশ অন্তর্বিদ্রোহে ছিন্নভিন্ন হইয়া সম্পূর্ণ অরাজক ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং প্রজাবৃন্দ আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া মহাযোদ্ধা অদ্বিতীয় বীর ব্যপটের পুত্র গোপালদেবকে সিংহাসন প্রদান করিয়া আপনাদের স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিল। খুব সম্ভব এই ঘটনা বিদেশীয় আক্রমণের পর হইয়া থাকিবে। রাজতরঙ্গিণীর সময়ানুসরণ করিয়া পালরাজগণের ঐতিহাসিক সময় নিরূপণ করিতে হইলে বলিতে হইবে ৭৬০ খৃষ্টাব্দে গোপাল রাজা হন। চৈনিক ভ্রমণকারী হোয়েনথসঙ্গও ইহার কিছু পূর্ব্বে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করেন, কিন্তু তিনি আপনার বিবরণে কোনও রাজার নাম উল্লেখ করেন নাই।

এখন কথা হইতে পারে, পালরাজগণ যদি ক্ষত্রিয় নহেন, তবে কি করিয়া তাঁহাদের রাষ্ট্রকূট, চেদী ও হৈহয় বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয়কুলে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সে কালে রাজাদের কোন জাতি বিচার ছিল না। তাঁহারা যে কোন জাতির কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন। রাজা যযাতির শুক্রাচার্য্যের দুহিতা দেবযানী-বিবাহ, শান্তনুরাজার মৎস্যগন্ধা বা সত্যবতী বিবাহ প্রভৃতি অসবর্ণা বিবাহের অনেক প্রমাণ আছে। সুতরাং আধুনিক সমাজ-বন্ধনানুসারে বৈবাহিক ব্যাপার দেখিয়া অতীতের বিচার চলিতে পারে না। তারপর ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ভারতবর্ষ হইতে ক্ষত্রিয়কুল একবারে নির্ম্মূল হইয়াছিল, এমন কি মহাভারতের সভাপর্ব্বে কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট বলিয়াছেন, এখন যাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয়

দেন তাঁহারা কেহ ক্ষত্রিয় নহেন, "মূর্দ্ধভিষিক্ত"। মহাভারতের পরবর্ত্তীকালেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মহানন্দ ক্ষত্রিয়বংশ নিঃশেষ করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গের কামতেশ্বর-বংশ-কারিকায় জাতিসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি আছে :—

মহানন্দী সুতনন্দ বৌদ্ধরাজ সদানন্দ
ধ্বংস করে ক্ষত্রবংশ তিন সপ্তবার।
সেহ গোটা ভুজবলে যুঝিলেন্ত অবহেলে
দ্বিতীয় পরশুরাম যিতু অবতার॥

বৌদ্ধ শবরের একখানা মীমাংসা-সূত্রের টীকা আছে। সেই টীকায় শবর বলেন, রাজা শব্দের অর্থে আর্য্যাবর্ত্তে রাজ্যশাসনে নিযুক্ত বা যুদ্ধব্যবসায়ীকে বুঝায়। অন্ধ্রদেশেও এরূপ ব্যবসায়ী লোককেও রাজা বলে। সুতরাং রাজা ও ক্ষত্রিয় কালে একার্থবাচক হইয়া ছিল। অনেক পররাজ্যাক্রমণকারী বীরগণও ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় পালরাজগণ যে দুই তিন পুরুষ পরে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? দ্বাদশ শতাব্দীর ক্ষত্রিয়গণের পরিগণনা করিয়া সিংহগিরি তাঁহার ব্যাসপুরাণে পালগণকে অতি নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই কথা বল্লালচরিতের মধ্যে আছে।

ধর্ম্মপাল পালবংশের দ্বিতীয় ভূপতি। কোন সময়ে তিনি রাজা হইয়াছিলেন এবং কোন সময়ে তাঁহার রাজত্বের শেষ হইয়াছিল, তাহা এখন নির্দ্ধারণ করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার। মালদহ জেলায় খালিমপুর গ্রামের এক কৃষকপল্লীর নিকট হইতে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করেন। বটব্যাল মহাশয় সে সময়ে মালদহের মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সেই খালিমপুর তাম্রশাসনখানি ধর্ম্মপালের বত্রিশবৎসর রাজত্ব কালে প্রদত্ত হইয়াছিল। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, ধর্ম্মপাল বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সময় হইতে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল সে প্রশ্নের সমাধান একথায় কিছুই হইতেছে না। ভাগলপুরে বিগ্রহপালের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মপাল কাণৌজের রাজা ইন্দ্ররাজকে পরাজয় করিয়া পাঞ্চালদেশের জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের রাজত্ব প্রদান করেন। গোয়ালিয়ার প্রদেশের একখানি শাসনে জানা যায় যে, পরিহাররাজ নাগভাটের সহিত যুদ্ধে সামন্তরাজ চক্রায়ুধ পরাজিত হন। অপর একখানা তাম্রশাসন হইতে জানা যাইতেছে যে, নাগভাট ৮১৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং নাগভাট ও চক্রায়ুধ সমসাময়িক লোক।

প্রভাবকচরিত পাঠে জানা যায় পাটলীপুরে শূরপাল (বপ্পভট্টি) জন্মগ্রহণ করেন। ৮০৭ সংবতে (৭৫১ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার দীক্ষা হয়। এই সময়ে কান্যকুব্জ-সিংহাসনে যশোবর্ম্মা রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আমরাজ কান্যকুব্জের সিংহাসনলাভ করেন। শূরপাল প্রথমে আমরাজের সভায় ছিলেন। পরে তিনি কোনও কারণে ধর্ম্মপালের সভায়

আগমন করেন। আমরাজের সহিত ধর্ম্মপালের ঘোর শত্রুতা ছিল। এই সময়ে কবি বাক্‌পতি ধর্ম্মপালের প্রধান সভাসদ ছিলেন। আবার কিছুদিন পর বপ্পভট্টি শূরপালকে আমরাজ কৌশল করিয়া আপন সভায় লইয়া যান। ৮৯০ বিক্রমসংবতে অর্থাৎ ৮০৪ খৃষ্টাব্দে মাগধ-তীর্থে আমরাজের মৃত্যু হয়। সুতরাং ধরিতে হইবে, ধর্ম্মপাল ৮০৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রাজত্ব আরম্ভ করেন।

রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় গোবিন্দদেবের দিগ্বিজয়বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এক কালে দাক্ষিণাত্য হইতে হিমালয়ের পাদভূমি পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত তিনি জয় করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালও চক্রায়ুধকে গোবিন্দদেবের বিজয়ী সৈন্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল, কিন্তু নাগভাট কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। এই গোবিন্দদেবের সময়, সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী হইতে ৭৯৪ হইতে ৮১৩ খৃষ্টাব্দে নিশ্চয় করিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কান্যকুব্জরাজ ইন্দ্র ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। কিলহর্ণ সাহেবের দাক্ষিণাত্য লেখমালা নামক গ্রন্থ হইতে একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন সকল ঘটনাবলী একত্র সমাবেশ করিলে দেখা যায়, ইন্দ্ররাজ কান্যকুব্জে ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া ধর্ম্মপাল চক্রায়ুধকে রাজা করেন। নাগভাট চক্রায়ুধকে পরাজয় করেন। গোবিন্দদেব নাগভাটকে বিজয় করেন। এই সকল ঘটনা পরস্পর মিলাইয়া দেখিলেই ইহা প্রতীতি হয় যে, ঘটনাগুলি ৭৮৩ হইতে ৮১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং ধর্ম্মপালও ৭৮৩ হইতে ৮১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও এক সময়ে কান্যকুব্জ জয় করেন। ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূট-কুমার প্রবালের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের পথরি মন্দির এই প্রবাল দেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের গাত্রলিপিতে লেখা আছে যে প্রবালদেব ৮০১ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সুতরাং চারিদিক্ হইতে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ধর্ম্মপাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে এবং নবম শতাব্দীর প্রথমে গৌরবে ও পরাক্রমে গৌড়-সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। প্রবালদেব কর্করাজের পুত্র। এই কর্করাজ গুর্জ্জরাট রাজপুত্র নাগাবলোককে পরাজয় করেন। সে সময়ের প্রশস্তি আদি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নাগাবলোক ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে গৌরবের সহিত গুজ্জরাটে রাজত্ব করিতেছিলেন।

কান্যকুব্জ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপাল ভোজ, মৎস্য, মদ্র (পঞ্চনদ প্রদেশ) কুরু, যদু, অবন্তী, গান্ধার ও কিরাত প্রভৃতির নরপতিগণকে বিজয় করিয়া উত্তরভারতে আপনার একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ৮০০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপাল সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হইয়াছিলেন। কতকাল পর্য্যন্ত পালরাজগণ এই মহাদেশের আধিপত্য সংরক্ষণ করিয়া আপনাদের যশোপ্রভাব অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন, ইতিহাস সে পরিচয় প্রদানে অসমর্থ। নাগভাটের চক্রায়ুধকে পরাজয় করিবার ঐতিহাসিক মূল্য কিছুই নাই। ধনলোভে তিনি রাজ্যাক্রমণ করিয়া ধনলাভে সন্তুষ্টচিত্তে আপনার রাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। গোবিন্দদেবের উত্তরভারত আক্রমণকে

গজনীর সুলতান মামুদের আক্রমণের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। পরবর্ত্তীকালে দেবপালও এই বিস্তীর্ণ মহাদেশের সম্রাট্ ছিলেন। দেবপাল কণিষ্কবিহার (পেশওয়ারের নিকট অবস্থিত) হইতে একজন বৌদ্ধ শ্রমণকে নালন্দাবিহারের অধিকারত্বপদে বরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। এই ঘটনাটিকে আধুনিক বদলা বদলী (Transfer) অভিধান দেওয়া যাইতে পারে।

ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল। উত্তরাধিকারসত্বে সমগ্র সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বীরবিক্রমে ঐ সমস্ত প্রদেশ আপনার শাসনাধীনে রাখিয়াছিলেন, তাহা এই নালন্দার অধিকারী নির্ব্বাচনেই সুস্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে।

দেবপালের রাজ্য সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এক বিরাট সাম্রাজ্যের গঠন করিয়াছিল। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ, পূর্ব্ব-পশ্চিমে সাগর, দেবপাল এই বিশাল ভূখণ্ডের একচ্ছত্র নরপতি ছিলেন। ঔপমন্যব গোত্রীয় ঋক্‌বেদান্তর্গত আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী শ্রীনগরবাসী জনৈক ব্রাহ্মণকে দেবপাল যে তাম্রশাসন দান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার রাজ্যের সীমা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীনগর সম্ভবতঃ প্রাচীন পাটলীপুত্র বা আধুনিক পাটনার নাম হইবে।

ধর্ম্মপাল ও দেবপাল খৃষ্টের নবম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল খালিমপুরের তাম্রশাসনানুযায়ী বত্রিশ বর্ষকাল ও মুদ্গগিরির (মুঙ্গের) তাম্রশাসনানুসারে দেবপাল ৩৩ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই শতাব্দীব্যাপী রাজত্বে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ উন্নতি ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। এই সময়ে হরিভদ্রের বৌদ্ধধর্ম্মের বিশ্লেষণ ও বীরদেবের সাধুতা লোকের হৃদয়ে বুদ্ধদেবের সিংহাসন দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

লৌকিক বৌদ্ধ-প্রভাব এই সময়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। রমাই পণ্ডিত এই সময়ে লোকের মধ্যে ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি প্রচার করেন। বঙ্গে যেখানে সেখানে ধর্ম্মের পূজা আরম্ভ হইয়াছিল। রমাই পণ্ডিতের "শূন্যপুরাণ" পাঠে বৌদ্ধধর্ম্মের এই লৌকিক শাখার প্রসার বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, হাকন্দপুরাণ অনুযায়ী ময়ূরভট্টের মতে লিখিত। হাকন্দপুরাণ এখন আর পাওয়া যায় না। ধর্ম্মমঙ্গলের নায়ক লাউসেন। লাউসেন দেবপালের ভ্রাতৃবধূ রঞ্জাবতীর পুত্র। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ময়নানগরে এই লাউসেনের রাজধানী ছিল। লাউসেন "ধর্ম্মের" প্রিয়পাত্র ছিলেন। লাউসেনের মামা মহামদ দেবপালের মন্ত্রী ছিলেন। এই মহামদ বহুবার লাউসেনের প্রাণনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু "ধর্ম্মের" বরে লাউসেন সকল বাধা-বিপত্তি হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলের লেখকের মতে লাউসেন কামরূপ ও কলিঙ্গদেশ জয় করিয়া দেবপালকে প্রদান করেন।

দেবপালের রাজ্যপাল নামে এক পুত্র ছিল। মুঙ্গের-শাসন লিপি-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দেবপাল রাজ্যপালকে এই শাসনের প্রশস্তি কার্য্যে পরিণত করিবার ভার দিয়া-

ছিলেন। এই তাম্রশাসনের উল্লেখ ব্যতিরেকে রাজ্যপালের নাম আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। দেবপালের পর তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা জয়পালকে আমরা উত্তরাধিকারিসূত্রে দেবপালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই। জয়পাল দেবপালের অনুরক্ত সেনাপতি ছিলেন। জয়পাল বহুবার কামরূপ ও উৎকল আক্রমণ করিয়াছিলেন। জয়পালের হিন্দুধর্ম্মে অনুরাগ ছিল। বৌদ্ধ হইয়াও তিনি হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই শ্রাদ্ধে কাঞ্জিবিল্বী গ্রামনিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত উমাপতি মহাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়পালের পর তাঁহার পুত্র শূরপাল বা বিগ্রহপাল রাজা হইয়াছিলেন।

শূরপালের রাজত্বের কালে পালসাম্রাজ্য পশ্চিমে বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে কনৌজ পরিহর-গুর্জ্জর-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। এতদঞ্চলের "শাসন" গুলি কনৌজ হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। দিনাজপুর জেলার পত্নীতলা থানার অন্তর্গত মঙ্গলবাড়ী বা বুদাল স্তম্ভলিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শূরপালের সহিত উৎকল, হুণ, দ্রাবিড় এবং গুর্জ্জরবাসিগণের সংঘর্ষ হইয়াছিল। এই স্তম্ভের নাম রামগুরব মিশ্রের গরুড়স্তম্ভ-লিপি। রামগুরব মিশ্র শূরপালের পুত্র নারায়ণ পালের মন্ত্রী ছিলেন।

উৎকলে এই সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল। সোমবংশোদ্ভব রাজগণ ব্রাহ্মণগণের প্রতি নির্দ্দয় অত্যাচার করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণগণ সোমবংশ ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া কেশরীবংশীয়গণকে সিংহাসন প্রদানে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। উৎকলের এই আভ্যন্তরিক গোলযোগের সময়ে শূরপাল বা বিগ্রহপাল উড়িষ্যা আক্রমণ করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

এই সময়ে হুণগণ মধ্যভারতে প্রবল ছিল। হুণগণ মধ্যভারতের মালব ও বুন্দেলখণ্ডের অধীশ্বর ছিল বলিয়া প্রতীতি হয়। হুণগণের সহিত প্রতিহর প্রভৃতি জাতির সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহাদি সংঘটিত হইত। পাল-সাম্রাজ্যের প্রান্ত সীমায় বাসনিবন্ধন পালরাজগণের পক্ষে হুণগণের সহিত সমরাঙ্গনে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়াই সম্ভবপর।

চোল বা কোলগণও এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে প্রবল শক্তিশালী নরপতি ছিলেন। চোলগণ বহুবার পালরাজ্য আক্রমণ করিয়া আপনাদের বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল।

গুর্জ্জরগণ এই সময়ে প্রবল হইয়া কনৌজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, গুর্জ্জরগণ বড়ই অস্থির প্রকৃতির লোক ছিল। তাহারা প্রায়ই পালরাজগণকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। বুদালস্তম্ভ লিপিতে উল্লেখ আছে যে, বিগ্রহপাল সসাগরা পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। বহুকাল রাজত্ব করিয়া বিগ্রহপাল উৎকলবাসীদিগকে উৎসাদিত, হুণগর্ব্বখর্ব্ব, দ্রাবিড় ও গুর্জ্জরবাসিগণের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন, ইহা সেই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিবেচনা হয়। ইহা কবির অতিশয়োক্তি নহে।

রামগুরব মিশ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ পালনৃপতিগণের পুরুষানুক্রমে মন্ত্রী বা ধর্ম্মাধিকারী ছিলেন। ইঁহারা শাণ্ডিল্যগোত্রীয় মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। এই বংশের

গর্গ ধর্ম্মপালের মন্ত্রী ছিলেন। গর্গের মন্ত্রণাবলে ধর্ম্মপাল পৃথিবীর সম্রাট হইয়াছিলেন। পালরাজগণ অসাধারণ রাজনীতিক ছিলেন। তাঁহারা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের সময়ে দিনে দিনে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি হইতেছে, শনৈঃ শনৈঃ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম মস্তক উত্তোলন করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে নিষ্কাশিত করিতেছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের সিংহাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইলে ব্রাহ্মণের সাহায্যের প্রয়োজন। তাই তাঁহারা মন্ত্রীর পদে ব্রাহ্মণকে বরণ, এবং সদাসর্ব্বদা ব্রাহ্মণকে পূজা করিয়া আপনাদের রাজ্য সুদৃঢ় করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

গর্গের পুত্র দর্ভপাণি দেবপালের মন্ত্রী ছিলেন। দেবপাল গর্গের রাজনীতি-মাহাত্ম্যে ও বিদ্যাবত্তায় তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। গর্গের পৌত্র কেদার মিশ্র শূরপাল বা বিগ্রহপালের মন্ত্রী ছিলেন। শূরপাল বা বিগ্রহপাল কেদার মিশ্রের বৈদিক ক্রিয়াকলাপে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন। কেদার মিশ্র নদীয়া জেলার দেবগ্রামনিবাসী এক ব্রাহ্মণের কন্যা ভবদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সে সময়ে রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিবাহ হইত। কুলপঞ্জিকায় ইহার প্রমাণ আছে। প্রত্যুত: রাঢ়ী-বারেন্দ্র বিবাহ তৎকালে নিষিদ্ধ ছিল না। পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মণগণ বল্লাল মোহে মজিয়া সংকীর্ণভাবাপন্ন হইয়াছেন। পালরাজগণের মধ্যে কেবল বিগ্রহপালের মুদ্রা আছে। প্রশস্তি প্রভৃতি আলোচনায় [illegible] অনুমান হয় যে, মহীপালেরও মুদ্রা ছিল। প্রাচীনকালে বাঙ্গালায় মুদ্রার প্রচলন ছিল না। কড়িই ক্রয় বিক্রয়ে মুদ্রা-স্বরূপে ব্যবহৃত হইত। পুরাণাদিতে দিনার বলিয়া এক প্রকার মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা যে কি পদার্থ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই।

বিগ্রহপাল পুরাণপ্রথিত হৈহয় বা চেদী-রাজকুমারী লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। নর্ম্মদানদীর উৎপত্তিস্থানে ত্রিপুরী নামক নগরীতে হৈহয়গণের রাজধানী ছিল। এই সময়ে তাহারা প্রবল হইয়া ভারতের নানাস্থানে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। বিগ্রহ-পাল এই বিবাহ হইতে নারায়ণপাল নামে এক পুত্র লাভ করেন। বিগ্রহপালের এই পুত্রই উত্তরকালে তাঁহার সিংহাসনে উপবেশন করেন। এই নারায়ণপালের মন্ত্রী ছিলেন রামগুরব মিশ্র। রামগুরব মিশ্র বাগ্মী ও জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে আমরা দেখিতে পাই, এই রামগুরব মিশ্রকে নারায়ণপাল মুঙ্গের হইতে ত্রিরাভুক্তি বিষয় প্রদেশে শৈবগণের শিব-পূজা বিধানের নিমিত্ত যে ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাহার দূতক করিয়াছেন। নারায়ণ-পালও শিবোপাসনার জন্য সহস্র শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আমরা নারায়ণ পালের সপ্তম বর্ষ রাজত্বকাল দেখিতে পাই, ভাণ্ডদেব নামক এক ব্যক্তি একটী হিন্দু-ধর্ম্মাশ্রম প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নারায়ণপাল হিন্দু ও বৌদ্ধকে সমান চক্ষে দেখিতেন, এবং উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করিয়া বিচার করিতেন না বলিয়া লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

নারায়ণপালের পর তাঁহার পুত্র রাজ্যপাল রাজা হন। ইনি অত্যল্পকাল রাজত্ব

করিয়াছিলেন। রাজ্যপাল বহু দীর্ঘিকা ও গগনস্পর্শী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রাষ্ট্রকুলোদ্ভূত তুঙ্গদেবের কন্যা ভাগ্যদেবীকে রাজ্যপাল বিবাহ করেন। নারায়ণপালের পুত্র গোপাল। এই গোপাল দেবের দুইখানি প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে। একখানি বুদ্ধ গয়ায় একটি বুদ্ধ মূর্ত্তিতে খোদিত। অপরটী নালন্দায় বাগীশ্রীমূর্ত্তিতে উৎকীর্ণ আছে।

গোপালের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। তাঁহার সময়ে বঙ্গে শিল্পকলার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ধার্ম্মিক ও বদান্য ছিলেন। কলাদি শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী ও অনুরক্ত ছিলেন। বাঙ্গালায় শ্রীমূর্ত্তি-গঠন-প্রণালী এই সময়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ভারতের শিল্পীগণের আদর্শ হইয়াছিল।

গোপালদেবের পুত্র মহীপাল। খৃষ্টের একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহীপাল পাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। মহীপাল ১০২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা বসন্তপাল ও স্থিরপালকে (লোকের বিশ্বাস এই দুই ভ্রাতা মহীপালের পুত্র) কাশীর নিকটে সারনাথের এক বিরাট স্তূপ সংস্কারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এখানে অমিতাভ বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া প্রথম ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। এই স্থানে একটা ধর্ম্মচক্র ছিল। চক্রটী সংস্কারাভাবে জীর্ণ হইয়াছিল। মহীপাল বসন্তপাল ও স্থিরপালের সাহায্যে তথাকার ধর্ম্মচক্রটীরও সংস্কার করাইয়াছিলেন। মহীপাল অনেকগুলি গন্ধকুঠী বা ধর্ম্মমন্দির সারনাথে নির্ম্মাণ করাইয়া আপনার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তার করেন। বসন্তপাল ও স্থিরপাল স্বধর্ম্মনিরত, অতিশয় ধর্ম্মভীরু ও পণ্ডিত ছিলেন।

মহীপাল বহুবর্ষ ব্যাপিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের নানাস্থানে বহু জলাশয়াদি কালের সর্ব্বসংহারিণী শক্তিকে পরাজয় করিয়া অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, এবং তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী ঘোষণা করিতেছে। মহীপালের গীত বা মহীপালের প্রশংসার কবিতা আজও নানাস্থানে লোকে গান করিয়া থাকে। এক কাজ করিতে যাইয়া লোকে যখন অন্য বিষয়ের অবতারণা করে, তখন লোকে সেই অপ্রাসঙ্গিক কার্য্যকে মহীপালের গীত বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। কুচবিহার, রঙ্গপুর, দিনাজপুর এবং ময়ুরভঞ্জ প্রভৃতি দেশের লোকে ভক্তিভাবে মহীপালের গীত শুনিয়া থাকে।

মহীপালের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যবাসী কাঞ্চিরাজ রাজেন্দ্রচোল পালরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই আক্রমণের তারিখ সম্ভবতঃ ১০৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে পারে। রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণের সময় দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূর, উত্তর রাঢ়ে মহীপাল, বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেছিলেন। মহীপাল সম্রাট্ ছিলেন, আর ইহারা তাঁহার অধীনে সামন্ত রাজা ছিলেন। মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান জেলা উত্তর রাঢ় নামে খ্যাত। মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে একটি বিরাট ভগ্নস্তূপ পড়িয়া আছে। এই স্থানের নাম লোকে মহীপাল বলিয়া থাকে। পালরাজগণের কোনও স্থায়ী রাজধানী ছিল না। তাঁহারা যেখানে সেখানে জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া বাস করিতেন।

দিনাজপুর জেলায় হ্রদতুল্য একটি দীর্ঘিকা আছে। জনপ্রবাদ এই যে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তিলাভের আশায় পালরাজ মহীপাল এই সরোবর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পালরাজগণের যিনি যখন যেখানে থাকিতেন, সেই স্থানই একটি নগরে পরিণত হইয়া তাঁহাদের রাজধানী হইত। গৌড় নাম মাত্র তাঁহাদের রাজধানী ছিল। রাজেন্দ্র চোল তাঁহার তীরুমলয় গিরিলিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, তিনি এই সকল নরপতিকে পরাজয় করিয়া এই সকল প্রদেশে তাঁহার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন। সেই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার বিচার করিলে রাজেন্দ্রচোলের উল্লিখিত কীর্ত্তি-কাহিনী বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আর্য্য ক্ষেমীশ্বরের "চণ্ডকৌশিক" নামে একখানি পঞ্চ-মাঙ্কে সমাপ্ত নাটক আছে। সেই নাটক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীমহীপাল দেব কর্ণাটরাজকে ধ্বংস করেন। এই নাটকখানি মহীপালের আদেশে বিরচিত হয় এবং তাঁহার সমক্ষে ইহার অভিনয়ও হইয়াছিল। কবি একটী কবিতায় মহীপালকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত এবং কর্ণাটগণকে নন্দবংশের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

রণশূর আদিশূর বংশোদ্ভূত রাজা ছিলেন। আদিশূরই বঙ্গে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন করেন। শূররাজগণ যে পাল রাজগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের রাজ্যের অধিকাংশ প্রদেশ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, অতীতের সাক্ষী ইতিহাস আজ তাহা বলিতে না পারিলেও কুলপঞ্জিকায় তাহার প্রমাণ আছে।

রঙ্গপুরে প্রবাদে "চন্দ্র" উপাধিধারী এক রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। গোবিন্দ চন্দ্র এই বংশের শেষ রাজা। এই চন্দ্রবংশের রাজধানী মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত ভবচন্দ্র পাট নামক স্থানে ছিল। এখানে একটী নগরের ও রাজধানীর ভগ্নাবশেষ এখনও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। উত্তরবঙ্গে এই চন্দ্রবংশের রাজা মাণিকচন্দ্রের গীত বা ময়নামতীর গীত প্রচলিত আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষাদি এই গীতের মধ্যে আছে। রঙ্গপুরের অন্তর্গত জলঢাকা থানায় ধর্ম্মপাল নামে একটি বড় গ্রাম ও "গড়" আছে। তাহার পশ্চিমে দেওনাই নদীর তীরে আটিয়াবাড়ী নামক গ্রাম। এই আটিয়াবাড়ীতে একটি গড় আছে। লোকে সেইটীকে ময়নামতীর কোট বলে। ময়নামতী মাণিকচন্দ্রের জননী। মাণিকচাঁদ রাজা গোপীচাঁদের পুত্র বলিয়া যোগীর গানে পাওয়া যায়। এই ময়নামতী রাজা ধর্ম্মপালের ভ্রাতৃবধূ ছিলেন। রাজ্য লইয়া ময়নামতীর সহিত ধর্ম্মপালের বিরোধ হয়। সেই বিরোধের ফলে ত্রিস্রোতাতীরে উভয় পক্ষের ঘোর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে রাজা ধর্ম্মপাল হত হন। ধর্ম্মপালের আট মাইল দক্ষিণে হরিশ্চন্দ্রের পাট বলিয়া দেওনাই তীরে অপর একটী গ্রাম আছে। এখানে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী ছিল। এই চন্দ্রবংশীয় রাজার দুই কন্যা উদনা ও পদুনার সহিত রাজা মাণিকচন্দ্রের বিবাহ হয়। হরিশ্চন্দ্রের পাটেও রাজা হরিশ্চন্দ্রের সমাধি আছে। এই সমাধি মৃত্তিকা হইতে ৩।৪ ফুট উচ্চ। সমাধির মধ্যস্থানটী ভূগর্ভে বসিয়া যাইতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তরে

সমাধিটী বাঁধা। এইটী খনন করিয়া দেখিতে পারিলে এই বংশের অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার হইতে পারে। মাণিকচন্দ্র বাইশদণ্ডের রাজা ছিলেন, অর্থাৎ বাইশ দণ্ডে যতদূর পথ হাঁটিয়া যাইতে পারা যায়, সেই ভূখণ্ড জুড়িয়া মাণিকচন্দ্রের রাজ্য ছিল। এই বংশের ভবচন্দ্রের নাম বঙ্গে যথা তথা প্রবাদের মত রাষ্ট্র আছে। রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী শূন্যপুরাণে আছে।

একাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে চেদী সম্রাটের অভ্যুদয় হইয়াছিল। চেদী সাম্রাজ্য এই সময়ে বুন্দেলখণ্ড হইতে বিহার পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে চেদীরাজ গাঙ্গেয়দেব গঙ্গার অপর তীর পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করেন এবং গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যস্থিত সমগ্র ভূভাগ জয় করেন। তৎকালে কনৌজ রাজ্য অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছিল। গজনীর সুলতান মামুদের নিকট বিনাযুদ্ধে কনৌজরাজ পরাজিত হইয়াছিলেন। বিধর্ম্মীর নিকট বিনাযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করায় অপর এক জন হিন্দু রাজার সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয় ও তিনি হত হন। চেদীরাজ এই সুযোগে কনৌজ রাজ্যের অধিকাংশ জয় করেন। চেদীরাজ গাঙ্গেয়দেব এই সময়ে পাল রাজ হইতে মিথিলা প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় অক্ষরে লিখিত একখানি রামায়ণ পুস্তকের প্রতিলিপিকার চেদীরাজ গাঙ্গেয়ের রাজত্বকালে ১০২৯ খৃষ্টাব্দে এই লিপিকার্য্য মিথিলায় সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চেদীরাজ গাঙ্গেয়দেব ১০৪০ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগতীর্থে অক্ষয়বটবৃক্ষের মূলে দেহত্যাগ করেন। গাঙ্গেয়দেবের পরম শত্রুগণও মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে দিগ্বিজয়ী বীর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণদেব পিতার মৃত্যুর পর চেদী রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কর্ণদেব ৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়া চেদী রাজ্যের উন্নতিসাধন ও বহু বিস্তার করিয়াছিলেন। সে সময়ের পাণ্ড্য, মুরল, কুঙ্গ, গৌড়, হূণ প্রভৃতি দেশের রাজগণ তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। কর্ণাটরাজের সহায়তায় কর্ণদেব জলপ্লাবনের মত সমগ্র দেশ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই সময়ে কেবল গুজরাট ও কল্যাণের চালুক্য ভূপতি-গণ কর্ণদেবকে বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বুন্দেলখণ্ডের রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মার সহিত কর্ণদেবের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে কীর্ত্তিবর্ম্মার সেনাপতি গোপাল রায়ের সহিত তাঁহার ঘোর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে কীর্ত্তিদেব পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া পলায়ন করেন। প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক এই ঘটনাকে আজ পর্য্যন্ত চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। যে দিন গোপাল রায় বিজয়শ্রী লাভ করিয়া বুন্দেলা রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন, সেই সময়ে প্রবোধচন্দ্রোদয় বিরচিত হইয়া তাঁহার মনোরঞ্জনার্থে তাঁহার সমক্ষে অভিনীত হইয়াছিল।

এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহাদি পরিপূর্ণ দুর্দ্দিনের মধ্যে পালরাজ্যের গৌরবের বিষয় আছে। এই সময়ে বিক্রমশিলার ধর্ম্মমন্দিরে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়। মহীপাল এই সময়ে পালরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তিব্বতের নরপতি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে আমন্ত্রণ

করিয়া লইয়া যান। দীপঙ্কর তথায় যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করিয়াছিলেন। এখানে তিনি এক সম্প্রদায় লামার সৃষ্টি করেন। দীপঙ্কর তিব্বতে মহাযান সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। তিব্বতে আজও দীপঙ্কর অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত।

বিক্রমশিলা কোন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা বলা দুষ্কর, কিন্তু খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে এই স্থান যে নালন্দার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহার বহু প্রমাণ আছে। ইহার ফলে নালন্দার গৌরব খর্ব্ব না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহীপালের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে নালন্দায় অনেক গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। খৃষ্টের একাদশ শতাব্দীতে মহীপাল ও ন্যায়পালের রাজত্বকালে নালন্দার বিদ্যামন্দিরে এরূপ বহু গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত হয়, যাহা অদ্যাপি নেপাল রাজ্যে রক্ষিত আছে। পালরাজগণ যে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রজ্ঞাকরমতি নামে একজন বৌদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতের এই সময়ে অভ্যুদয় হইয়াছিল। একজন লিপিকার ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে একখানা সংস্কৃত গ্রন্থের নকল করেন। সেই প্রতিলিপিতে লিপিকার প্রজ্ঞাকরকে তাঁহার গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বহু সংখ্যক বৌদ্ধ পণ্ডিত এই সময়ে তিব্বতে যাইয়া তথাকার পণ্ডিতগণের সাহায্যে বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে বঙ্গ ভাষারও বহু বিস্তৃতি হইয়াছিল। আমরা এই সময়কে বঙ্গ ভাষায় আদিস্তর বলিতে পারি। এই সময়ে নানা প্রকার গীত বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়া মুখে মুখে দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হইয়াছিল। কৃষ্ণাচার্য্যের দোহা, ডাক পুরুষের বচন, সহজিয়া সম্প্রদায়ের গীতাবলী এই সময়ে বহুল প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গভাষায় আদিস্তরের ইতিহাস আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে। এই সময়ে তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক বৌদ্ধধর্ম্ম রূপান্তরিত ভাবে তন্ত্রের ভৈরব ও ভৈরবীর উপাসনার প্রশ্রয় দানের ফলে ভৈরব ভৈরবী, বুদ্ধ ও বোধি সত্ত্বের অবতার বলিয়া বৌদ্ধ মন্দিরে পূজিত হইতেছিল। ইহাই জাতীয় জীবনের প্রকৃত অধঃপতনের সময়।

সাধারণ লোকের মধ্যে এই সময়ে যোগাভ্যাসের প্রচলন হইয়াছিল। যোগাভ্যাস দ্বারা এক শ্রেণীর যোগী অমানুষিক ত্যাগ স্বীকারে ও কষ্ট সহিষ্ণুতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া "নাথ" এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। নাথগণকে সকলেই ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। ইহাদের সংখ্যাও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই যোগী সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মের এক পৃথক্ শাখা ছিল। আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও মীননাথ প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্মেই আসক্ত ছিলেন। এই সমাজের গোরক্ষনাথ শিবাবতার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। গোরক্ষনাথ এই শ্রেণীর যোগীর সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। গোরক্ষনাথের অপর নাম রামবজ্র ছিল। সাধারণ বৌদ্ধগণ তাহাকে স্বধর্ম্মত্যাগী বলিয়া ঘৃণা করিত। এই যোগিগণ গুপ্ত সাধনার প্রচলন করেন। এই সঙ্গে

পূর্ব্বভারতে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন হয়। "নাথ" উপাধিধারী যোগিগণ এখন হিন্দু সমাজে ঘৃণ্য পতিত জাতি বলিয়া গণ্য। উত্তর বঙ্গে বগুড়া জেলায় যোগীভবন বলিয়া প্রাচীন একটী বৌদ্ধবিহার আছে। এখানকার যোগিগণ কাণফাঁড়া যোগী সম্প্রদায়ভুক্ত। এই যোগী-ভবনের নিষ্কর সম্পত্তি আছে। সেই সম্পত্তি হইতে সমস্ত দেবক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। রঙ্গপুরের যোগী জাতির মধ্যে সন্ন্যাসী পূজার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই সন্ন্যাসী পূজা শিবপূজা বা গোরক্ষনাথের পূজা বলিয়াই বোধ হয়। পূজার প্রধান উপকরণ গাঁজা।

মহীপালের মৃত্যুর পর ন্যায়পাল রাজা হইয়াছিলেন। ন্যায়পালের নাম আমাদের দেশের লোকে বড় কেহ জানে না। ন্যায়পাল তিব্বত ও চীনদেশেও পরিচিত। ন্যায়পাল সুদীর্ঘ কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে দেশে শান্তি বিরাজ করিত। ন্যায়পাল গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিবার জন্য তিব্বতে অনেকগুলি পণ্ডিত পাঠাইয়াছিলেন। ন্যায়পালের রাজত্বকালে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ন্যায়পালের পাকশালার অধ্যক্ষের ভ্রাতুষ্পুত্র চক্রপাণি দত্ত স্বীয় নামে একখানা চিকিৎসা গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। চক্রপাণিদত্ত মাধবনিদানের রোগের বর্ণনানুযায়ী চিকিৎসাপ্রণালী লিখিয়া রাখিয়াছেন। বোধসৌকর্য্যার্থে চক্রপাণি বহুবিধ চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

ন্যায়পালের সময় শূদ্রক গয়াতে উচ্চ রাজপদে আসীন ছিলেন। শূদ্রকের পুত্র বিশ্বরূপ গয়াধামে অতি মনোহর একটী দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরগাত্রে যে প্রশস্তি লিখিত আছে, তাহা ন্যায়পালের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে বৈদ্যরাজ বজ্রপাণি রচনা করেন। মহীপাল ও ন্যায়পালের রাজত্বকাল উন্নতি ও অবনতির ঘাত প্রতিঘাতপূর্ণ। গাঙ্গেয় ও কর্ণদেবের বীরত্বে তাঁহাদের যশঃগৌরব লুপ্ত হইয়াছিল। সামরিক গৌরব বিলুপ্ত হওয়ায় দেশে শান্তি বিধান করিতে এই নরপতিদ্বয় বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন।

ন্যায়পালের পর তৃতীয় বিগ্রহপাল রাজা হন। বিগ্রহপালের একখানি তাম্রশাসন দিনাজপুর জেলায় আমগাছী গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। এই তাম্রশাসন পাঠে জানিতে পারা যায়, বুদ্ধদেবের মনস্তুষ্টির জন্য বিগ্রহপাল ভূমিদান করিয়া বুদ্ধবিহারী দেবতানিচয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই আমগাছীর তাম্রশাসনখানি বিগ্রহপালের ত্রয়োদশ বর্ষ রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই সময়ে ত্রিপুরীর কর্ণদেব উত্তরভারতের প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। বিগ্রহপাল কর্ণদেবের সহিত কোনও প্রকার সংঘর্ষে উপস্থিত হন নাই। কর্ণদেব বিগ্রহপালের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। কর্ণদেব তাঁহার কন্যা যৌবনশ্রীর সহিত বিগ্রহপালের বিবাহ দেন। বিগ্রহপালের তিন পুত্র মহীপাল, শূরপাল ও রামপাল। মহীপাল তাহার নানাবিধ গর্হিত কার্য্য দ্বারা প্রজাপুঞ্জের বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন। যে কারণেই হউক মহীপাল তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা রামপাল ও শূরপালকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারারুদ্ধ করেন। রামপালের আত্মীয় স্বজন উভয় ভ্রাতাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করেন।

উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত্ত নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতি ছিল। মহীপালের সময় দিব্যক ও রুদ্রক নামে দুই ভ্রাতা কৈবর্ত্তগণের নেতা বা রাজা ছিলেন। সাধারণ প্রজাপুঞ্জ পালরাজ প্রতি বিদ্রোহভাবাপন্ন দেখিয়া দিব্যক কৈবর্ত্ত জাতিকে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রুদ্রকপুত্র ভীম কৈবর্ত্ত জাতির অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলে এই বিদ্রোহবহ্নি দাবানলের মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। কৈবর্ত্তগণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারই এই বিদ্রোহের মূল কারণ বলিতে হইবে। রাজা মহীপাল বিদ্রোহীগণকে দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলে রাজমন্ত্রীগণ তাঁহাকে এই অভিযান হইতে নিরস্ত হইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহীপাল কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া তড়িৎ গতিতে অসংখ্য অশিক্ষিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কৈবর্ত্তগণের সম্মুখীন হন। সুশিক্ষিত কৈবর্ত্তরাজসৈন্যের সমক্ষে এই অশিক্ষিত, যুদ্ধকার্য্যে অনভিজ্ঞ সৈন্য কতক্ষণ টিকিতে পারে। যুদ্ধারম্ভেই পালরাজসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলাইতে থাকে। রাজা মহীপাল পালগৌরব রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, অবশেষে সম্মুখ যুদ্ধে হত হন। এইরূপে কিছু দিনের নিমিত্ত উত্তরবঙ্গে পালরাজলক্ষ্মী কৈবর্ত্তপতির অঙ্কগত হন। কৈবর্ত্তগণ এই যুদ্ধের পর উত্তরবঙ্গ বা সমগ্র বারেন্দ্রভূমির একাধিপত্য লাভ করে এবং কৈবর্ত্তরাজ পালরাজধানীর অদূরে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত গঙ্গারামপুর থানার দক্ষিণে রাজিবপুর নামে এক গ্রাম আছে। এই গ্রামে বাণগড় বা বাণনগর নামে এক প্রাচীন ভগ্নস্তূপ আছে। এখান হইতে দিনাজপুর রাজবাড়ীতে একটি প্রস্তরস্তম্ভ আনীত হইয়াছে। সেই প্রস্তরস্তম্ভের গাত্রে লিখিত শ্লোকাবলী পাঠ করিয়া বারেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতি এইটি কৈবর্ত্তরাজগণের কীর্ত্তি বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই স্থান গৌড়ের রাজপথে অবস্থিত। গৌড় হইতে নিকট না হইলেও একদিনে যাতায়াত করিতে পারা যায়। শিবমন্দিরের এক স্তম্ভগাত্রে 'কাম্বোজান্বয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত' এই কথা আছে।

মহীপালের দিনাজপুর-তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, শূরপাল মহীপালের পর রাজ্যলাভ করেন। রামচরিতে ইহার কোনও উল্লেখ নাই। শূরপালের রাজত্বের দুইখানা খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে। শূরপালের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে পূর্ণদাস নামক একজন বৌদ্ধ শ্রমণ উদন্দপুরী নামক স্থানে বুদ্ধমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজ্যভ্রষ্ট শূরপাল ও তাঁহার পুত্র সমগ্র পালরাজ্য পরিভ্রমণ করেন। পাল-সাম্রাজ্যের সমুদায় সামন্ত রাজগণকে একত্র করিয়া রামপাল রাজপুরী রক্ষক রাষ্ট্রকূটবংশীয় শিববজ্রকে বারেন্দ্রভূমি জয় করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। শিববজ্র বারেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতিকে বলিয়া দিয়াছিলেন, এই অভিযানে কাহারও কোনও সম্পত্তির হানি হইবে না। চতুর্দ্দশ সামন্তরাজের সহিত সেনাপতি শিববজ্র বারেন্দ্রভূম্যধিকারী কৈবর্ত্তরাজ ভীমকে আক্রমণ করেন। রাষ্ট্রকূট রাজকুমার মহামাণ্ডলিক কহ্নুর এই বিজয় অভিযানের সর্ব্বপ্রধান সহায় ছিলেন। রামপালের মাতুল মহনের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র এই দুই সেনাপতি তাঁহার গুপ্ত

রাজ্যোদ্ধারের প্রধান সহায় হন। সামন্তরাজগণ আপন আপন সৈন্য সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া একবারে কৈবর্ত্তরাজের রাজধানী আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধের পর কৈবর্ত্তরাজ ভীম পরাজিত ও বন্দী হন। বিজয়ী সৈন্য মহোল্লাসে কৈবর্ত্ত-রাজধানীর ধ্বংস সাধন করেন। পরাজিত ভীমকে রক্ষার ভার ভিত্তপালের উপর অর্পিত হয়। ভিত্তপাল ভীমকে রাজসম্মানে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরাজিত শত্রুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার ক্ষত্রিয়যুদ্ধনীতিতে পাপ বলিয়া অভিহিত হইত। ভীমের পরাজয় ও বন্দী হইবার পর কৈবর্ত্তরাজবন্ধু হরি হতাবশিষ্ট কৈবর্ত্ত সৈন্য একত্রিত করিয়া রামপালকে আক্রমণ করে। উভয় পক্ষে অতঃপর জীবন-মরণের সময় উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে বঙ্গ হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া বঙ্গের কোনও নিভৃত প্রান্তে রাজ্যাভিনয় শেষ করিতে হইবে জানিয়া পালরাজ এই যুদ্ধে সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। রামপালপুত্র কুমারপাল স্বয়ং সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। অপর পক্ষে কৈবর্ত্তজাতির অধিনায়ক হরি কৈবর্ত্তজাতির প্রাধান্যরক্ষা ও জাতীয় গৌরবের উদ্ধার সাধনে বদ্ধপরিকর হন। কয়েকদিন পর্য্যন্ত ঘোর যুদ্ধ চলিয়াছিল। কুমারপালের দুঃসাহসিকতায় ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। যুদ্ধে কৈবর্ত্তসৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। হরি বন্দী হয়। অনন্তর বধ্যভূমিতে হরি ও ভীমের মস্তক ছেদন করা হয়। কৈবর্ত্তের রাজ্য-পিপাসার এখানেই শান্তি হইয়াছিল। ইহার পর উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত্ত জাতির অভ্যুদয় হয় নাই। কৈবর্ত্তগণ বলেন যে, তাঁহারা মাহিষ্য। ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্যা মাতা হইতে তাঁহাদের উদ্ভব হইয়াছে। উত্তর বঙ্গে ভীমের নাম এখনও লোপ পায় নাই। বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় হইতে একটী বিরাট জাঙ্গাল থানা শিবগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, মিঠাপুকুর, বদরগঞ্জ হইয়া করতোয়াতীরবর্ত্তী খোলাহাটী পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। ইহা এখনও দশহাত প্রস্থ ও চারিহাত উচ্চ হইবে। ইহার মাটী মাত্র এক দিক্ হইতে কাটা হইয়াছে। স্থানে স্থানে এখনও ইহার খাতে জল থাকে। এই জাঙ্গাল আত্মরক্ষার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। সাধারণ লোকে এই জাঙ্গালকে মহাভারতের ভীমের কীর্ত্তি বলিয়া "ভীমের জাঙ্গাল" নাম দিয়াছে। লোকে কৈবর্ত্তরাজ ভীমকে ভুলিয়া গিয়াছে। উত্তরবঙ্গের একজন পরাক্রান্ত নরপতির স্মৃতি এখন একটী জাঙ্গালে রক্ষা করিতেছে।

এই প্রকারে কৈবর্ত্তগণ হইতে লুপ্তরাজ্য উদ্ধার হইলে রামপাল রামাবতী নামে একটী নগর প্রতিষ্ঠা করেন। গঙ্গা ও করতোয়া নদীর সঙ্গমস্থলে বারেন্দ্রভূমিতে এই নগরীর অবস্থান ছিল। শ্রীহট্টের রাজা চন্দ্রেশ্বর ও মোক্ষেশ্বরের সহিত পরামর্শ করিয়া এই নগরীর পত্তন হয়। এই নগরীতে অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধমূর্ত্তির স্থাপনা হইয়াছিল। এখানে কেহ কোনও প্রাণী হত্যা করিতে পারিত না। ইহার নিকটই অপুনর্ভব নামে এক তীর্থ ছিল। বৌদ্ধভিক্ষু শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণগণ দ্বারা এই নগর অধ্যুষিত হইয়াছিল। বহুবিধ হিন্দু দেবদেবীর

মন্দিরে নগরীর শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। রামপাল নামে ঢাকা জেলায় এক গ্রাম আছে। পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা বলেন, ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ প্রথম এখানে আগমন করেন। এই গ্রাম রামপাল প্রতিষ্ঠিত তাহার কোনও প্রমাণ নাই। এখানে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বল্লালসেন নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় এই বল্লালসেনের সময় নির্ণয় করা আছে। রাজা রামপাল উৎকল জয় করিয়া নাগবংশীয় রাজগণকে করদ করিয়াছিলেন। দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত রামপালের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। রামপালের অপর সেনাপতি ময়না কামরূপ জয় করিয়াছিলেন।

রামপাল কবি ও পণ্ডিতগণের সম্মান করিতেন। তাঁহার সভায় অনেক কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। রামপালের মন্ত্রীর নাম বোধিদেব ছিল। এই বোধিদেব যোগদেবের পুত্র। ইঁহারা পালরাজগণের বংশানুক্রমে মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। রামপালের সন্ধি-বিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দী ছিলেন। এই প্রজাপতির পুত্র সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিতের কবি, সুতরাং তাঁহার কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সন্ধ্যাকর নন্দী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। কায়স্থেরা বলেন, তিনি জাতিতে কায়স্থ।

কবি ভদ্রেশ্বর রামপালের রাজবৈদ্য ছিলেন। ভদ্রেশ্বরের পিতামহ দেবগণ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজ-বৈদ্য ছিলেন। ভদ্রেশ্বরের পুত্র সুরেশ্বর রাজা ভীমের সভা হইতে উদ্ভিদ্ বিষয়ে একখানি নির্ঘণ্ট পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই ভীম পরী রাজ্যের রাজা ছিলেন।

রামপাল স্বকীয় রাজ্যভার তাঁহার পুত্র রাজ্যপালের প্রতি অর্পণ করিয়া স্বয়ং রামাবতীতে বাস করিতেছিলেন। রাজ্যপাল বিচক্ষণতা ও সুকৌশলে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। তাঁহার শাসনপ্রণালীতে সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। মুঙ্গের বাসকালে রামপাল তাঁহার বন্ধু মহনের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হন। এই সংবাদে শোকাভিভূত হইয়া রামপাল দেহত্যাগের সংকল্প করেন। ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য ধনরত্ন দানপূর্ব্বক গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া তিনি আত্মহত্যা করেন। রামপালের মৃত্যুর পর শত্রুগণ উৎফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু কুমারপালের বীরত্বে সকলেই শান্তভাব ধারণ করে।

চারিদিকের সামন্তরাজগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেব অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। পালরাজগণের নৌ-বাহিনী ছিল। উত্তরবঙ্গ কেবল কুমারপালের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় নাই। নৌ-শক্তিবলে বৈদ্যদেব বিদ্রোহী-গণকে পরাজয় করেন। সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশে শান্তি স্থাপিত হইলে কুমারপাল বৈদ্যদেবকে পুরস্কৃত করেন, এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন যে, কামরূপাধিপতি স্বাধীন হইবার বাসনা করিয়াছেন। এই সংবাদে উৎসবাদি স্থগিত হইল, বৈদ্যদেব কামরূপ বশে আনিতে প্রেরিত হইলেন। তিগ্মদেব এই সময়ে কামরূপের রাজা ছিলেন। বৈদ্যদেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিগ্মদেব রাজ্যভ্রষ্ট হন।

কামরূপ বিজয়ের কিছুকাল পরে কুমারপালের মৃত্যু হয়। তৃতীয় গোপাল পিতৃ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া কিছুকাল রাজত্বের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। অবশেষে রামপালের দ্বিতীয় পুত্র মদনপাল রাজা হন। গোপালদেবের অকাল মৃত্যুতে পালসাম্রাজ্য শক্তিহীন হইয়াছিল। মদনপালদেব পালসাম্রাজ্যের মহিমা রক্ষার নিমিত্ত কানৌজরাজ চন্দ্রদেবের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। এই সময়ে বঙ্গবীরগণ কানৌজরাজের সাহায্যার্থে চন্দ্রদেবের শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া যমুনার তীরে ভীষণ সমরের অভিনয় করিয়াছিলেন। চন্দ্রদেবের যে সকল খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, ১০৯০ হইতে ১১০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চন্দ্রদেব রাজত্ব করিয়াছিলেন। একখানি খোদিত লিপি তাঁহার রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে খোদিত হইয়াছিল বলিয়া লেখা আছে।

মদনপালদেবের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। শাসনখানি দ্বারা রাজা মদনপাল রামাবতী জয়স্কন্ধাবার হইতে তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে বটেশ্বরস্বামী নামক একজন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তিতে ভূমি দান করিয়াছেন। বটেশ্বর স্বামী মদনপালদেবের প্রধান মহিষী চিত্রমালিকাকে সমগ্র মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। দক্ষিণা-স্বরূপ বটেশ্বর ভূমি লাভ করেন। মদনপালের আর একখানি তাম্রশাসন জয়নগরে পাওয়া গিয়াছে, এই জয়নগর লক্ষ্মীসরাই ষ্টেশনের নিকট। শাসনখানির তারিখ লইয়া গোলযোগ আছে। কেহ ১৪ কেহ বা ১৯ বর্ষ রাজত্বকালে ইহা উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মদনপালের রাজ্য বিহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এই শাসনখানি হইতে তাহা প্রমাণিত হইতেছে। মদনপালের রাজত্বের ১৪শ বর্ষ ১১১৯ খৃষ্টাব্দে। এই সনেই লক্ষ্মণসেনাব্দ আরম্ভ হয়। এই লক্ষ্মণাব্দ এখনও মিথিলায় প্রচলিত আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পালরাজগণের কোনও তাম্রশাসন রাঢ়দেশে (আধুনিক বর্দ্ধমান বিভাগে) পাওয়া যায় নাই।

পালরাজ-তালিকার মধ্যে মহেন্দ্রপাল ও গোবিন্দপালদেবের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু পালরাজগণের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ কি ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। কেবল নামের শেষে পাল শব্দ দেখিয়া তাঁহাদিগকে এক বংশের লোক বলিলে ঠিক হয় না। মহেন্দ্রপালের দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। দুইখানিই গয়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে পাওয়া গিয়াছে। শাসনগুলি মহেন্দ্রপালের অষ্টম বর্ষ ও উনবিংশ বর্ষ রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। গয়াধামে গদাধরের মন্দিরগাত্রে গোবিন্দপালের একখানা প্রস্তরলিপি আছে। এই লিপিখানি ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে খোদিত। উক্ত লিপি পাঠে জানা যায় যে, গোবিন্দপাল ইহার ১৪শ বর্ষ পূর্ব্বে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। তাহা হইলে বলিতে হইবে ১১৬১ খৃষ্টাব্দে পালরাজত্বের বিলোপ সাধন হইয়াছিল। নেপালের কতকগুলি হস্তলিখিত গ্রন্থে ৩৭।৩৮।৩৯ বর্ষ গোবিন্দপালের বিনষ্ট রাজ্যে লিখিত হইয়াছে বলিয়া লিখিত আছে। এই সময়ের সহিত বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয় বিচার করিলে অলীক উপন্যাস বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

মদনপালদেবের একখানা তাম্রশাসনে দেখা যায় তীরাভুক্তি প্রদেশে (মিথিলা) তিনি ভূমিদান করিয়াছেন। মিথিলা তাহার পর হইতে পালরাজগণের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। চেদী সম্রাটের উত্থানের সহিত গাঙ্গেয় ও কর্ণদেব মিথিলা জয় করিয়া চেদীরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। কর্ণাটরাজ চেদীরাজকে সাহায্য করায় মিথিলা কর্ণাটরাজকে অর্পণ করা হয়। নান্যদেব কর্ণাটের প্রথম ভূপতি। নান্যদেবের বংশধরেরা শান্তির সহিত মিথিলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা কখন পালরাজগণকে কর দিতেন, কখন বা চেদীরাজকে কর দিতেন। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে মিথিলার হরিসিংহকে দিল্লীর সম্রাট্ গয়াসউদ্দীন্ টগলকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া জয়লাভ করিতে দেখা যায়। কবিশেখরাচার্য্য যতীশ্বর এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া "ধূর্ত্ত সঙ্গম" নামে একখানা নাটক রচনা করেন। হরিসিংহ নেপাল আক্রমণ করেন। হরিসিংহের বংশধরেরা এই অবধি ১৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নেপালের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন। এই বংশের একজন নরপতির সহিত নেপাল রাজকুমারীর বিবাহ হইলে উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি নেপালের রাজা হন ও নেপালে যাইয়া বসবাস করায় মিথিলা তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়। কামেশ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ এই সময়ে মিথিলা আপনার বশে আনিয়া মিথিলায় রাজা হন। মিথিলার রাজগণ সংস্কৃত সাহিত্যের উৎসাহ দিতেন। মিথিলার সহিত শিক্ষা সম্বন্ধে বাঙ্গালার এক অভিন্ন সম্বন্ধ আছে। নান্যদেব হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা যাইতে পারে। বঙ্গে সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পালরাজগণ ক্রমশঃ বিহারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। গোবিন্দপালের সঙ্গে সঙ্গে পাল-গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী এই রামচরিত কাব্যে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলন করিবার উপাদান রাখিয়া গিয়াছেন। এখন কর্ম্মীর হস্তে পড়িলেই এই সকল উপাদান ইতিহাস আকার ধারণ করিয়া বাঙ্গালার অতীত গৌরব প্রকাশ করিতে পারে।

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।

পদ্মাপুরাণের কবি

নারায়ণদেবের বংশতত্ত্ব।

নারায়ণদেবের কাহিনী আলোচনায় ক্রমশঃ রহস্যময় ও জটিল হইয়া উঠিতেছে। বিস্তৃত বিবরণ দূরে থাকুক, প্রাচীন কবিদের জীবনের সাধারণ বিবরণও বহুকষ্টে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সময় স্রোতের গতিতে সাহিত্যের ও জীবনের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। প্রাচীন কবি জগৎকে কেবল অনাবিল সৌন্দর্য্য উপহার দিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। প্রাচীন সমাজে বোধ হয় কবিদের লুকাইবার স্থান ছিল; তাই তাঁহাদিগকে সহজে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যায় না। সমাজের কোন্ স্তরে কবির জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়া কবিকে গঠন করিয়াছিল, আর কবির জীবন ও সমাজে পরস্পর কি আদান প্রদান চলিয়াছিল, আর কাব্য নির্ম্মাণেই বা ইহাদের সহায়তা কি পরিমাণে উপযোগী হইয়াছিল, প্রাচীন কবিদের জীবন হইতে আমরা এসব তথ্য সহজে উপলব্ধি করিতে পারি না।

প্রাচীন কাব্যের লক্ষ্য ছিল অন্তর্মুখী, আনন্দে তাহার উৎপত্তি, ভাবে তাহার স্থিতি, প্রকাশে তাহার বিকাশ। এই কারণেই বোধ হয় প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে আমরা এক একখানি কাব্যের বহু অনুকরণ দেখিতে পাই। এই কারণেই বোধ হয়, মৌলিক গ্রন্থকার ও পরবর্ত্তী গ্রন্থকার বা কবিদের মধ্যে অগ্র পশ্চাৎ নির্ণয় করা দুরূহ হইয়া দাঁড়ায়। 'অনুকরণ' বলিলে বোধ হয় ঠিক বলা হয় না। 'অনুকরণের' মত, অথচ অনুকরণ নহে, এবম্বিধ একটা চেষ্টা, (যাহাকে আমরা সদৃশ চেষ্টা বলিতে পারি) প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদিগকে একপ্রকার একাধিক গ্রন্থরচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল। এক এক যুগে এক একটা ভাবলহরী আসিয়া সমাজকে নবভাবে স্পন্দিত করে, আর সেই স্পন্দন কবির হৃদয়-বীণায় আঘাত করিয়া নব নব গীত-লহরীর সৃষ্টি করে। আধার ভেদে স্পন্দন-ক্রিয়ার ফলের তারতম্য হয়। সেই তারতম্যানুসারে এক মূলপ্রসূত নব নব কাব্যের সৃষ্টি। মঙ্গল-চণ্ডীর গীতি, মনসাদেবীর গীতি, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান, ভাষা রামায়ণ প্রভৃতির একাধিক কবি ও কাব্য প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্যে ও সমাজে আদৃত হইয়াছে।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, "আমরা কাণা হরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া একুনে ৬১টি মনসাদেবীর গীতি লেখক পাইয়াছি।" শ্রীহট্ট জেলার শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব মহাশয় বলেন যে, তাঁহার স্বকীয় গবেষণার ফলে, তিনি এক শ্রীহট্ট জেলায়ই নাকি ২২ বাইশ জনেরও অধিক মনসাদেবীর গীতিলেখক বা পদ্মাপুরাণের কবির অনুসন্ধান পাইয়াছেন। অথচ আমরা এই সমস্ত কবির জীবনের কাহিনী তাঁহাদের গ্রন্থমধ্যে পাই না। অনেক স্থলে অতি সংক্ষেপে কবির বংশপরিচয়সূচক যে কয়েকটি পংক্তি পাই, তাহাতেও আমরা কবিকে ঠিক ধরিয়া উঠিতে পারি না। কবি

কোন সময়ের লোক ছিলেন, কখন তাঁহার জন্ম ও গ্রন্থরচনা হইয়াছিল, বংশপরিচয় বা জন্মস্থান-পরিচয়, এই সকল তথ্য অনেক কাব্য হইতেই সংগ্রহ করা যায় না। পদ্মাপুরাণের লোকপ্রিয় প্রাচীন কবি নারায়ণদেবের সরস পাঁচালীতে এখনও বাঙ্গালার অনেক স্থান মুগ্ধ। মনসামঙ্গলের কথা প্রাচীন বঙ্গীয় সমাজের ভয় ও বিস্ময়ের, প্রেম ও প্রীতির, ভক্তি ও সরলতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সেই মনসামঙ্গলের কাহিনী নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় চিত্রিত হইয়া বঙ্গীয় সমাজের পুণ্যচিত্র প্রদর্শন করিতেছে। কাহার না জানিতে ইচ্ছা হয় প্রকৃতির কোন নিভৃত অন্তরালে নিপুণ চিত্রকর জন্মগ্রহণ করিয়া স্বকীয় জীবনের চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়াছিলেন? কাব্যের সহিত কবির জীবনের আভাস না পাইলে কাব্যকে সম্পূর্ণরূপে জানা গেল না। যাহার লেখনী হইতে আনন্দধারা ক্ষরিত হইয়া অন্যূন চারিশত বৎসর বাঙ্গালার গার্হস্থ্য ও ধর্ম্মজীবনের রস সঞ্চার করিয়াছিল, সেই কবির সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে কাহার না আকাঙ্ক্ষা হয়? কিন্তু দুঃখের বিষয় কবিজীবনের আমরা বিশেষ কিছু জানি না। প্রাচীন বিভিন্ন হস্ত লিখিত পুথির সাহায্যে যে সমস্ত পরিচয়সূচক ভণিতা আমরা দেখিতে পাই, তাহাও পরস্পর এত বিভিন্ন যে, পার্ব্বত্য নদীর উৎসের অনুসন্ধানের ন্যায়, সত্যানুসন্ধানে অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে হয়। পথ দুর্গম হইলেও উৎস খুঁজিতে যে কৌতূহল হয় তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবে না। সেই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই, সুকবি নারায়ণদেবের জীবনের দু'একটি কথা বলিবার চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে নারায়ণদেবের বংশতত্ত্বের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

নারায়ণ জাতিতে শূদ্র ছিলেন সন্দেহ নাই। তবে কোন শ্রেণীর শূদ্র, তাহা লইয়া মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই সম্বন্ধে নানারূপ উক্তি পদ্মাপুরাণের প্রচলিত হস্তলিপি সমূহে দৃষ্ট হয়; যথা,—

(ক) জন্ম নবীন শূদ্র কায়স্থের ঘর।

(খ) শূদ্রকুলে জন্ম মোর সদা কাহেস্তের ঘর।

(গ) জন্ম লভিলা শূদ্র কায়স্থের ঘর।

(ঘ) ... ... সূত্র কায়েস্তের ঘর।

(ঙ) শূদ্রকুলে জন্ম মোর সৎকায়স্থের ঘর।

(চ) ... ... ক্ষত্র কায়স্থের ঘর।

(ছ) ক্ষত্রকুলে জন্ম সৎকায়স্থের ঘর।

যখন নারায়ণদেবের স্বহস্ত লিখিত পদ্মাপুরাণ পাওয়া যায় না, তখন মূলের কোন্ পাঠটি বিকৃত হইয়া লিপিকর প্রমাদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা স্থির করা কঠিন।

(ক) ও (গ) এই উভয়ে ঐক্য দেখা যায়। শূদ্রকায়স্থের ঘর, ইহাতে কি বুঝায়? কায়স্থ অবশ্য ব্রাহ্মণেতর বর্ণান্তর্গত, সন্দেহ নাই। শূদ্র কায়স্থ, সৎকায়স্থ, ক্ষত্রকায়স্থ এই তিন প্রকার বিভিন্ন পাঠে কি এক অর্থই সূচিত করিতেছে, ইহাই আমাদের আলোচ্য।

শূদ্র কায়স্থ দ্বারা এই বুঝায় যে কবি নীচ জাতীয় শূদ্র ছিলেন না; তিনি যে শূদ্র সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কায়স্থ সমাজেরই অঙ্গীভূত। পরন্তু, সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশীয় ছিলেন না, ইহাই বোধ হয় বলিবার অভিপ্রায়। (ক) চিহ্নিত অংশে, "জন্ম নবীন শূদ্র কায়স্থের ঘর", পাঠে একটু গোল বাধায়। "নবীন" এই পদ বিশেষণ নহে। আমাদের অনুমান হয়, "লভিল" এই ক্রিয়া পদটি বিকৃত হইয়া ক্রমশঃ লভিল, নবিন হইয়া পরে, "নবীন" এ পরিণত হইয়াছে। অনেক প্রাচীন হস্তলিপিতে দেখা যায়,—

"যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকে নাস্তি দূষণং।
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গঃ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥"

(আমরাও 'যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং")। ব্যাকরণাদি ভ্রম থাকিলে, সুধী পাঠক মহাশয় সংশোধন করিয়া লইবেন। মুদ্রাযন্ত্রপীড়িত এই বাঙ্গালা দেশে পাঁচ পাতার একখানি বহি ছাপিলে যখন দুই পাতা শুদ্ধিপত্রে বাজে খরচ করিতে হয়, তখন প্রাচীন পুথির অনুলিপিতে যে লিপিকর প্রমাদ থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? (ছ চিহ্নিত অংশ (ঙ) ও (চ) অংশের অপূর্ব্ব মিশ্রণ।

(খ) "শূদ্রকুলে জন্মমোর সদা কাহেস্তের ঘর।" এই পাঠ, আমাদের বোধ হয়, (ঙ) চিহ্নিত পাঠের (সৎকায়স্থের) বিকার মাত্র। অনেক সময়ে, লিপিকরের শ্রবণ প্রমাদে বা পাঠকের উচ্চারণপ্রমাদে লিপিপ্রমাদ হয়। প্রাচীনকালে সকল পুথিই লেখক স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিতেন এমত বোধ হয় না; একজন পাঠ করিয়া যাইতেন, আর একজন লিখিয়া যাইতেন। এই লিপিকর প্রমাদ গ্রাহ্য না হইলেও, "সদা কাহেস্তের ঘর"—ইহার একটা অর্থ করা যায়। কবি বলিতেছেন যে, তিনি জাতিতে শূদ্র, কিন্তু নিজে কায়স্থ-বংশোদ্ভব; এবং সম্বন্ধাদি সর্ব্বদাই কায়স্থের ঘরে হইত; এই প্রকার ব্যাখ্যা ও নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। (ঙ) চিহ্নিত অংশে "সৎকায়স্থ" পদটি সম্ভ্রান্ত কায়স্থকেই বুঝাইতেছে। এই বিষয়ে রঙ্গপুরের শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় ভিন্ন মতাবলম্বী। নিম্নে তাঁহার একখানি পত্র হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল;—"নারায়ণের 'দেব' উপাধি থাকায় বোধ হয় তিনি মৌলিক কায়স্থ ছিলেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমরা কোন কায়স্থকে 'সচ্ছূদ্র' বলিয়া পরিচয় দিতে শুনি নাই। বরিশাল জেলায় 'সচ্ছূদ্র' বলিয়া একজাতি হিন্দু আছে, তাহারা "খানসামা"র কার্য্য করে, নৌকাও বাহিয়া থাকে। তাহাদের সহিত কায়স্থের কোন সম্বন্ধ নাই। সম্ভবতঃ নারায়ণদেব ঐ 'সচ্ছূদ্র' শ্রেণীর লোক হইবেন।"

(ঘ) এবং (চ) চিহ্নিত অংশে যথাক্রমে "সূত্রকায়স্থ" ও "ক্ষত্রকায়স্থ" পাঠ দৃষ্ট হয়। "সূত্রকায়স্থ" নামে কোন কিছু নাই। কাজে কাজেই ইহা যে লিপিকর প্রমাদের একটি দৃষ্টান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। "ক্ষত্র" শব্দটি বিকৃত হইয়া কি "সূত্র" আকার ধারণ করিয়াছে, না "শুদ্র" শব্দটি 'সূদ্র' হইয়া 'সূত্রে' পরিণত হইয়াছে, ইহাই বিবেচ্য। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় বলেন যে, "ক্ষত্রকায়স্থ" ভ্রমে

"সূত্র কায়স্থ" হইয়াছে। কেদার বাবুর নিকট যে তিনখানা অতি প্রাচীন পদ্মাপুরাণ আছে, তাহাতেও "ক্ষত্রকায়স্থ" লেখা। আমাদের ধারণা অন্যরূপ। আমাদের বিশ্বাস, "শূদ্র কায়স্থ"ই ভ্রমে "সূত্র কায়স্থ" হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। কেন না, প্রাচীন হস্ত লিপিতে (এমন কি বর্ত্তমান সময়ে টানা হাতের লেখায়ও) "ত্র" এবং "দ্র" এতে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। কাজেই "যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং" লিপিকরের ভ্রমেই 'সূদ্র' 'সূত্র' হইবার সম্ভাবনা। / "ক্ষত্রকায়স্থ" হইলে কোন গোলযোগই থাকে না। আমাদের কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয় তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে কথাটা হইতেছে এই যে "ক্ষত্রকায়স্থ" ও "শূদ্রকায়স্থ" এক কিনা। "ক্ষত্রকায়স্থ" এই প্রকার পাঠ প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠ, কায়স্থদিগের ভিতরে তাঁহারাই "ক্ষত্র-কায়স্থ" সংজ্ঞাভাক্। আর যাহারা সমাজের নিম্নস্তরের সাধারণ কায়স্থ শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহারাই "শূদ্রকায়স্থ"। মৌদ্গল্য গোত্রজ নারায়ণদেব কায়স্থ শ্রেণীর কোন স্তরের অন্তর্গত ছিলেন, এই পূর্ব্ব পক্ষের সুমীমাংসা হইয়াছে কি না সন্দেহ। আমাদের দ্বারাও তাহা বোধ করি হইবে না। নারায়ণের জীবনের কাহিনী অনেকটা কুজ্ঝটিকাবৃত। গ্রন্থমধ্যেও কবি স্বীয় জন্মস্থান প্রভৃতির বিশেষ পরিচয় রাখিয়া যান নাই। সুতরাং অনুমানের সাহায্যে অনেকটা ধরিয়া লইতে হয়। সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভব কবি স্বীয় কাব্য মধ্যে পরিষ্কার রূপে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন। দৃষ্টান্ত দ্বিজবংশীদাস। আমাদের অনুমান হয়, নারায়ণের পদ্মাপুরাণে ভণিতার স্থানে স্থানে পশ্চাৎ যোজনা আছে। ইহা ছাড়াও, আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, নারায়ণদেবের বংশ-তালিকায়ও গলদ রহিয়াছে। এবম্বিধ অবস্থায়, বোরগ্রামের বিশ্বাসদের নারায়ণদেবের বংশজ হওয়া দাবী ঠিক কিনা, ইহাই বিবেচ্য।

(১) বোরগ্রামের বিশ্বাসদের আদিপুরুষ কি রাঢ় হইতে আসিয়াছিলেন?

(২) আসিয়া থাকিলে, রাঢ়ের কোন স্থানে তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস ছিল?

(৩) ময়মনসিংহের যে অঞ্চলে তাঁহারা আছেন, তথায় তাঁহারা ভিন্ন রাঢ়ীয় অপর কায়স্থ আছেন কিনা?

(৪) সাধারণ ভাবে কায়স্থ-সমাজের মধ্যে তাঁহাদের স্থান কোথায়?

(৫) দেশে অন্যান্য স্থানে তাঁহাদের জ্ঞাতি আছেন কিনা?

(৬) নারায়ণদেবের সময় হইতে তাঁহার বংশধরেরা কি উপায়ে জীবিকার্জ্জন করিতেছেন?

(৭) তাঁহাদের কৌলিক উপাধি বিশ্বাস কয় বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিতেছে?

(৮) তাঁহাদের ঘরে কি বংশতালিকা পূর্ব্বাবধিই লিখিত হইত?

(৯) বোরগ্রামখানি কত প্রাচীন বসতি?

(১০) বিশ্বাস মহাশয়েরা এখন কয় ঘর? এবং তাঁহাদের সংখ্যা কত? ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

বোর গ্রামের বিশ্বাসদের নারায়ণবংশ হইবার দাবী ঠিক কিনা, এই বিষয় অনুসন্ধান

করিতে যাইয়া শ্রীযুক্ত কেদার বাবুর সহিত আমার পত্র ব্যবহার হইয়াছিল। পত্রাদির মর্ম্ম এ স্থলে প্রকাশ করিতেছি। প্রথম পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "নারায়ণদেবের পিতা-মাতার নাম বংশাবলীর সহিত মিলিয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। ধনপতি, প্রভাকর, নরসিংহ প্রভৃতি/ বিশ্বাসদের বংশাবলীতে আছে। তাহা আমার নিকটে আছে। সম্প্রতি তাহা আলোচনা করিতে পারিব না। আপনি বিরুদ্ধ মতগুলি আমায় জানাইলে 'সৌরভে' তাহার আলোচনা করিতে পারিব।" এই পত্র পড়িয়া খট্‌কা আরও বাড়িয়া যায়। বংশাবলীতে আবার মাতা, মাতামহের নাম থাকে কি করিয়া? তাই কেদার বাবুকে অনুরোধ করিয়া জানাই যে, আমার মত জানাইবার পূর্ব্বে বংশাবলীর একখণ্ড প্রতিলিপির প্রয়োজন। তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। নারায়ণের বংশলতার এক শাখা পাঠাইয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

শ্রীচন্দ্র
|
রামচন্দ্র
|
জগচ্চন্দ্র
|
ভারতচন্দ্র (ইনি জীবিত বয়স ৩০ বৎসর)
|
হরিপদ (জীবিত)

কেদার বাবু বলেন, "এই বংশাবলী শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র বিশ্বাস (২০শ বংশধর) কর্তৃক লিখিত। ইহার পরও দুই তিনখানা আমি তাহাদের ঘর হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম ··· ··· এই বিষয় আলোচনার সময় দেখিব।"

এই শাখা হইতে দেখা যায়, বর্ত্তমান বংশধর নারায়ণদেব হইতে ১৮শ পুরুষ অধস্তন। নারায়ণের পরবর্ত্তিগণের সহিত আলোচনার সম্বন্ধ অতি অল্পই। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ আমাদের আলোচ্য। উদ্ধৃত বংশতালিকা হইতে দেখা যায় যে, নারায়ণদেবের পিতার নাম ছিল নরসিংহ, পিতামহ উদ্ধব, প্রপিতামহ উদয়রাম। নারায়ণদেবের পিতৃপরিচয় নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী কবিতাংশ হইতে পাওয়া যায়,—

(১) নরহরি-তনয় যে নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥

(২) পিতামহ উদ্ধব মোর নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥

(৩) বৃদ্ধ পিতামহ মোর ধনপতি।
পিতামহ হয় মোর অতি শুদ্ধমতি॥
উদ্ধব তনয় হয় নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥

(৪) পিতামহ হয় মোর নাম ধনপতি।

(৫) বৃদ্ধ পিতামহ মোর দেব উদ্ধারণ।
রাঢ় দেশ ছাড়িয়া যে আসিলা আপন॥

(৬) মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী দেবী মাতা॥

(চারুমিহির সংস্করণ)

নারায়ণের পিতা নরসিংহের নামে কোন গোল দেখা যায় না। প্রদত্ত বংশ-তালিকা হইতে দেখা যায় যে, পিতামহের নাম ছিল উদ্ধব। উদ্ধৃত কবিতাংশ হইতে পিতামহের নাম নরহরি, উদ্ধব ও ধনপতি, এই তিন প্রকার দৃষ্ট হয়। প্রপিতামহের নাম বংশ-লতিকায় "উদয়-রাম"। পরিচয়সূচক কোন কবিতাতেই প্রপিতামহের নাম উল্লেখ পাওয়া যায় না। বৃদ্ধ-

পিতামহের নাম "ধনপতি" ও "উদ্ধারণ" বলিয়া উপরে দেখা যাইতেছে। বংশলতা উর্দ্ধে উবয়রাম (প্রপিতামহ) পর্য্যন্ত গিয়াই ক্ষান্ত। বংশ-লতিকায় "ধনপতি" নাম দৃষ্ট হয় না। কেদার বাবু প্রথম পত্রে বলিয়াছিলেন যে, ধনপতি নাম বংশাবলীতে আছে। দ্বিতীয় পত্রে লিখিয়াছেন, "ধনপতি নাম কি বিশেষণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন।" এই ব্যূহচক্র হইতে নির্গমনের কোন উপায় আছে কি না, চেষ্টা করিয়া দেখার প্রয়োজন। উপরি উদ্ধৃত কবিতাংশসমূহে নারায়ণ দেবের পিতৃ-পরিচয়ে বিরুদ্ধভাব থাকিলেও মাতৃপরিচয়ে কোন ভিন্ন মত দেখা যায় না। নারায়ণদেব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই প্রতিপদে একটা সন্দেহের আবছায়া আসিয়া পড়ে। মাতৃ-পরিচয়ে কোন গোল দেখা যায় না, পিতৃ-পরিচয়ে এত গোল কেন? পিতৃ-পরিচয়ে পরস্পর বিবদমান কবিতাংশসমূহে মাতা, মাতামহের নামে সুন্দর ঐক্য দেখা যায়। ইহার কারণ কি? লিপিকরপ্রমাদে যদি পিতৃ-পরিচয়ে গোল হইয়া থাকে, তবে মাতৃ-পরিচয়ে হইল না কেন? পিতা যে নরসিংহ ছিলেন, তাহা নিশ্চিত। কারণ, এই নামে গোল নাই। পিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধপুরুষদের নামেই যত গণ্ডগোল। পিতামহের নাম কি ছিল, কেমন করিয়া বলিব? বংশাবলী কবিতাংশে উদ্ধব আছে বটে; তাহাই যে ঠিক, আর নরসিংহ ধনপতি এই সব নাম যে একেবারে বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহাই বা কি প্রকারে বলিব? লিপিকরপ্রমাদে কি উদ্ধব একেবারে নরহরি হইয়া গেলেন? ✓ ধনপতি নামটি লোকের নাম, ইহা ধনীলোকের জ্ঞাপক, ধন আছে যাহার এই অর্থ,— নহে। যদি ধনপতি দ্বারা আমরা 'ধনী' বুঝি, তাহাতে দোষ আইসে। অর্থসঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। "বৃদ্ধপিতামহ মোর ধনপতি" ইহাতে যদি বুঝায় যে, কবির বৃদ্ধ পিতামহ ধনী ছিলেন, তাহাতে তো বংশ-পরিচয়ের পথ সুগম হইল না। বংশ-পরিচয়ে নাম বা বিশেষ্যের উল্লেখ থাকে, কেবল বিশেষ্যানিম্ন পদ দ্বারা বংশ-পরিচয় হয় না। যদি ইহা বিশেষণবোধক পদ হইত, তাহা হইলে কবি পরবর্ত্তী পংক্তিতে নামটি জুড়িয়া দিয়া ধনী বৃদ্ধপিতামহের নামটি প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। রামচন্দ্র সেন স্বীয় পিতার পরিচয়ে যদি বলে, তিনি উকীল ছিলেন. তাহা হইলে তো তাহার কিছু পরিচয় পাইলাম না। যদি বলে, কৃষ্ণচন্দ্র সেন তাহার পিতা, তবে জানা গেল যে সে অমুকের পুত্র। পরিচয়ে নামীকে আসরে নামায়, অবস্থা বা ব্যবসায়,—পরিচয়ের সহকারী, বিশেষ প্রয়োজন নাই। কবির বৃদ্ধপিতামহ ধনী ছিলেন—তাহাতে কি হইল? এই প্রকার "বড়াই" কোন কবিই বংশ-পরিচয়ে করেন না। অন্ততঃ প্রাচীনকালে করিতেন না। "পিতামহ হয় মোর নাম ধনপতি"। এই প্রকার পাঠে যখন 'ধনপতি' নামক লোকের পরিচয় পাই, তখন পাঠান্তরে, সমভাবযুক্ত কবিতাংশে "ধনপতি" শব্দটি পরিচয়স্থলে পাইয়া, তাহাকে লোকের নাম বলিয়াই গ্রহণ করা স্বাভাবিক।

কবি নারায়ণ দেব কি এমনই নিরক্ষর ছিলেন যে, তিনি প্রপিতামহ ও বৃদ্ধ পিতামহের প্রভেদ বুঝিতেন না? প্রপিতামহের নাম না দিবার হেতু কি? ধরিয়া লইলাম, বৃদ্ধ পিতামহ

ও প্রপিতামহ তিনি এক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তবুও দেখা যায়, নামতঃ বিস্তর প্রভেদ রহিয়াছে। কবিতাংশে দেখা যায় যে, বৃদ্ধপিতামহের নাম উদ্ধারণ। বংশলতায় দেখা যায় যে, ইহা উদয়রাম। বৃদ্ধ উদ্ধারণ দেব যদি রাঢ়দেশ ছাড়িয়া প্রথম ময়মনসিংহের পূর্ব্ব অঞ্চলে আসিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি বংশ-লতিকায় সর্ব্বপ্রথম শ্রেষ্ঠস্থান পাইবার যোগ্য। কিন্তু বংশ-লতিকায় উদ্ধারণ দেবের নাম নাই।

নরসিংহ-নন্দন নারায়ণদেব অনেকেরই পূর্ব্বপুরুষের নাম থাকিতে পারে, কিন্তু, যে নারায়ণ দেবের পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপিতামহ প্রভৃতির নামের সহিত নানা সন্দেহের ছায়া রহিয়াছে, তাহাকেই কি বলিয়া আমরা পদ্মাপুরাণের কবি নারায়ণ দেব বলিয়া সাধারণে প্রচার করিব? হয়, কাণা হরিদত্তের ন্যায়, নারায়ণ দেবেরও বংশ লোপ ঘটিয়াছে, কিংবা কোনও পল্লীর নিভৃত অন্তরালে মর্ম্মরায়মান বেণুকুঞ্জের ছায়ায়, তাঁহার বংশধর অজ্ঞাতভাবে বিরাজ করিতেছেন,—আমরা জানি না।

শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ

স্ত্রী-শিক্ষাপ্রণালীসম্বন্ধে কয়েকটি কথা

এক জীবনে বঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার চারিযুগ দেখিলাম। এখন আমার বয়স ৬৩ বৎসর। প্রথম বয়সে যতদূর মনে পড়ে, বঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার অমানিশা বা অন্ধকার যুগ দেখিয়াছিলাম। তখন মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা একটা ভয়ানক নিন্দার কথা ছিল। এমন কি মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়, এ প্রকার সংস্কারও অনেকের ছিল। যে দেশে এক দিন গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি নারীগণ উপনিষদাদির আলোচনা করিয়া ভারতে ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, খনা ও লীলাবতী জ্যোতিষ ও গণিতের আলোক ছড়াইয়াছিলেন, সেই দেশে এমন সংস্কার কেমন করিয়া দৃঢ়মূল হইয়াছিল, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

ক্রমে দেখিলাম, ভদ্রপরিবারের ১।২টী মেয়ে অতি গোপনে স্বামী বা পরিবারস্থ কোন আত্মীয় বালকের নিকটে কিছু কিছু অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই শুভ উদ্যম কোন প্রকারে প্রকাশ হইলে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সীমা থাকিত না। এইটি স্ত্রী-শিক্ষার অরুণ যুগ। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সূর্য্যের সারথি অরুণদেব নিশার নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে লুকাইয়া যেন সঙ্কুচিত ও সশঙ্কিতভাবে উঁকি মারিতে লাগিলেন।

ক্রমে পূর্ব্ব-গগনপ্রান্ত আরক্তিম হইয়া উঠিল। বেথুন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বিদেশী ও স্বদেশী মহাত্মাগণ স্ত্রী-শিক্ষার অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। মহানগরী হইতে ক্রমে স্ত্রী-শিক্ষার জয়পতাকা লইয়া যজ্ঞাশ্ব চারিদিকে ছুটিল। অনেক যুদ্ধ বাধিল, অনেক বাধা পড়িল; কিন্তু সত্যের জয় হইতে লাগিল। বিদ্যোৎসাহী গবর্ণমেণ্ট, খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ ও দেশীয় শিক্ষিত যুবকবৃন্দ ক্রমে এই মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদানকল্পে আত্মোৎসর্গ করিলেন। সূর্য্য যখন দেখা দিলেন, কার সাধ্য অন্ধকারকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে। অনন্তর উষা-যুগ আরম্ভ হইল। নিতান্ত রক্ষণশীল সমাজের ভিতরেও স্ত্রী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, দূরতম দরিদ্র পল্লীতেও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে চলিল। ক্রমে এমন সময় আসিল, যখন, পূর্ব্বে যে পরিবারে স্ত্রী-শিক্ষায় বৈধব্যের আশঙ্কা ছিল, সেখানেও বিবাহের সময় কন্যার শিক্ষা-বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। সেই সময়ে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে লেখকমাত্রেই লেখনী চালাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি তখন লেখক ছিলাম না, কিন্তু মনে আছে, ছেলেবেলা যখন স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে পড়ি, সহপাঠীদিগের সঙ্গে প্রায় স্ত্রী-শিক্ষার উপকারিতা বিষয়ে রচনা লেখা হইত। তৎকালীন সাহিত্য-জগতে, যিনি লিখিবার কোন বিষয় খুঁজিয়া পাইতেন না, তিনিও এই বিষয়ে কিছু না কিছু লিখিতেন। দেশীয়দের মধ্যে এ বিষয়ে দেশীয়-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মসমাজ বিশেষভাবে অগ্রগামী হইয়াছিলেন।

ক্রমে এমন সময় আসিল; যখন স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতাবিষয়ে আর লেখা বা বক্তৃতার প্রয়োজন থাকিল না। সেটা এক রকম সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইয়া

গেল। অনেক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইতে লাগিলেন। এইটি মধ্যাহ্ন যুগের আরম্ভ। পাঠশালা হইতে মধ্যম শ্রেণীর বিদ্যালয়, উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় ও কলেজ পর্য্যন্ত স্থাপিত হইল। শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী ও লেডী ডাক্তার পর্য্যন্ত হইতে লাগিলেন।

এই সময় স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থক-সভা, বক্তৃতা ও প্রবন্ধের প্রবাহ মন্দগতি হইয়া আসিল বটে, কিন্তু আর একটা আন্দোলনের পথ খুলিয়া গেল। শিক্ষা প্রয়োজন, কিন্তু শিক্ষা-প্রণালী লইয়া আন্দোলন আরম্ভ হইল। পুরুষোপযোগিনী শিক্ষা নারীদিগের পক্ষে উপ-যোগিনী কিনা এই লইয়া মত-ভেদ উপস্থিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত প্রণালী নারী-দিগের উপযোগী কিনা এই প্রশ্ন উঠিল। জ্ঞানকরীশিক্ষার নামে যিনি যত কেন বলুন না, আমাদের দরিদ্র দেশে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য অর্থ। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে পুত্রসন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুত্র বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে, এই আশাও ভূমিষ্ঠ হয়। কন্যাদিগের সম্বন্ধে অবশ্য সে অবস্থা এখনও উপস্থিত হয় নাই, কালে কি হইবে জানি না। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন পুত্রকন্যার এক জাতীয় শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। নারীজীবনের উৎকর্ষ সাধনে ও কর্ত্তব্যপালনোপযোগী শিক্ষা প্রদান তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। যে শিক্ষা-প্রভাবে নারীর নারীত্ব সংরক্ষিত ও একাধারে কন্যার কর্ত্তব্য, ভগ্নীর কর্ত্তব্য, স্ত্রীর কর্ত্তব্য ও সর্ব্বোপরি মাতৃকর্ত্তব্য শিক্ষা করিয়া গৃহে গৃহে প্রেমরূপিণী সেবাদেবীর দিব্যমূর্ত্তি স্থাপিত হইতে পারে, সংক্ষেপতঃ এইরূপ মহান্ ও ওদার ভিত্তির উপর কেশবচন্দ্রের স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু সে আদর্শ অদ্যাপি কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না।

বর্ত্তমান মধ্যাহ্ন যুগে বৎসর বৎসর স্থানীয় গেজেটে পরীক্ষোত্তীর্ণা বালিকা ও মহিলাদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি দর্শনে চারিদিকে খুবই জয়ধ্বনি উঠিতেছে। শিক্ষাবিভাগের রাজপুরুষগণ সুদীর্ঘ রিপোর্টে স্ব স্ব কৃতকার্য্যতার ও লিপিকুশলতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন এবং বায়ুদর্শীর চক্ষে অসভ্য বঙ্গদেশের অচিরে পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্চতম শিখরারোহণের মহাচিত্র প্রতি-বিম্বিত হইতেছে। কিন্তু মধ্যাহ্নের পরেই অস্তের আয়োজন আরম্ভ হয়, বর্ত্তমান বিষয়েও সেরূপ কোন আশঙ্কা আছে কিনা, সেটা আমাদের একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

নারীজাতির উচ্চশিক্ষার আমি সম্পূর্ণ পক্ষপাতী, কিন্তু যে প্রণালীতে এখন উচ্চশিক্ষা দান চলিতেছে, তাহাতে জাতীয় সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্চতম শিখর স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই বা অভ্যুত্থান শীলা বেতস-লতিকার মত টলিয়া পড়িয়া যায়, স্বতঃই এই আশঙ্কার উদ্রেক হয়। বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণ বৈদেশিক। বিদেশীয় কোন বিষয় গ্রহণ করিতে হইলে, তাহা দেশীয় অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া না লইতে পারিলে ঘোর অনিষ্টের আশঙ্কা। বিদেশীয় জীব জন্তু বা উদ্ভিদ এদেশে আনীত হইলে তাহা যদি সম্পূর্ণরূপে এ দেশের জলবায়ু, আলোক ইত্যাদির উপযোগী হইতে পারে, তবেই বাঁচিবে নচেৎ নিশ্চয় মরিবে। এই উপযোগিতা সংঘটনের জন্য নানাপ্রকার কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হয়, ইহা প্রায় সকলেই বিদিত আছেন। নারী-প্রকৃতি প্রেমপ্রধান। পারিবারিক বন্ধনের জন্য স্ত্রী-প্রকৃতি বিধাতার

একটি বিশেষ সৃষ্টি। কন্যা, ভগ্নী, স্ত্রী ও মাতা নারীজীবনের এই চারিটী অবস্থা। যে দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা প্রচলিত, সে দেশের পক্ষে এই চারিটি অবস্থা আরও বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়। এদেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথা থাকা উচিত কিনা, সেটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন, তাহার মীমাংসার জন্য এ প্রবন্ধ নহে। তবে এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, নারীজাতির বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যে দেশে পুত্রকন্যা বিবাহিত হইলেই পক্ষিশাবকের মত অন্য গাছে গিয়া বাসা বাঁধে, সে দেশে কেবল স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলেই নারীজীবনের সার্থকতা সম্পন্ন হয়। এ দেশের নারীধর্ম্ম বড়ই মিশ্রভাবাপন্ন (Complex)। পিতৃকুল, শ্বশুরকুল উভয়কুলের কুকুর-বিড়ালটির প্রতি পর্য্যন্ত যথাযথরূপে কর্ত্তব্যপালন করিতে হইবে। এই কর্ত্তব্য কেবল নীতিমূলক হইলে চলিবে না, প্রেমমূলক হওয়া চাই। নীতিমূলক কর্ত্তব্যপালন নীরস ও কর্কশ, প্রেমমূলক কর্ত্তব্যপালনে রস আছে, মিষ্টতা আছে, সুতরাং কর্ত্তব্যের মূলে স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসা না থাকিলে সংসারে সুখ থাকে না, আরাম থাকে না।

অধিকাংশ স্থলে উচ্চশিক্ষা দিতে হইলে বালিকাকে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ছাত্রী নিবাসে রাখিতে হয়। ছাত্রীনিবাসের স্নেহশূন্য কর্কশ বিধির ভিতরে থাকিয়া স্বতঃই বালিকা হৃদয়শূন্য একটি কলের পুত্তলিকা হইয়া পড়ে। নারীজাতি স্বভাবতঃ প্রেমপ্রবণ হইলেও উপযুক্ত অনুশীলন অভাবে নারীজাতিসুলভ কোমলতা পুষ্ট হইতে পারে না। কোন প্রবৃত্তি উপযুক্ত অনুশীলন ভিন্ন পুষ্ট হয় না। এ অবস্থায় সরলতা, কোমলতা, স্নেহভক্তি ও প্রেম প্রভৃতি নারীজাতির নিজস্ব স্ত্রীধনগুলির পরিবর্ত্তে, বিদেশীয় সাহিত্য-ইতিহাস ও উপাখ্যানের সাহায্যে কতকগুলি বিদেশীয় পারিবারিক ভাব লইয়া কোন শিক্ষিতা মহিলা যদি একটি একান্নবর্ত্তী পরিবারের গৃহকর্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হন, তবে সেই পরিবারে কি ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হইবে! এই প্রকারে নারীত্ব বিনাশকেও নারীহত্যা বলা যায়। হিন্দুশাস্ত্রে নারী-হত্যা মহাপাপ।

আর একটি কথা আরও গুরুতর। ছাত্রীনিবাসটি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য প্রথায় প্রতিষ্ঠিত। যে দেশ সাধারণতঃ খৃষ্টবাদীর দেশ, যে দেশের রাজা-প্রজা সাধারণতঃ সকলেই খৃষ্টবাদী সে দেশে ধর্ম্মসম্বন্ধে রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা প্রয়োজন না হওয়াতে সমুদায় ছাত্র বা ছাত্রীনিবাসে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এদেশে সচরাচর সে ব্যবস্থার সুবিধা নাই। এই বিভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত দেশে বাধ্য হইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ শিক্ষা-নীতি অনুসরণ করিতে হয়। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েই ধর্ম্মবিশ্বাস সাধারণতঃ স্ত্রীজাতির মধ্যেই প্রবল।

নারীজাতিই পরিবারের ধর্ম্মরক্ষার প্রধান সহায়। যে গৃহে প্রাচীনা গৃহিণী বর্ত্তমান আছেন, সেই গৃহই এ কথার প্রমাণ। অধুনাতন নিরীশ্বর বিদ্যালয়ের সংযুক্ত নিরীশ্বর ছাত্রী নিবাসে নিরীশ্বর-শিক্ষা ও সংসর্গের প্রভাবে ভাবী গৃহিণীগণ ধর্ম্ম বিশ্বাস হারাইবেন, ইহা অবশ্যম্ভাবী। এই প্রকারে ধর্ম্ম ও প্রেম হারাইয়া আসিয়া তাঁহারা যে সংসার পাতিয়া বসিলেন, সে সংসারের

পরিণাম ভাবিতেও ভয় হয়। আবার সেই প্রকারের সংসারের সমষ্টিতে যে জাতি, তাহার দুর্দ্দশা একবার ভাবুন।

এস্থলে নব্য সভ্যতাভিমানী কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, স্নেহ-মমতা প্রেমপ্রণোদিত সেবা-পরায়ণতা ও ধর্ম্মভাব এ সমস্তই হৃদয়ের একটা ভাবমাত্র। বাহুল্যের ভয়ে তাঁহাদিগকে একটি মাত্র প্রশ্ন করি। এই জড়বাদ-প্রধান নব্য সভ্যতায় তো দয়া, ধর্ম্ম প্রভৃতি ভাব বলিয়া উপেক্ষিত হয়. কিন্তু বিধাতার এই বিশাল জীব-জগৎ সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে কি এই হৃদয়ের কোমল ভাবগুলির কোন আবশ্যকতা নাই? পিতৃমাতৃস্নেহ ভিন্ন কোন্ জীব জগতে তিষ্ঠিতে পারিত? ইতরপ্রাণীর ভিতরে যে স্বর্গের রত্ন আসিয়া সাধকের জন্য যে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দিবানিশি দেখাইছে, সেই অমূল্য রত্নই কি পাত্রভেদে নানা নামে নানা ভাবে মানব-পরিবারের প্রসারণ, পালন ও রক্ষণ-সাধন করিতেছে না? কোন্ মাতা বিচার করিয়া সন্তানকে স্তন্য-দান করেন? কোন্ ভ্রাতা বিচারে মীমাংসা করিয়া নিরাশ্রয়া ভগ্নীকে আশ্রয় দান করেন? কোন্ স্ত্রীর পতিসেবা বিচার-সাপেক্ষ? এক কথায় বলিতে হইলে, কোন পরিবার বা সমাজ বিচারের বা জ্ঞানের বা কেবলমাত্র স্বার্থের ভূমিতে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে?

তথাপি পাশ্চাত্য-সভ্যতার জড়োন্মত্ততার ভয়ে সেবা, কর্ত্তব্য, প্রেম, ধর্ম্ম এ সব কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের দোহাইতো তাঁহাদের মানিতেই হইবে। সেখানে তো আর ভাব বলিয়া উপেক্ষা করা খাটিবে না। অতএব দেখা যাউক, বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষা-প্রথাসম্বন্ধে বিজ্ঞান কি বলে? এবার অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান ভুলিয়া গিয়া জড়বিজ্ঞান বিশেষতঃ শারীর-বিজ্ঞানের আলোকে এদেশের স্ত্রী-শিক্ষা নীতি আলোচনা করা যাউক। আমাদের মতে আধ্যাত্মিক, মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক উন্নতির সমন্বয়-সাধন শিক্ষার ও মানবজীবনের উচ্চতম লক্ষ্য। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটী ছাড়িয়া দিলে বাকী থাকে শারীরিক উন্নতি। বর্ত্তমান জড়বাদের মতে শরীরের স্বাস্থ্য ও শক্তি পার্থিব সকল প্রকার উন্নতির মূল। শরীর ভাল না থাকিলে অন্য প্রকারের উন্নতি সত্বেও সমাজের কোন উপকার সাধন করা দূরে থাকুক, বরং সমাজের গলগ্রহ হইতে হয়। দুর্ব্বল রুগ্ন ব্যক্তি গৃহের জঞ্জাল, সমাজের জঞ্জাল। শুধু জঞ্জাল নহে, সমাজের অনিষ্টকারী। এই প্রকার পিতামাতার সন্তানগণ বংশাবলীক্রমে পরিবারের ও সমাজের দারিদ্র্য ও অশান্তি বৃদ্ধি করে। এইজন্য অনেক দেশে চিররুগ্নের বিবাহ নিষেধ। এমন কি অনেক প্রাচীন সভ্যদেশেও বলিষ্ঠ পুরুষ ও সুন্দরী কন্যা ভিন্ন বিবাহ হইতে পারিত না।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে নারীজাতির মধ্যে, মধ্যে মধ্যে বিদুষী নারীর উল্লেখ থাকিলেও, স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ ব্যবহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যুদ্ধ প্রভৃতি Technical Education এর কি প্রকার প্রণালীবদ্ধ ব্যবস্থা ছিল, তাহা আমরা অবগত নহি এবং তাহা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও নহে। সাধারণ শিক্ষা-সম্বন্ধে যত-দূর জানি তাহাতে মনে হয়, তাৎকালিক শিক্ষায় শারীরিক উন্নতির কোন ব্যাঘাত ঘটিত না।

এ প্রকার শিক্ষা এখন সচরাচর প্রায় ঋষিদিগের আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় সম্পন্ন হইত। পুরাণাদিতে যতটুকু দেখা যায়, তাহাতে বুঝা যায়, ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় বালকদিগকে গুরুগৃহে থাকিয়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যের ন্যায় গুরুর সমুদয় গৃহকার্য্যে সাহায্য করিতে হইত। তাহাতে জ্ঞানাদি শিক্ষার সঙ্গে যেমন আধ্যাত্মিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি হইত, তেমনি শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা শারীরিক উন্নতিও সাধিত হইত। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী সেরূপ নহে, হইতেও পারে না, কিন্তু বালকদিগের শারীরিক উন্নতির পথ কথঞ্চিৎ পরিষ্কার আছে। তাহারা স্বাধীন ভাবে মুক্ত বায়ুতে বেড়াইতে পারে, নানাপ্রকার ক্রীড়াদিতে মন ও দেহের উন্নতির অবসর পায়। বালিকাদিগের সে সুযোগ কোথায়? পল্লীগ্রামের পথে বা নদীতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে যে সকল গৃহকার্য্য-তৎপরা কৃষক-বালিকা ও যুবতী দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের সুস্থ সবল দেহ ও সরল স্বাভাবিক হাসিমাখা মুখ কি বিদুষীদিগের মধ্যে সহসা দৃষ্টিগোচর হয়? নগরে ও মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহে বালিকা ও যুবতীগণ স্বহস্তে রন্ধনাদি যাবতীয় গৃহকার্য্যে ও সেবায় যথেষ্ট পরিশ্রমের সুযোগ প্রাপ্ত হন। যে পাশ্চাত্য প্রণালীতে এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, উল্লিখিত প্রণালীতে স্ত্রীজাতির অবরোধ-প্রথা নাই। সে দেশের মহিলাগণ অবাধে মুক্তবায়ুতে ভ্রমণ, ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, সন্তরণ প্রভৃতি নানা প্রকারের শারীরিক পরিশ্রমের সঙ্গে মনের প্রফুল্লতা সাধনের সুযোগ পান। যে প্রথা যতই মঙ্গলজনক হউক না কেন, তাহা দেশের অন্যান্য প্রথার উপযোগী করিয়া গ্রহণ না করিলে তাহা সম্পূর্ণ মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না, একদেশদর্শিতা কখনও সুফলপ্রদ হয় না। এদেশের অবরোধ-প্রথার সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া না লওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালীগত স্ত্রীশিক্ষা আমাদের বংশাবলী ক্রমে অমঙ্গল সংঘটন করিতেছে। বিদ্যালয়ের ও নিজ নিজ সুখ্যাতি-লোলুপ শিক্ষকদিগের শাসনাধীনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিলোলুপা মহিলাগণ নারীজাতির অবশ্য জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য সকল শিক্ষা অগ্রাহ্য করিয়া মনের ও হৃদয়ের বৃত্তিগুলিকে পদদলিত করিয়া ও শারীরিক উন্নতি সাধনের সুযোগে বঞ্চিত হইয়া আশৈশব অসূর্য্যম্পশ্য গৃহকোণে রুদ্ধ বায়ুতে বসিয়া কেবলই আত্মনাশের ও বংশনাশের যে আয়োজন করিতেছেন, সে বিষয় আমাদের সকলেরই একবার ভাবিয়া দেখা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষিতা মহিলাদের যদি একটা স্বাস্থ্যানু-যায়ী সংখ্যা গণনা করা যায়, অশিক্ষিতা ভগ্নীদের তুলনায় তাঁহাদের অবস্থা ইতিমধ্যেই কি ভয়ানক হইয়াছে, বুঝিতে পারা যাইবে। এই সকল মহিলা প্রায় সমাজের উচ্চ শ্রেণীর। ইহাঁদেরই বংশাবলী সমাজের ও দেশের মুখোজ্জ্বল করিবেন। বংশাবলীক্রমে যাঁহারা বলবীর্য্যে স্বাস্থ্যাদিতে পরম্পরাক্রমে হীন হইতে হীনতর অবস্থার দিকে সবেগে ধাবিতা, সেই জীর্ণাশীর্ণা চিররুগ্না জননীর ক্রোড়ে হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ দীর্ঘায়ু বালক-বালিকা আশা করিতে হইলে, সমস্ত শারীর-বিজ্ঞানকে ভস্মীভূত করিতে হয়। জীবনের হ্রস্বতা, দেহের খর্ব্বতা, ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা এবং স্বাস্থ্যের হীনতা যে দ্রুতবেগে আমাদিগকে পৃথিবীর ইতিহাস হইতে মুছিয়া ফেলিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা স্ত্রী-শিক্ষার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী, কিন্তু বর্ত্তমানে যে প্রকারে এ শিক্ষা চলিতেছে, সেই প্রণালীটি সম্বন্ধে সকলেরই চিন্তা করা প্রয়োজন। এক সময় যেমন স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা লইয়া মহা আন্দোলন চলিয়াছিল, এখন আবার স্ত্রী শিক্ষার প্রণালী লইয়া সেই প্রকার বা ততোধিক আন্দোলনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা দেশের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, সেই সকল মহাত্মারা ও শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ শীঘ্র একটা মধ্যবর্ত্তী পথ আবিষ্কার না করিলে শীঘ্রই দেশের সর্ব্বনাশ হইবে।

পেটের দায়ে বালকদিগকে নিরীশ্বর শিক্ষা দিয়া যদি চ ভারতের মহাগৌরবের ও চির আদরের ধন ধর্ম্মরত্নকে তাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাতেও দেশের তত ক্ষতি হইত না, যদি প্রতি গৃহে ধর্ম্মপ্রাণা বিশ্বাসভক্তিভূষিতা গৃহলক্ষ্মী দৃঢ়ভাবে কর্ণ ধরিয়া বসিয়া থাকিতেন। কিন্তু চিরকাল সকল দেশে যাঁহারা প্রেমভক্তি-বিশ্বাসে পুরুষদিগকে পরাস্ত করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা যদি আজ নিরীশ্বর শিক্ষার দোষে নাস্তিক হইয়া বসেন, তবে আর দেশের আশা ভরসা কোথায়? ফলতঃ দেশে ধর্ম্মনীতি, একান্নবর্ত্তী-পরিবারপ্রথা ও অবরোধ প্রথা রক্ষা করিতে হইলে স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী তদুপযোগী করিয়া লইতে হইবে, নচেৎ অবরোধ প্রথা একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা, ধর্ম্ম ও নীতিকে দেশ হইতে বিদায় দিতেই হইবে। ফলতঃ আমাদিগকে দুদিক রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। স্ত্রী-শিক্ষাও ছাড়িতে পারি না। সহসা একান্নবর্ত্তী পরিবার বা অবরোধপ্রথাও পরিত্যাগ করা সম্ভবপর নহে। এ অবস্থায় উভয় দিকের একটা সামঞ্জস্য সাধন ভিন্ন আমাদের নিস্তার নাই।

অতএব দেশের বিদ্বন্মণ্ডলী, সমাজনেতা ও সংস্কারকগণ, স্বদেশ-প্রেমিকগণ ও শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষবৃন্দ দয়া করিয়া এদিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন, জাগিয়া উঠুন এবং এই বিষম সমস্যার সময় একটা মধ্যপথ আবিষ্কার করিয়া দেশে পারিবারিক শান্তি স্থাপন করুন, ঘরে ঘরে ধর্ম্ম-বিশ্বাস-প্রেমভক্তি-পরায়ণা স্ত্রী ও জননী দিয়া বর্ত্তমান ও ভাবী বংশের চরিত্র গঠনের পথ প্রশস্ত করুন ও দেহের স্বাস্থ্য ও শক্তি দিয়া বর্ত্তমানে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভের ও ভবিষ্যতে সুস্থ বলিষ্ঠ বংশ রচনার উপায় বিধান করুন।

শ্রীবিপিনমোহন সেহানবীশ (রায় সাহেব)।

উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য-তত্ত্বানুশীলন।*

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে আমার চিরসুহৃৎ সোদরপ্রতিম স্বর্গীয় কিশোরীমোহন রায় পাবনা জেলার স্বাস্থ্য-বিবরণসম্বন্ধে আমাকে কিছু বলিবার জন্ত অনুরোধপূর্ব্বক অধিশেনের দ্বিতীয় দিবসে সভাপতি মাননীয় মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের নিকট এক প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়ের স্বল্পতা-নিবন্ধন, পরন্তু অন্ত কোন বিশিষ্ট-বক্তার শ্রুতিসুখকর বক্তৃতা শুনিবার জন্য অধিক সময়ের প্রয়োজন মনে করিয়া সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

সাহিত্যের কুঞ্জকাননে দেশের সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোকের অপ্রীতিকর আলোচনা আপাত-বৈষম্যের সৃষ্টি করিতে পারে। যেখানে পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি গভীর গবেষণামূলক শিক্ষাপ্রদ বিষয়সমূহের আলোচনা হইবে, সেখানে দুই দশটী জেলার স্বাস্থ্য-বিবরণের আলোচনা কাহারও কাহারও মতে সময়ের অপচয় মনে হইতে পারে।

কিন্তু কথায় বলে, "যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত।" আমি যশোহরের অধিবাসী, আমার জন্মভূমি যশোহর। বিগত পঞ্চবিংশ বর্ষের মধ্যেই আমার জন্মভূমির পল্লী-সমূহের যে শোচনীয় চিত্র অবলোকন করিয়াছি, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ধ্বংসমান পল্লীসমূহের যে শ্রীহীনতা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাতে হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের পর গ্রাম প্রায় জনশূন্য, সুবৃহৎ অট্টালিকাসমূহ পরিত্যক্ত, ভীষণ অরণ্যানী পরিবেষ্টিত, জীর্ণগৃহে কোথাও একটি নিরাশ্রয়া বিধবা অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ বাস্তুভূমির স্নেহ-মমতা বক্ষে লইয়া কালের প্রতীক্ষা করিতেছেন, কোথাও পরিত্যক্ত গৃহ সর্পাদি হিংস্রজন্তুর বাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে, আবার কোথাও বা শত শত নর-নারী বালক-বালিকার আনন্দ-কোলাহল, নিত্যমুখর বাসভূমির শেষ নিদর্শন গৃহভিত্তি, কৃষকের হলমূলে বিদীর্ণ হইয়া ব্যথিতের দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। প্রতি দশ বৎসরে আমার জন্মভূমির— আমার স্বজেলার পঞ্চসপ্ততি সহস্র নর-নারী, বালক-বালিকা হ্রাস পাইতেছে। বোধ হয় প্রকৃতির অনৈসর্গিক পরিবর্ত্তন না হইলে অনুমান এক শতাব্দীর মধ্যে আমার স্বজেলা বিজন সুন্দরবনে পরিণত হইয়া ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্বানুসন্ধানকারিগণের গবেষণার সহায়তা করিবে।

বিগত সার্দ্ধবর্ষাধিককাল আমি উত্তরবঙ্গের অন্ততঃ দুইটি জেলার স্বাস্থ্য-তত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু না কিছু আলোচনা করিয়াছি। এই আলোচনার ফলে মনে হইয়াছে, আমার নিজের জেলার পল্লীসমূহের যে শ্রীহীনতা—যে শোচনীয় চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছি, উত্তরবঙ্গের

---

* অষ্টম উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের রাজসাহী অধিবেশনে পঠিত।

কথা দূরে থাকুক, বঙ্গদেশের অধিকাংশ জেলায় উল্লিখিত চিত্রের বাস্তবতা উপলব্ধি করা নিতান্ত দুর্লভ নহে।

উত্তরবঙ্গসম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বিস্তৃত প্রত্যক্ষমূলক, এ কথা আমি কখনই স্বীকার করিতে পারি না। সুতরাং আমার আলোচনা ভ্রমপ্রমাদমূলক না হইবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। যাঁহারা উত্তরবঙ্গের অধিবাসী, উত্তরবঙ্গের জল-হাওয়ায় যাঁহাদিগের আশৈশব জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, উত্তরবঙ্গের শস্য-সম্পদ যাঁহাদিগকে স্তন্যদায়িনী জননীর ন্যায় সুখ-স্বাস্থ্য প্রদান করিয়াছে, যাঁহাদিগের পিতৃ-পিতামহের ও পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি-কাহিনীর প্রোজ্জ্বল নিদর্শন এখনও উত্তরবঙ্গের গৌরব সম্পাদন করিতেছে, আমার আলোচনার ফলে তাঁহাদিগের অন্ততঃ এক জনেরও দৃষ্টি এ দিকে পতিত হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিব।

উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলার মধ্যে রঙ্গপুরের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা কিছু দীর্ঘ-কালস্থায়ী। এই রঙ্গপুরের কোন পল্লীগ্রামে আমাকে কিছুকাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। আমার কোন সাহিত্যিক বন্ধুর এবং গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণের মুখে শুনিয়াছি, এই গ্রামটি এক সময়ে বহুজন-অধ্যুষিত ছিল। এখানে কামারের ভিটা, ওখানে ধোপার ভিটা, অন্যস্থানে পরামাণিকের বাড়ী ইত্যাদি কতই দেখিলাম। এখন এই গ্রামটিতে এক জনও বাঙ্গালী ধোপা দেখিতে পাওয়া যায় না, কর্ম্মকারের চিহ্নও বিলুপ্ত হইয়াছে, পরামাণিক দুই এক ঘর বিদ্যমান আছে, ইহাই গ্রামটির বর্ত্তমান ইতিহাস। রঙ্গপুরেও দেখিয়াছি, পরামাণিক ও ধোপার কার্য্যে আজকাল স্থানীয় লোক এক প্রকার পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। এখন স্বতঃই প্রশ্ন হইতে পারে, অতীতের এই সমস্ত বিভিন্ন জাতির বিলুপ্তির হেতু কি?

স্বীকার করিতে হইবে, আরব্য-উপন্যাসের প্রসিদ্ধ বণিক সিন্ধাবাদের স্কন্ধে বৃদ্ধ দৈত্যের ন্যায় ম্যালেরিয়া ও কলেরা বাঙ্গালার পল্লীভূমিসমূহের স্কন্ধে স্থায়ী বাসভূমি নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে বাঙ্গালার অনেকগুলি জেলা ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। রঙ্গপুর হইতে প্রকাশিত "রঙ্গপুরদর্পণ" নামক সাপ্তাহিক-পত্রে প্রকাশ, বর্ত্তমান বর্ষে সমগ্র রঙ্গপুর জেলায় ম্যালেরিয়া যেরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে, বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে এরূপ ভীষণ প্রকোপের কথা জানিতে পারা যায় নাই। আমরা এ স্থলে জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের উক্তি লিপিবদ্ধ করিতেছি।—"বর্ষার প্রারম্ভ হইতে রঙ্গপুরে এবার ম্যালেরিয়া যেরূপ ভীম-বিক্রমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে এমন আর কখনও লক্ষিত হয় নাই। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত নর-নারীর রোগ-যন্ত্রণাক্লিষ্ট আর্ত্তনাদে রঙ্গপুরের শান্তি-নিকেতন পল্লীভবনগুলি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক গৃহে ঔষধ-পথ্য—অধিক কি একবিন্দু জল প্রদানের লোক পর্য্যন্ত ছিল না। রঙ্গপুরের পল্লীগ্রামগুলিতে প্রকৃত সুচিকিৎসকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। সুতরাং * * রঙ্গপুরের পেটেন্ট ঔষধ ব্যবসায়িগণের এ বৎসর

সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। * * * আমরা কোন ক্ষুদ্র পল্লীর সামান্য একজন দোকানদারকে দৈনিক গড়ে ৭০৲ টাকার পেটেন্ট ঔষধ বিক্রয় করিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি।"

উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলা-সম্বন্ধে যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহাতে উপলব্ধি হয়, বিগত বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান বর্ষে উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। নিদাঘের অন্তে বর্ষার ঘন বারিপাতের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষতঃ হেমন্তঋতুর প্রারম্ভে বাঙ্গালাদেশে ম্যালেরিয়া প্রকট মূর্ত্তিতে দেখা দেয় এবং অসংখ্য নর-নারী বালক-বালিকার জীবন হরণ করে। এ বৎসর নিয়মিত কালের অনেক পরে উত্তরবঙ্গের অনেক স্থানে প্রকৃতভাবে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছিল, অসময়ে অনিয়মিত বর্ষণের ফলেই সর্ব্বত্র রোগের প্রখরতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিগত ১৯১৩ ও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে উত্তর বঙ্গের কোন্ জেলায় কত লোকের জ্বরে মৃত্যু হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদান করিলাম। রেখার উর্দ্ধস্থিত সংখ্যা গতপূর্ব্ব বর্ষের এবং নিম্নস্থিত সংখ্যা বিগত বৎসরের মৃত্যুহারজ্ঞাপক বুঝিতে হইবে,—

		সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর
রাজসাহী	২৯০২ ৩৭৬৫ +২২	৩৭৭৩ ৩৬৪৯ +২১	৩৭৪১ ৪২৫০ +২৪	৪১৪৭ ৫৪২৯ +৪৮
দিনাজপুর	৩০৫০ ৪২৮১ +৮	৪৮৯৭ ৪৮৭৭ +৩	৪৮৬২ ৫৩৯৬ +৫	৫৬১৩ ৬৫৭৯ +৯
জলপাইগুড়ী	১৯১৮ ১৯২৭ +১১	২৫১৫ ১৭৮৮ +১১	২২০৭ ২৩৯৭ +১৪	২৬৬৬ ২৭৬৮ +১২
দার্জ্জিলিং	৬৪৬ ৬৪১ +১৭	৭৭৬ ৫৫০ +২০	৬৩৪ ৬৬৪ +১৯	৬৮৮ ৫৫০ +১৭
রঙ্গপুর	৩৩৬৩ ৫৬৩০ +১১	৫৩১৩ ৫৫২৪ +১৮	৪৫৫০ ৮১৯৬ +১৬	৫৬৮৯ ৯১৯৫ +১৪
বগুড়া	১৩৪৮ ২৫৮০ +১৪	১৭৯৯ ২০০০ +৬	১২৩৪ ২২২৬ +১১	১৬৪২ ২৮৪৫ +২১
পাবনা	১৭৬৩ ৩৩২৫ +১৯	২৮৩৪ ২৯৩২ +১০	১১৭১ ৪৩৩১ +২২	৪৭৩৭ ৫৬০১ +৪৭
মালদহ	১৯৯২ ২১৪১ +৩৯	২৮৬৯ ২৭১১ +৩৩	২৮৪৪ ৩১৮২ +৫৩	৩১৪৭ ৫৫২৮ +১৩৪

স্থূলভাবে বিগত ১৯১৩ ও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট, সেপ্টেম্বর অক্টোবর ও নবেম্বর এই চারিমাসে সমগ্র উত্তরবঙ্গে কত নর-নারী, বালক-বালিকা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর
১৯১৩	১৬,৯৮২	২৪,৭৯৬	২৩,৩৪৪	২৮,৩২৯
১৯১৪	২৪,২৯০	১৪,৬৪৬	৩০,৬৪২	৩৮,৪৯৫
	+	+	+	+
	১৪১	১২২	১৬৪	৩০২

সমগ্র উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত উল্লিখিত জেলাসমূহের গ্রামের সংখ্যা ৩৯,০০১, উহার মধ্যে ৩৩,৫৬২ খানি গ্রাম হইতে বিগত বর্ষে ম্যালেরিয়াজনিত মৃত্যুর সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমান বর্ষে উল্লিখিতরূপ ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত গ্রামের সংখ্যা যে বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বেশ অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কোন জেলার কত গ্রামে এইরূপ ম্যালেরিয়া বিস্তার লাভ করিয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহার তালিকা প্রদান করিলাম ;—

জেলা	গ্রামের সংখ্যা	যত গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।
রাজসাহী	৬,৬৭২	৬,৫০৩
দিনাজপুর	৯,৬৫৯	৭,২০০
জলপাইগুড়ী	২,১২১	২,০৭৭
দার্জ্জিলিঙ্গ	৫০৬	৪২৫
রঙ্গপুর	৭,৪৪১	৬,৬৫৫
বগুড়া	৩,৬২০	২,৮০৯
পাবনা	৪,২৯৬	৪,০৩২
মালদহ	৪,৬৮৬	৩,৮৬১
মোট	৩৯,০০১	৩৩,৫৬২

কিন্তু আশার কথা এই যে, বিগত ১৯০৮ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের তুলনায় বিগত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর মধ্যে একমাত্র রাজসাহী বিভাগে ম্যালেরিয়াজনিত মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। আমরা নিম্নে 'বিভিন্ন বিভাগের ম্যালেরিয়া-জনিত মৃত্যুর হার প্রদান করিলাম।

বিভাগের নাম	প্রতি সহস্র অধিবাসীর মধ্যে যত জনের মৃত্যু হইয়াছে।		
	১৯১৩ খৃঃঅব্দ	১৯১২ খৃঃঅব্দ	১৯০৮—১৯১২ খৃষ্টাব্দের গড়
রাজসাহী	২৬'৬৫	২৮'০৬	২৮'৩৭
বর্দ্ধমান	২২'৯৬	২২'৩৩	১৯'১৩
প্রেসিডেন্সী	২০'১৫	২০'৭৪	১৮'৪৯
চট্টগ্রাম	১৯'২১	১৭'৭৯	১৮'৯১
ঢাকা	১৭'৪৩	১৬'২৪	১৬'৯১

কিন্তু "কুমীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া জলে বাস", আর ম্যালেরিয়ার সহিত সংগ্রাম করিয়া বঙ্গদেশে নিরাপদে অবস্থান একই কথা মনে হয়। কতকাল ধরিয়া এই দারুণ ব্যাধি বাঙ্গালীর রক্ত মাংস শোষণ করিতেছে, ইতিহাসে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে ইহা নিশ্চয়, বিগত কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দীর মধ্যেই এই দারুণ ব্যাধি "সোণার বাঙ্গালা" ছারখার করিয়াছে।

মেডিকেল কলেজের ম্যালেরিয়া-তত্ত্বানুসন্ধান-বিভাগের সুবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম, এ মহাশয় বিগত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের "Indian Medical Gazette" নামক পত্রে লিখিয়াছেন,—"The study of contemporary Bengali literature affirms that Malaria in epidemic form was unknown in Bengal before the Burdwan epidemic", অর্থাৎ অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বের বাঙ্গলা-সাহিত্য পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বর্দ্ধমানে ম্যালেরিয়া সংক্রামকভাবে দেখা দিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কুত্রাপি ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপ পরিলক্ষিত হইত না। কিন্তু এই উক্তি আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজ-পত্র দেখিলে বুঝা যায় যে, সে সময়ও কলিকাতা ও বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে ম্যালেরিয়া ছিল।" উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার মধ্যে রঙ্গপুর পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্ব্বেও ম্যালেরিয়ার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, এমন কি লোকে রঙ্গপুরকে "যমপুর" বলিত। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, বাঙ্গালার সুবাদারের নিযুক্ত ফৌজদারগণ যৎকালে রঙ্গপুরে অবস্থান করিতেন, তৎকালে রঙ্গপুরের স্বাস্থ্য নিতান্ত ভাল ছিল না, এবং এই কারণে তৎকালে ফৌজদারগণের অনেকে একাদিক্রমে বহুকাল রঙ্গপুরের শাসনকার্য্য পরিচালন করিতে পারেন নাই। ইহা ১০৯৪ হইতে ১১২০ খৃষ্টাব্দের কথা। ভারতবর্ষের গবর্ণর মারকুইস অব্ ওয়েলেস্‌লি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে, ঐ সময়ে মুর্শিদাবাদ ঘোর অস্বাস্থ্যকর ছিল। বহরমপুরস্থিত সৈনিকাবাসের সৈন্যেরা প্রায়ই ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিত। ডাক্তার ইলিয়ট বলেন, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে এই জ্বর প্রথমতঃ যশোহরে দেখা যায়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহা গঁদখালিতে মহামারী আকারে প্রকাশ পায়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এই জ্বর বনগ্রাম ও চাকদহে প্রকট মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইহারই প্রকোপে উলাগ্রাম

উৎসন্ন হয়। পরবর্ত্তী বৎসর এই জ্বর, কাঁচড়াপাড়া, হালিসহর, নৈহাটী, ত্রিবেণী ও অন্যান্য স্থানে বিস্তৃত হয়।

অতঃপর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এই মহামারী অতি প্রবলবেগে বর্দ্ধমান সহরে দেখা দেয়। অতঃপর ইহার লীলাক্ষেত্র অতিশয় বিস্তীর্ণ হয়। দক্ষিণে দ্বারবাসিনী, পশ্চিমে কাটোয়া, উত্তরে মেহেরপুর, পূর্ব্বে বারাসত, গোবরডাঙ্গা, ইচ্ছাপুর এবং ক্রমে ক্রমে দিনাজপুর, রঙ্গপুর হইয়া সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলে। পঞ্জাবেও ম্যালেরিয়া প্রকট মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। আজ সমস্ত ভারতময় ম্যালেরিয়া। অধুনা ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর ১৭ লক্ষের অধিক নর-নারী, বালক-বালিকা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে, এক শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের যে সকল জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আদৌ পরিলক্ষিত হইত না, এক শত বৎসরের মধ্যেই সেই সকল স্থান ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। অধিক দিনের কথা নহে, বিগত ২৭এ জানুয়ারী তারিখের "কলিকাতা বজেট" নামক ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত "The Provincial outlook" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে আমরা নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

Malaria is raging all over the province and even areas and districts which formerly were free from the fell disease have now fallen victims to it. For instance, Bankura and Birbhum were always known as very healthy districts, and though cholera or small-pox would now and then sweep over them, malaria was unknown to the inhabitants. But this year they, too, in common with other districts are faring extremely badly. A gentleman from Bishnupur tells us that recently he had occasion to visit a police-station within ten miles from the town of Bishnupur. And he was staggered to find that the death-rate was ten times higher than the birth-rate. Indeed, he was informed that while 150 to 200 deaths were being registered every week from malaria, the births did not come up to even 20.

অর্থাৎ ম্যালেরিয়া সমগ্র প্রদেশের উপর প্রকটমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল জেলায় লোকে ম্যালেরিয়ার কথা আদৌ জানিত না, অধুনা তত্তৎ স্থানে বহুলোক ম্যালেরিয়ার করাল গ্রাসে নিপতিত হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বাঁকুড়া ও বীরভূম এই দুইটি জেলার নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দুইটি জেলায় সময়ে সময়ে বসন্ত ও কলেরার প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইলেও, লোকে ম্যালেরিয়ার ধার ধারিত না। কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে এই দুইটি জেলার অবস্থাই শোচনীয়। বিষ্ণুপুর হইতে জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আমাদিগকে লিখিয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহাকে সহর হইতে দশ মাইল দূরে একটি থানায় গমন করিতে হইয়াছিল, এই থানায় ম্যালেরিয়াজনিত মৃত্যু-সংখ্যার বিষয় অবগত হইয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের নির্দ্দেশে মালদহ জাতীয় সাহিত্য সমিতি কর্ত্তৃক "রিয়াজ্ উস্ সলাতিন" প্রণেতা মুন্সী গোলামহোসেনের সমাধিতে সংযুক্ত প্রস্তর ফলকের চিত্র।

জন্ম-মৃত্যুর তালিকা হইতে তিনি অবগত হইয়াছেন যে, এই একটিমাত্র থানায় কেবল ম্যালেরিয়া-জ্বরে সপ্তাহে ১৫০ হইতে দুই শতের অধিক নর-নারী, বালক-বালিকার মৃত্যু হইতেছে—কিন্তু এ সময়ে এমন কি ২০ জনেরও জন্ম হয় নাই।

সুতরাং ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গের অবস্থা কি হইবে, আমরা তাহা কেমন করিয়া বলিব? অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে ভবিষ্যতের জন্য যদি কিছু শিক্ষা করিবার থাকে, আমরা বর্ত্তমানে তৎসম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

এখন কথা এই যে, যে কারণে সমগ্র বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র উত্তরবঙ্গের অদৃষ্ট-গগনে তত্তৎ কারণের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর কি না।

ইতঃপূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গদেশের বিভিন্ন বিভাগে বিগত ১৯০৮ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জ্বররোগে মৃত্যুর যে হার প্রদর্শন করা হইয়াছে, উহার আলোচনা করিলে স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইবে, সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা এই চারি বিভাগে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু-হার ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু রাজসাহী বিভাগে মৃত্যুর হার ক্রমশঃই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি উত্তরবঙ্গের মৃত্যুর হার সামান্য নহে। বিগত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের বিভিন্ন বিভাগে প্রতি সহস্রে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, আমরা নিম্নে উহার তালিকা প্রদান করিলাম।

রাজসাহী	২৬'৬৫
বর্দ্ধমান	২২'৯৬
প্রেসিডেন্সী	২০'১৫
চট্টগ্রাম	১৯'২১
ঢাকা	১৭'৪৩

সুতরাং সমগ্র উত্তরবঙ্গে মৃত্যুর হার ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও, এখনও বঙ্গের অন্যান্য জেলা ও বিভাগ অপেক্ষা উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্যোন্নতির বহুল প্রয়োজন রহিয়াছে। মালদহ, পাবনা এবং বর্ত্তমান বর্ষে রঙ্গপুরে জ্বররোগে মৃত্যুসংখ্যা বড়ই ভয়াবহ। কিরূপে ইহার আশু প্রতিকার হইতে পারে, তদ্বিষয়ে দেশের শিক্ষিত ও সুধী ব্যক্তিবর্গের বিশেষভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন।

ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি ও নিবারণ-সম্বন্ধে দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মত যাহাই হউক না কেন, ইহা নিশ্চয়, কয়েকটি কারণে সাধারণতঃ বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়া বিস্তার-লাভ করিয়া থাকে। আমরা সংক্ষেপে নিম্নে উহার কারণ উল্লেখ করিয়া ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গের সম্বন্ধে উহাদের সার্থকতা নির্দ্ধারণ করিব। নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণেই ম্যালেরিয়া সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ করিতেছে, ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে।

(১) রেলপথসমূহের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্বাভাবিক জলপথসমূহের রোধ।

(২) দেশের নদনদীসমূহ মজিয়া যাওয়ায় এই সকল মরা-নদীর ফলে দেশের স্বাস্থ্যহীনতা।

(৩) পাটের চাষ ও তন্নিবন্ধন পানীয় জলের অপব্যবহার।

(৪) দেশব্যাপী দরিদ্রতা।

(৫) অরণ্য, ডোবা, নালা প্রভৃতি।

এবং (৬) জনসাধারণের স্বাস্থ্যবিধান-সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

আমি এখন প্রথম বিষয়ের আলোচনা করিব।

ফ্রান্সিস্, এইচ্, স্কাইন নামক ভারতীয় সিবিল-সার্ভিসের অনৈক পেন্সনভোগী কর্ম্মচারী বিগত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের "East and West" পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—"Between 1856 and 1864 East Indian and Eastern Bengal Railways were constructed athwart the country's watershed with very inadequate provisions for watercourse by way of bridges and culverts. A net of embarked roads interfered seriously with the drainages" অর্থাৎ বিগত ১৮৫৬ ও ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের প্রতিষ্ঠার ফলে সমগ্র দেশের স্বাভাবিক জলপ্রবাহ রুদ্ধ হয়। রেলওয়ে কোম্পানী সেতু ও কালভার্ট প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া এই ক্ষতির পূরণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু উহা ফলপ্রদ হয় নাই। রেলপথসমূহ সমগ্র দেশকে জালের ন্যায় বেষ্টন করায় দেশের স্বাভাবিক জলপ্রবাহের অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে, অথচ এই সকল জলপ্রবাহের কার্য্যকারিতা যে কতদূর আবশ্যক, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বর্দ্ধমানের ভীষণ সংক্রামক জ্বরের অন্তে "Epidemic Fever Commission" এই জ্বরের হেতু নির্ণয়কালে এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন,—"The reduction of superfluous moisture of the soil by means of drainages improves water-supply and clearance of the obstruction in the river-beds", অর্থাৎ উন্নত পয়ঃপ্রবাহের ফলে ভূমির অনাবশ্যক আর্দ্রতা নষ্ট হওয়ায় নদ-নদীর খাতসমূহ পরিষ্কৃত এবং জলাভাব বিদূরিত হইয়া দেশের স্বাস্থ্য উন্নত হয়। কমিশনের উল্লিখিত মন্তব্য তৎকালে পরিগৃহীত না হইলেও অধুনা কর্ত্তৃপক্ষ উহার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে উত্তরবঙ্গের যে কয়েকটি জেলায় সামান্যভাবে ড্রেনেজ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য-বিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ সমস্ত ড্রেনেজ কার্য্যের ফলে বিশেষ ভাবে স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছে। আমরা নিম্নে গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত স্বাস্থ্য-বিবরণ হইতে স্বাস্থ্যোন্নতির পরিচয় প্রদান করিলাম—

জেলার নাম	যে বৎসরে ড্রেনেজ-কার্য্য শেষ হইয়াছে	ড্রেনেজ-কার্য্য শেষ হওয়ার পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরের মৃত্যু সংখ্যার হার (প্রতি সহস্র)	ড্রেনেজ-কার্য্য শেষ হওয়ার পর পাঁচ বৎসরের মৃত্যুর হার (প্রতি সহস্র)
দিনাজপুর	১৮৮৭	২৮ ৪৬	১২.৩২
জলপাইগুড়া	১৮৯৬	২৯.৯৫	২৫.১১
রঙ্গপুর	১৮৭৯ (ঘোষের ড্রেণ)	৩৫.৯৪	২৭.৯৮
ঐ	১৮৯০ (স্কাইনের ড্রেণ)	৩৭.৬৩	৩০.৬৭

উল্লিখিত ড্রেনেজের ফলে যদি উত্তরবঙ্গের অন্ততঃ তিনটি জেলারও উন্নতি হইয়া থাকে, তবে অন্যান্য জেলায়ও এইরূপ ড্রেনেজের আবশ্যকতা আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বর্ত্তমানে রাজসাহী বিভাগের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, পূর্ব্বদিকে সলিলবহুল ব্রহ্মপুত্র নদ এবং পশ্চিম-দক্ষিণে গঙ্গা ও পদ্মা ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। পরন্তু বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ নদ-নদী এই সীমান্তে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে ব্রহ্মপুত্রের গতি বহুল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গঙ্গা ও পদ্মারও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ সর্ব্বসময়েই গঙ্গা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের সলিল রাশি উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত ভূখণ্ডকে স্বাস্থ্যসম্পদ ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছে। কিন্তু অধুনা পদ্মার অবস্থা নানারূপে আশঙ্কাপ্রদ ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য-সম্পদে ভাগ্য-বিপর্য্যয় হইবার উপক্রম হইয়াছে।

অনুমান চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি সর্ব্ব প্রথমে পদ্মার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম; সেই আমার উত্তরবঙ্গের সীমান্ত প্রদেশে আগমন। দামুকদিয়া হইতে অনুমান ৫ মাইল দূরে জুনিয়াদহ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আমি তথায় গমন করি। জুনিয়াদহের পাদদেশ ধৌত করিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পদ্মার খরস্রোত তরতর বেগে প্রবাহিত হইত। আমি যখন উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম, বিপুল সলিলা পদ্মা অনুমান দুই মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। আর অতীতের নিদর্শনস্বরূপ পদ্মার প্রাচীন খাত গ্রামের অদূরে আপনার গতিপথ চিহ্নিত করিতেছে। সুবিস্তৃত জলরাশি অনুমান এক মাইল বিস্তৃত, উভয় মুখ রুদ্ধ; কেবল বর্ষাঋতুতে প্রবল জলস্রোত এক মুখ ভাঙ্গিয়া এই প্রাচীন খাতে প্রবেশ করে। আমি দেখিয়া অবাক্ হইলাম, এই স্থানে ম্যালেরিয়া পূর্ণভাবে আত্মবিকাশ করিয়াছে, কিন্তু এখান হইতে অনুমান ৫ মাইল দূরে দামুকদিয়ার স্বাস্থ্য পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, যখন এই বহুদূরবিস্তৃত গ্রাম খানির পাদদেশ দিয়া পদ্মা প্রবাহিত হইত, তখন ইহার স্বাস্থ্য সুন্দর ছিল। কিন্তু অধুনা এই মরা নদীই গ্রামখানিকে ধ্বংসপথে টানিয়া লইতেছে। বলিতে দুঃখ হয়, ম্যালেরিয়ার প্রবল আক্রমণে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে দুই মাসের মধ্যে আমাকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে হয়। স্থান পরিত্যাগের পর আমি আমার পূর্ব্বস্বাস্থ্য অনেকাংশে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য-তত্ত্বানুশীলন কালে আমার মনে স্বতঃই একটি প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে। আমি সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসীর নিকট বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি। আজ যাঁহারা সভায় উপস্থিত, বোধ হয়, তাঁহাদিগের সকলেই সাড়াঘাটের অদূরে পদ্মাবক্ষে ইংরাজের স্থাপত্য-কৌশল ও বিজ্ঞানবলের অদ্ভুত নিদর্শন অপূর্ব্ব সেতু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই সেতু নির্ম্মিত হওয়ায় পদ্মার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবার উপক্রম হইয়াছে, কেহ কি তাহা চিন্তা করিয়াছেন? আমি অবগত হইলাম, বিগত কিঞ্চিদূন এক বৎসরের মধ্যে পাবনার নিম্নে এক প্রকাণ্ড চড়া পড়িয়াছে, সলিলরাশি উন্মত্তের ন্যায় একবার এদিক, একবার ওদিক আবর্ত্তন করিতে করিতে অবশেষে যেন ক্লান্তদেহে এক ক্ষীণ পন্থা অনুসরণ করিতেছে। ফলতঃ অবস্থা যেরূপ পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে অচিরকাল মধ্যে পদ্মা উন্মাদ আবেগে এই পাবনা জেলার সুদূর দক্ষিণ দিয়া নূতন পথ করিয়া লইবে, অন্যথা ইহার সলিল প্রবাহ ভীম আবর্ত্তে নিম্নবঙ্গের অভিমুখে প্রবাহিত হইবে, এবং অল্প চেষ্টার ফলেই যশোহর ও খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলের স্বল্পসলিলা কপোতাক্ষী, বিগত-জীবন ভৈরব প্রভৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের অবস্থা হইবে কি? যেরূপ পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে পাবনার নিম্নস্থিত ইচ্ছামতী যশোহরের প্রান্তবাহী ভৈরবের আকার ধারণ করিয়া লক্ষ লক্ষ জীবননাশের কারণ হইবে, এবং পদ্মার পূর্ব্ব প্রভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত হইবে। পদ্মা ও গঙ্গার সলিলের অভাব হইলে উত্তরবঙ্গের অনেক নদ-নদী মরিয়া যাইবে। Hunter's statistical Account of Bengal গ্রন্থের রাজসাহী জেলার বিবরণ হইতে আমি নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"The Drainage of Rajshahi can best be represented by supposing the District to be the segment of a somewhat irregular circle, of which the Ganges River forms the limb and the Chalan Bil the centre. The lines of drainage would then be represented by a series of concentric lines from the Ganges, and from the high country in Dinajpur to the north, towards the southern extremity of the Chalan Bil. The Ganges Bank being higher than the general level country, the water drains away from it. The drainage from all parts of the District converges in the Chalan Bil from whence it flows away eastward."

উল্লিখিত বিবরণ হইতে উপলব্ধি হইবে, গঙ্গার সমতল অপেক্ষাকৃত উচ্চ বলিয়া উত্তরবঙ্গের মধ্যে চলন বিল ও অন্যান্য নদ-নদী গঙ্গা হইতে পর্য্যাপ্ত সলিল গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু গঙ্গার স্রোত অপেক্ষাকৃত মন্দ ও সলিলের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবে এই সকল নদ-নদী মরিয়া যাইবে এবং সমস্ত উত্তরবঙ্গ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিবে।

আমার আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক নহে, ১৮৬৪খৃঃ অব্দের Epidemic Fever Commission এর অন্যতম সদস্য স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের উক্তিতে তাহা কার্য্যতঃ স্বীকার করা হইয়াছে। স্বর্গীয় মিত্র মহাশয়ের মন্তব্যের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে ;—"পঞ্জাব ও

উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য শত শত মাইল ব্যাপী যে যমুনা-কেনাল কাটা হইয়াছে, তাহার সমস্ত জল গঙ্গা হইতে লওয়া হয়। ইহার ফলে গঙ্গার নিম্নাংশের স্রোত মন্দীভূত হওয়ায় নিম্নবঙ্গে উহার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা দিন দিন মজিয়া যাইতেছে।" যমুনা-কেনালের ফলে নিম্নবঙ্গের যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, সাড়া সেতুর ফলে সমগ্র উত্তরবঙ্গের যে সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইবে না, তাহা কেমন করিয়া বলিব ?

উত্তরবঙ্গের সর্ব্বত্র অধুনা পাটের চাষ অসম্ভবভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাট পচাইবার কালে দেশের সর্ব্বত্র জল-স্থল ও বায়ুমণ্ডল এমন দূষিত গন্ধে পূর্ণ হইয়া উঠে যে, উহার ফলে দেশে নানারূপ পীড়ার সঞ্চার হয়। আমি জানি, পাট পচাইয়া যাহাতে নদীর জল নষ্ট করিতে না পারে, এই জন্য যশোহর-জেলা-বোর্ড একবার যশোহরের সর্ব্বত্র নদ-নদীতে পাট পচান বন্ধ করিবার জন্য কঠোর আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপভাবে নিষেধ করা সর্ব্বত্র সম্ভবপর নহে। দরিদ্র কৃষক জানে, পাট তাহার অর্থাভাব বিদূরিত ও সুখ-সুবিধা প্রদানে যতদূর সমর্থ, অন্য কিছু আর তেমন নহে। সুতরাং তাহার গৃহ-কোণের পতিত ভূমিখণ্ডে সে এক মুষ্টি পাটের বীজ নিক্ষেপ করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করে। এ অবস্থায় পাটের চাষ রোধ করা কখনও সাধ্যায়ত্ত নহে। পরন্তু উহার ফলে যে জেলার স্বাস্থ্য অনেকাংশে হীন হইয়া পড়িবে, তাহাও অবশ্যম্ভাবী।

আমি স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছি, পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে ধোপা, পরামাণিক, বারুজীবী, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, তৈলিক প্রভৃতি দেখা যাইত, অধুনা তাহাদিগের সমস্তই প্রায় লোপ পাইয়াছে, এবং পশ্চিমাঞ্চলের মিস্ত্রী, ধোপা, পরামাণিক প্রভৃতি তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন কালের এই সমস্ত ও অন্যান্য বিভিন্ন জাতীয় শিল্পকুশল ব্যক্তিগণের পরিণাম কি হইল ? বিশেষ অনুসন্ধান করিলে পরিলক্ষিত হইবে, জাতীয় শিল্প-ব্যবসায় আশানুরূপ অর্থপ্রদ না হওয়ায়, পরন্তু অর্থাভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহাদিগের একাধিক বংশপরম্পরা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অথবা কৃষিকার্য্য অধিকতর লাভজনক বিবেচিত হওয়ায় ইহারা কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বের অপেক্ষা বহুলোক অধুনা কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় দেশের সর্ব্বত্র গোচর ভূমির অভাব হইয়াছে। বাঙ্গলায় সর্ব্বত্র গোচর ভূমির অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইলেও উত্তরবঙ্গের পক্ষে ইহা অধিকতর সত্য বলা যাইতে পারে। পশুখাদ্যের দুর্ম্মূল্যতা, গোচর-ভূমির অভাব, এবং সবল বৃষের অভাবে সমগ্র বঙ্গের গোকুল ধ্বংসপথে প্রস্থিত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গেরও এ বিষয়ে চিন্তা করিবার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ দুগ্ধের ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে সমগ্র উত্তরবঙ্গের মধ্যে কিরূপ অকালমৃত্যু সংঘটিত হইতেছে, আমি আমার আলোচনার উপসংহারভাগে উহা প্রদর্শন করিব। অধুনা সমগ্র উত্তরবঙ্গের সমবেত ধনীর ও ক্ষমতার বরপুত্রদিগকে আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে দেশে গোচর-ভূমি বৃদ্ধি পায় এবং দেশের গোকুল বৃদ্ধি

পাইতে পারে, তাঁহারা তদ্বিষয়ে চেষ্টা করুন। তাঁহাদিগের চেষ্টা ব্যতীত এই সুমহৎ ব্রত সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে।

আমি এইখানে আর একটি বিষয়ের প্রতি সমগ্র উত্তরবঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। কিছুকাল পূর্ব্বে রঙ্গপুরের স্বাস্থ্য-বিবরণী আলোচনাকালে এক বিষয়ের প্রতি আমার সাগ্রহ দৃষ্টি পতিত হয়। সমগ্র উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্যতত্ত্ব আলোচনাকালে সেই একই বিষয়ে আমার অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হইয়াছে। বিগত "১৯১৩ খৃষ্টাব্দের বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যবিবরণী" (Report on the Sanitation in Bengal for the year 1913) শীর্ষক পুস্তকের প্রথম পরিশিষ্টের (Appendix) ৮ম ও ৯ম পৃষ্ঠায় সমগ্র বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় বয়সানুক্রমে নর-নারীর মৃত্যুসংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা উল্লিখিত বিবরণ হইতে কেবলমাত্র উত্তরবঙ্গের জেলাসমূহের মৃত্যুসংখ্যা উদ্ধৃত করিলাম :—

বয়স		বগুড়া		পাবনা		মালদহ	
ঊর্দ্ধ	অনূর্দ্ধ	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
০	১	৩,০৬১	২,৩৪৮	৫,১০৭	৪,৬৬০	৩,৯০৯	৩,৫০১
১	৫	১.৫৩৯	১,৪০৯	৩,৯১৮	৪,২১৬	৩,২১১	৩,১৯৬
৫	১০	৮৭২	৬৬৪	২,৪৪১	২,১০৬	২,০৯৫	১,৭৫৭
১০	১৫	৪৪৬	৩০২	১,০৮৩	৮৪৭	১,১৮৬	৭৭৫
১৫	২০	৩৬৭	৫৪৫	৮৭৭	১,১৪৬	৮১১	৭৬৪
২০	৩০	৮৬৮	১,১৭৬	১,৮০০	২,৪০৮	১,৪৫৬	১,৭২৭
৩০	৪০	৯৮৯	৮৯৫	২,০৪৩	১,৭৬৯	১,৫৯৭	১,৩৭৯
৪০	৫০	৮৫২	৬৩৩	১,৮৭২	১,৪০১	১,২৭৬	১,০২৩
৫০	৬০	৮৪০	৬৭৭	১,৪৫৬	১,৩১০	৯০৪	৮৮৪
৬০	তদূর্দ্ধ	১,০০৬	৬৯৫	২,৩৮১	২,৩৫২	১,৮৩১	২,৩২১

বয়স		রাজসাহী		দিনাজপুর		জলপাইগুড়ী		দার্জ্জিলিঙ্গ		রঙ্গপুর	
ঊর্দ্ধ	অনূর্দ্ধ	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
০	১	৬,৮৩১	৬,০১৮	৮,২৮০	৭,২১৯	৪,১৫৫	৩,৭৮১	১,০৮৭	১,০৩৭	১০,০৯৭	৮,৪৯২
১	৫	৩,৩৩৭	৩,১৮৭	৪,৫২৭	৪,১১৬	২,০৬১	১,৮১২	৮৬৭	৭০৯	৪,১৪২	৩,৯৮৫
৫	১০	২,০১৭	১,৫৩৬	২,৪৭৯	১,৭৫৯	৮৭৫	৬৯২	৩৯৫	৩৯২	২,২৬৭	১,৭৫২
১০	১৫	১,১৩৫	৮২৭	১,০৯২	৮৩৭	৬৫১	৪৯১	২৯৩	২৬৫	১,১২০	৮৭০
১৫	২০	১,০৮৪	১,৪৬৪	১,০০৯	১,৩৪১	৬৮৯	৯৪৯	২৫৫	২৮০	১,০৩৯	১,৬৪২
২০	৩০	২,৩০৯	২,৯৩৩	২,৪৪৭	৩,৩৭৫	১,৬৭৩	২,৪০৭	৭৯৮	৮৬৯	২,৬৮০	৩,৯৩৭
৩০	৪০	২,৫৮০	২,৪১৭	২,৭০৯	২,৫৬২	১,৭৬০	১,৬৮৭	৬২০	৫৮৮	৩,৩২২	৩,০৩০
৪০	৫০	২,০৯৫	১,৬৪৯	২,২৬০	১,৭০২	১,৪৪৯	৯৯৯	৪০১	৩২৫	২,৭৫৬	২,২০৪
৫০	৬০	১,৩৮১	১,২১৮	১,৭৫৯	১,৩৪৬	১,১৭৯	৯৪৭	৩৩৫	২৮১	২,৫০৯	১,৯৮৬
৬০	তদূর্দ্ধ	২,০০৮	১,৭২৫	২,৩৪৫	১,৭১৬	১,৬৬৯	৮৯৪	৪৯৫	৪৪৯		

উল্লিখিত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারি। বিভিন্ন বয়সের মৃত্যু-তালিকাগুলি সাধারণভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই, ১৫ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক জেলায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মৃত্যুসংখ্যা অধিক হইয়াছে—কিন্তু অন্যান্য বয়সে কুত্রাপি স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের অধিক হয় নাই। সমগ্র বঙ্গের মৃত্যুসংখ্যা সামান্যভাবেও আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, একমাত্র উত্তরবঙ্গের পক্ষে ইহা সত্য নহে। পরন্তু উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সর্ব্বত্রই উহা সমভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এখন প্রশ্ন এই, ১৫ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্রই পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মৃত্যুসংখ্যা এইরূপ বর্দ্ধিত হইল কেন? যাহারা বাঙ্গলাদেশের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে নিতান্ত সামান্যভাবেও সংবাদ রাখেন, যাঁহারা দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য, অন্নকষ্ট ও নিত্যদুর্ভিক্ষের বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করেন, দেশব্যাপী অজ্ঞতা, কুসংস্কার, স্বাস্থ্যবিধির অবহেলা, বিশুদ্ধ খাদ্য ও গোদুগ্ধের অভাব প্রভৃতি যাহাদিগের চিন্তাস্রোত কিছু-মাত্র পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান নিতান্ত অসম্ভব হইবে না। যে বয়সে মানুষ পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করে, যে বয়সে মানুষের মৃত্যুর সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা কম, সেই বয়সেই যদি মৃত্যুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, তবে কি উহা প্রকৃতভাবে চিন্তার বিষয় নহে? বিগত বর্ষে সমগ্র উত্তরবঙ্গের পাঁচ হইতে ষষ্টি ও তদূর্দ্ধ বর্ষের পুরুষ ও স্ত্রী-লোকের মৃত্যুসংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বয়স	পুরুষ	স্ত্রী
৫-১০	১৩,৪৪১	১০,৬৫৮
১০-১৫	৭০৭৬	৫,০১৪
১৫-২০	৬,১৬১	৪,১৩১
২০-৩০	১৪ ০৪১	১৮,৮৭২
৩০-৪০	১৫,৬২০	১৪,৩২৭
৪০-৫০	১২,৯৭১	৯,৯৩৬
৫০-৬০	১০,৩৬৩	৮,৬৪৯
৬০-তদূর্দ্ধ	১৪,৯৯১	১১,৫৯০

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে সমগ্র উত্তরবঙ্গে কেবলমাত্র ১৮৮৭২ জন স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে। পাঁচ বর্ষ হইতে তদূর্দ্ধকালে কোন বয়সেই স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে এত অধিক মৃত্যুর সংখ্যা পরিলক্ষিত হয় না।

উত্তরবঙ্গে—সুধু উত্তরবঙ্গে বলি কেন,—সমস্ত বঙ্গে মাতৃজাতির এইরূপ অকালমৃত্যু বর্দ্ধিত হইল কেন? স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, আমার মনে হয়, কতকগুলি অনিবার্য্য কারণে অধুনা এইরূপ অকালমৃত্যু পরিলক্ষিত হইতেছে। ১৫ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে জননীগণ সাধারণতঃ সর্ব্ব প্রথম সন্তানপ্রসব করিয়া থাকেন। এই সন্তান-

প্রসবের কাল তাহাদিগের পক্ষে ঘোর বিপদসঙ্কুল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অধুনা দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্ট আমাদিগের নিত্যসহচর হইয়াছে. বাঙ্গলাদেশের নিরন্ন দরিদ্র লোকের কথা দূরে থাকুক, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এমন অসংখ্য পরিবার আছেন, যাঁহারা শীতাতপ হইতে দেহরক্ষার উপযোগী বস্ত্র ও জীবন ধারণের উপযোগী আহার্য্য সংগ্রহের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও উপায় উদ্ভাবনে সমর্থ হইতেছেন না। জননীর গর্ভাবস্থায় ও সন্তানপ্রসবের পর তাঁহার পক্ষে যে সকল শারীরিক বিধান পালন করা প্রয়োজন, যেরূপ পুষ্টিকর আহারাদি ভক্ষণ করা আবশ্যক, জানি না, কয় জন তদ্বিষয়ে সমর্থ হইয়া থাকেন। বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও বিশুদ্ধ আহার্য্য দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। তদুপরি স্বাস্থ্যবিধান লঙ্ঘন। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে লেখাপড়া জানে, এরূপ লোকের সংখ্যা বোধ হয় শতকরা একাদশের অধিক হইবে না। বঙ্গদেশে ঐ সংখ্যা বোধ হয় কিছু অধিক হইতে পারে। অগণিত জনসাধারণের কথা দূরে থাকুক, উল্লিখিত অত্যল্প সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের কয় জন সাধারণ স্বাস্থ্যবিধানসমূহ পালনে সম্যক মনোযোগী, পরন্তু কয় জন প্রকৃতভাবে এই সমস্ত বিধান পালন করিতে সমর্থ, সকলেই তাহা অবগত আছেন। অনাহার ও স্বল্পাহারক্লিষ্ট রুগ্নদেহে রোগ সহজেই আত্মবিকাশ করিতে পারে। পরন্তু এইরূপ দেহে একবার রোগ প্রবেশ করিলে উহা সহজে নিরাকৃত হয় না, এবং ভবিষ্যতে মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। আমি ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি যে, আমাদিগের দারিদ্র্য যতই প্রবল হউক না কেন, আমরা ব্যক্তি ও সমাজগতভাবে চেষ্টা করিলে উল্লিখিত অকালমৃত্যুর পরিমাণ হ্রাস করিতে সমর্থ হইতে পারি না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি প্রদান এবং সাধারণ স্বাস্থ্য বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা সকলেরই পক্ষে সম্ভবপর। আমরা যদি এই সামান্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ প্রদানেও অক্ষম হই, তাহার জন্য অপরকে অপরাধী করা চলে না। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ষা, গ্রীষ্ম, শীত, হেমন্ত, যে কোন ঋতুই হউক না কেন, বাটীর মধ্যে যে গৃহখানি সর্ব্বাপেক্ষা অব্যবহার্য্য, সেই খানির এক সুদূর প্রান্তে, শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা এবং আলোক ও বায়ু চলাচলের উপযুক্ত বিধান না করিয়া প্রসূতির বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। বৈশাখের দীপ্ত বায়ু, পৌষের প্রচণ্ড শীত, শ্রাবণের ঘন বরষা এই জীর্ণ পর্ণকুটীরে শিশুর ও তৎপ্রসূতির ভাগ্যনেমি আবর্ত্তন করিতে থাকে। হয়ত সূতিকাগৃহের সীমা পার হইতে না হইতেই শিশুর, অথবা জননীর, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় উভয়েরই, জীবনলীলার সাঙ্গ হয়। ইহাকেও কি অদৃষ্ট বলিতে হইবে ?

উপসংহারে আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমি নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিতেছি। বিগত ফাল্গুন মাসের "প্রবাসী" পত্রে একটি সারগর্ভ মন্তব্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের জেলা-বোর্ড সমূহ দেশের স্বাস্থ্য-সাধনকল্পে যেরূপ অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া লিখিত হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে জেলাবোর্ডের প্রদত্ত অর্থসাহায্য

অনেক স্থলেই এরূপ অকিঞ্চিৎকর যে, দেশের ধনী ও ভূস্বামিগণ প্রচুর অর্থ প্রদানপূর্ব্বক এইরূপ বহু দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা না করিলে প্রকৃতপক্ষে দরিদ্রের উপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ইতঃপূর্ব্বে আমি পাবনা ও রঙ্গপুর এই দুইটি জেলার দাতব্য-চিকিৎসালয়-সমূহের কার্য্য-বিবরণ আলোচনা পূর্ব্বক পাবনার "সুরাজ" এবং কাকিনার "দিক্‌-প্রকাশ" ও রঙ্গপুরের "দর্পণ" পত্রে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এই দুইটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, পাবনার জেলাবোর্ড গড়ে প্রতি রোগীর জন্য দুই পয়সা ও রঙ্গপুরের জেলাবোর্ড এক পয়সার অধিক মূল্যের ঔষধ ব্যয় করেন নাই। সম্ভবতঃ উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাসমূহের দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহের অবস্থা আলোচনা করিলে, ইহার অধিক আশাপ্রদ অবস্থা পরিলক্ষিত হইবে না। সুতরাং সমগ্র জেলার স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে উন্নতি বিধান করিতে হইলে আমাদিগকে কেবল জেলা বোর্ডের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে হইবে না, দেশের ধনী ও ভূস্বামী-সম্প্রদায়ের বদান্যতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করিতে হইবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে দেশের স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ আলোচনাকালে আমি লিখিয়াছিলাম, "দেশের স্বাস্থ্য সাধন-কল্পে প্রকৃতি ও দেশের শাসকসম্প্রদায় যাহা কিছু করেন, তৃষিত-কণ্ঠ চাতকের ন্যায় আমরা যদি একমাত্র তাহার দিকে চাহিয়া না থাকি, 'জল দাও, জল দাও, রাস্তাঘাট করিয়া দাও, জেলাকর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট এইরূপ কাতর প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের দুর্ব্বল ক্ষীণ বাহুদ্বয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে আমাদিগকে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় না।" বর্ত্তমানেও আমি সেই কথার প্রতিধ্বনি করিতেছি। কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতার "স্বাস্থ্য-সমাচার" পত্রে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য নামীয় জনৈক লেখক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন, দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া বিদূরিত করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের বিশেষভাবে সাহায্য করা প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া জনসাধারণ কিছুই করিতে পারেন না, আমি এই মতের সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহি। আমি আমার নিজ জেলার উল্লেখ করিতে পারি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যশোহর "Anti-Malarial Society" বা "ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক" সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতি প্রারম্ভে কয়েকটি ম্যালেরিয়া বিধ্বস্ত পল্লীগ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার, ডোবাসমূহ পূর্ণ, বায়ু ও আলোক গমনাগমনের উপায় বিধান, জল নির্গমনের কৌশল অবলম্বন প্রভৃতি কয়েকটি সহজ সাধ্য উপায়ে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। সুখের বিষয়, এই কয়েক বৎসরের চেষ্টার ফলেই সমিতির আশাতীত উন্নতি হওয়ায় তাঁহারা অন্যান্য গ্রামে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। যশোহরের ন্যায় ম্যালেরিয়া বিধ্বস্ত পল্লীগ্রামসমূহের পক্ষে যদি এইরূপ উন্নতি সাধন সম্ভবপর হইয়া থাকে, তবে অন্যান্য স্থানের ত কথাই নাই। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র এই উপায়ে কার্য্য আরম্ভ হউক, বাঙ্গালার পল্লগ্রামসমূহ সুখ স্বাস্থ্য ও স্বাধীনতার লীলানিকেতন হইয়া উঠুক, ইহাই আমার প্রার্থনা।

শ্রীকেশবলাল বসু।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের মহাস্থান নাম হইবার কারণ কি ?

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম সাহেব যে দিন বগুড়াজেলার অন্তর্গত মহাস্থানগড় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধননগরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া দৃঢ়তার সহিত মত প্রকাশ করিলেন, তদবধি এই মহাস্থানগড়ের প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুসন্ধিৎসাপূর্ণ দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে ; এবং তদবধি অনেকেই কানিংহাম সাহেবের ঐ প্রকার সিদ্ধান্তের অনুকূলে ও প্রতিকূলে লেখনী চালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে মহাস্থান-গড় যে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের ধ্বংসাবশেষের শেষ নিদর্শন, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট ও সন্তোষ-জনক প্রমাণপরম্পরা বর্ত্তমান থাকিলেও অদ্য আমরা তৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। মহাস্থান নামের উৎপত্তি ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী পরবর্ত্তীকালে মহাস্থান নামে পরিচিত হইবার কারণ কি, আমরা অদ্য কেবলমাত্র তৎসম্বন্ধেই যৎকিঞ্চিৎ আলো-চনা করিব।

"করতোয়া-মাহাত্ম্য" নামক সুপরিচিত স্মৃতিনিবন্ধে লিখিত আছে যে, "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-পুর পঞ্চবিংশ সহস্রাধিক লক্ষসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও স্কন্দ-বিষ্ণু-বলভদ্র শিবাদি দেবতা দ্বারা অধ্যুষিত এবং করতোয়া জলধারাপবিত্রীকৃত (১৪ শ্লোঃ)।" উক্ত গ্রন্থে আরও লিখিত আছে, এই স্থানে আরোহণমাত্রেই নর নারায়ণসদৃশ হয়। এখানে পশুগণও তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ; এখানে স্কন্দ-মন্দিরে তাম্রচূড়-বাহন কার্ত্তিকেয় অবস্থান করেন, এস্থানের দীর্ঘিকা সুশীতল সলিলপূর্ণা এবং দুর্গন্ধও সুগন্ধপূর্ণ। এখানে যষ্ঠী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; অস্থি শিলা হয় ; আকাশ ছত্রের কার্য্য করে ; সর্পগণ ফণা ধারণ করে না ও জীবগণ দ্বিস্বরবিশিষ্ট। এখানে কূপ দীপতুল্য ও সুবর্ণ বৃষ্টি হইয়া থাকে। এখানে ভূমি উচ্চতরা ও কাম্যকুণ্ডে স্নান করিলে তরুণত্ব লাভ হয়। এখানে ভোগ যজ্ঞতুল্য, ভ্রমণ নৃত্যতুল্য ও বাক্য বেদস্বরূপ। স্বাম এখানে এই প্রকারের পদ ও উনবিংশ লক্ষণ রচনা করায় এই স্থান সমগ্র জগতের মধ্যে 'মহাস্থান" নামে বিখ্যাত হইয়াছে (৫৬-৫৮ শ্লোঃ)।

মুগ্ধবোধ-প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় বোপদেব গোস্বামী স্বীয় পরিচয় প্রসঙ্গে তদীয় ''শতক" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "দেশের মধ্যে বরদা নদীর তীরভূমি অতি রমণীয় স্থান। তথায় অন্বর্থনামা মহাস্থান নগর বিদ্যমান। সেই নগরে দেবপদের আস্পদ ও অগ্রজগণের অগ্রগণ্য সহস্রসংখ্যক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সেই অগ্রজগণের মধ্যে বিদ্বৎবর ধনেশ ও কেশব নামক দুইজন চিকিৎসক ছিলেন। বোপদেব নামক কবি সেই ধনেশের শিষ্য ও কেশবের পুত্র। উক্ত পরিচয়মূলক শ্লোক হইতে আমরা বরদা নদীর তীরবর্ত্তী অপর একটি মহাস্থান নগরের সন্ধান প্রাপ্ত হইতেছে। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ অবগত আছেন যে, শুঙ্গবংশের প্রথম নৃপতি পুষ্পমিত্র যবনরাজ মিনান্দারকে পরাজিত করিবার পর

পাটলীপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন ; এবং তৎপর বিদর্ভরাজ্য আক্রমণ করতঃ বরদা নাম্নী নদীকে বিদর্ভ ও মালব রাজ্যের মধ্যসীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। বিদর্ভ ও মালব-রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী এই বরদা নদী এবং বোপদেব গোস্বামী বর্ণিত বরদা নদী অভিন্ন বলিয়াই আমাদের মনে হয়। সুতরাং বোপদেব গোস্বামী বর্ণিত "মহাস্থান" নগর প্রাচীন বিদর্ভ অথবা মালবরাজ্যের সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত হইতেছে।

সারনাথে গৌড়পতি প্রথম মহীপালদেবের যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও মহাস্থান শব্দের উল্লেখ পাইতেছি। তাহাতে লিখিত আছে,—"গৌড়াধিপ মহীপাল [যাঁহাদিগের দ্বারা] কাশীতে ঈশান-চিত্রঘণ্টাদি শতকীর্ত্তিরত্ন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্য সফল হইয়াছে, তাঁহারা সম্বোধি-পথ হইতে বিনিবৃত্ত হন নাই। সেই শ্রীমান্ স্থিরপাল ও বসন্তপাল নামক অনুজ ধর্ম্মরাজিকা ও সাঙ্গধর্ম্মচক্রের জীর্ণ-সংস্কার এবং অষ্ট মহাস্থান শৈলগন্ধকুটী নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।" "চুল্লক শ্রেষ্ঠীকথা" প্রমুখ জাতকগ্রন্থসমূহ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল কুটীরে বাস করিয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ঐ সকল কুটীর সদ্ধর্ম্মীগণের নিকট "গন্ধকুটী" নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীকালে ঐ সকল গন্ধকুটী শিলাদ্বারা বিনির্ম্মিত হওয়ায় তাহারা শৈলগন্ধকুটী আখ্যা লাভ করিয়াছিল। শাক্য বুদ্ধ যে সকল স্থানে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মৃগদাব বা সারনাথই সর্ব্বপ্রথম। এই স্থানে যে শৈলগন্ধকুটী ছিল, তাহা কালক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় গৌড়াধিপ মহীপাল তথায় "অষ্টমহাস্থান" সমন্বিত শৈলগন্ধকুটী নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা অধিকতর সম্ভব মনে হয়। "অষ্টমহাস্থান" শব্দের অর্থ কি ? সম্প্রতি সারনাথের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একখানি প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে বুদ্ধদেবের অষ্টলীলাস্থলী ও তত্রত্য বুদ্ধলীলার চিত্র খোদিত আছে। ঐ প্রস্তরফলকটি শৈলগন্ধকুটীর সহিত সংযুক্ত ছিল। এতদ্দ্বারা পণ্ডিতগণ মনে করিতেছেন যে, সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের লীলাস্থলগুলিকে বৌদ্ধগণ "মহাস্থান" নামে অভিহিত করিতেন, এবং ঐরূপ অষ্টমহাস্থানের ও তৎসম্পর্কীয় বুদ্ধ-লীলাসমূহের চিত্র-খোদিত প্রস্তরফলক সংযোজিত হওয়ায় মহীপালদেবের প্রাগুক্ত শৈলগন্ধ-কুটী 'অষ্টমহাস্থান শৈলগন্ধকুটী' আখ্যা লাভ করিয়া থাকিবে (১)। যাহা হউক, সারনাথ-লিপি হইতে আমরা একটি বিশেষ কথা অবগত হইতেছি যে, বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের লীলাস্থল-গুলিকে মহাস্থান নামে অভিহিত করিতেন।

চৈনিক-পরিব্রাজক য়ন-উন্-চুয়াঙের ভ্রমণ-কাহিনী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানীর প্রায় ৩॥ মাইল [২০লী] উত্তর-পশ্চিমে পো-সি-পো নামক বিহার বর্ত্তমান ছিল। [এই পো-সি-পো বিহারটি মহাস্থানগড়ের ৩॥ মাইল উত্তর-পশ্চিমে

১) Archæological Survey of India, Annual Report 1906-07 p. 97.

অবস্থিত ভাসু(পুর) বিহারের সহিত অভিন্ন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে]। এই বিহারটির সুপ্রশস্ত গৃহ ও কক্ষসমূহে মহাযানসম্প্রদায়ভুক্ত ৭০০ শ্রমণ ও প্রাচ্য-ভারতের বহুসংখ্যক বিখ্যাত ভিক্ষু প্রতিনিয়ত বাস করিতেন। ইহার নিকটে অশোকনির্ম্মিত একটি স্তূপ ছিল। তথায় বুদ্ধদেব তিন মাস কাল ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন।" আমাদের আলোচ্য মহাস্থানগড় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভাসুবিহার প্রভৃতি প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মহাস্থানগড় ও তৎসমীপবর্ত্তী পঞ্চক্রোশব্যাপী স্থান পৌণ্ড্রক্ষেত্র ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী বলিয়া করতোয়া-মাহাত্ম্যে উল্লিখিত হইয়াছে। আবার চৈনিক-পরিব্রাজকের বিবরণী হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, বুদ্ধদেব এই স্থানে তিন মাসকাল ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। সারনাথ-লিপির প্রমাণানুসারে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচার স্থানগুলি বৌদ্ধগণের নিকট মহাস্থান নামে অভিহিত হইত। অতএব এই কারণেই যে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী কালক্রমে বৌদ্ধগণের ও পরিশেষে এতদ্দেশের জনসাধারণের নিকট মহাস্থান নামে পরিচিত হইয়াছে এবং এখানে বহুকাল যাবৎ গড় বা দুর্গ থাকায় উক্ত গড়ের নাম "মহাস্থানের গড়" হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয় যে, ঐরূপ কারণেই বরদানদীতটস্থ "মহাস্থান" নামেরও উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

বগুড়াজেলান্তর্গত মহাস্থান এইরূপে অতি প্রাচীনকাল হইতে পঞ্চক্রোশী পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করায় কালক্রমে জনশ্রুতিমূলে ইহার বহুবিধ অলৌকিক মাহাত্ম্যসমূহ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া থাকিবে, এবং সম্ভবতঃ করতোয়া-মাহাত্ম্য রচয়িতা আরও পরবর্ত্তীকালে ঐ সমস্ত প্রবাদমূলক অলৌকিক মাহাত্ম্য সংগ্রহ পূর্ব্বক তৎসাহায্যে তাঁহার গ্রন্থখানি রচনা করিয়া থাকিবেন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন।

নবম সাম্বৎসরিক অধিবেশন

স্থান—সভার নবনির্ম্মিত কার্য্যালয়।

সময়—বুধবার, ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বঙ্গাব্দ, অপরাহ্ণ ৫টা

উপস্থিতি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই সভাপতি
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম এ, আই, সি, এস সভাপতি
কবিসম্রাট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন
শ্রীযুক্ত ইউসুফ এম, এ, আই সি, এস্ ডিষ্ট্রিক্ট জজ, রঙ্গপুর
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র এম, এ, বি এল্ সবর্ডিনেট জজ
এ, এফ, এম, আবদুল আলী এম, এ; এম্, আর, এ, এস্; এফ্, আর, এইচ, এস্; এফ্, আর, জি, এস; এফ, আর, এস, এল্, ইত্যাদি

যুক্ত শীতলাকান্ত গাঙ্গুলী এম এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট
„ ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট
„ জিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার এম এ,
„ শ্রীশচন্দ্র রায় মুন্সেফ
„ কুমার যামিনীবল্লভ সেন জমিদার
„ অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার
„ বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার
„ গুরুপ্রসন্ন লাহিড়ী জমিদার
„ মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার
„ রাধারমণ মজুমদার জমিদার
„ নৃপেন্দ্রনারায়ণ রুদ্র জমিদার
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার
„ নরেশচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার
„ পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ
„ পণ্ডিত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ
„ পণ্ডিত একক‌ড়ি স্মৃতিতীর্থ

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী রায় এম এ বি এল
„ গোপালচন্দ্র ঘোষ বি এ
„ মৌলবী হাফেজউল্লা
„ নগেন্দ্রনাথ সেন বি এ
„ সিদ্ধেশ্বর সাহা
„ ললিতকুমার নিয়োগী এম এ
„ যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি এল
„ যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত „
„ যোগেশচন্দ্র সরকার „
„ দুর্গাদাস বাগ্‌চী „
„ জিতেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী বি এল
„ রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য বি এল „
„ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল
„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় „
„ দীননাথ বাগ্‌চী বি এল
„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল
„ খান তসলিম উদ্দীন আহম্মদ বাহাদুর
„ রাধাকৃষ্ণ রায় উকীল

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায় বি, এল্
„ ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি. এল্
„ অক্ষয়কুমার সেন বি, এল্
„ আশুতোষ মজুমদার বি, এল্
„ পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল
„ প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল
„ রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার
„ মথুরানাথ দে মোক্তার
„ বসন্তকুমার ভৌমিক এল এম্ এস
„ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্ এম্ এস্
„ দুর্গাদাস লাহিড়ী এল্ এম্ এস্
„ যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী ডাক্তার
„ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন
„ ডাঃ মহম্মদ মোজাম্মল
„ ডাঃ সতীশচন্দ্র মজুমদার
„ চন্দ্রমোহন ঘোষ
„ হরিনাথ অধিকারী
„ কালীকান্ত বিশ্বাস সব ইন্‌স্পেক্টার অব পুলিশ
„ মোহিনীকুমার বসু সব ওভারসিয়ার
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
„ যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ

শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর নাগ ষ্টেশন মাষ্টার
„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব-সিদ্ধান্তবারিধি
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ
„ ভগীরথ ব্রহ্মচারী
„ কেশবলাল বসু
„ বৈকুণ্ঠচন্দ্র সেন
„ হরিদাস মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্
„ লোকনাথ দত্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডিমলারাজ
„ গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত
„ শশিভূষণ দত্ত অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট
„ রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্, বাহাদুর
„ মদনগোপাল নিয়োগী
„ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন
„ প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল
„ নগেন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদক ছাত্রসভা
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়।

১। প্রারম্ভিক সঙ্গীত। ২। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই, মহোদয় কর্ত্তৃক নবনির্ম্মিত চিত্রশালার দ্বারোদ্ঘাটন। ৩। এই সভার অন্যতম ছাত্রসদস্য শ্রীমান বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক চিত্রশালার সংগৃহীত মূর্ত্তি ও মুদ্রার পরিচয়-প্রদান। ৪। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের সদস্যবৃন্দ কর্ত্তৃক কবিসম্রাট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-রাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ের অভিবন্দনা। ৫। সভাপতি বরণ। ৬। সভা-পতির অভিভাষণ। ৭। সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক নবম সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ৮। গত ৮ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ৯। বিশিষ্ট, অধ্যাপক, সহায়ক ও ছাত্রসদস্য নিয়োগ। ১০। সাধারণ সদস্য-নির্ব্বাচন। ১১। ১৩২১ বঙ্গাব্দের কর্ম্মাধ্যক্ষ

নিয়োগ। ১২। ১৩২১ বঙ্গাব্দের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠন। ১৩। সভার চিত্র-শালাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক ১৩২০ বঙ্গাব্দের সংগৃহীত ঐতিহাসিক দ্রব্যাদির প্রদর্শন। ১৪। ছাত্র সদস্যগণ মধ্যে প্রবন্ধ রচনার জন্য পুরস্কার বিতরণ। ১৫। প্রবন্ধ—(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম, এ, মহাশয়ের রচিত কামরূপ-পতি "বনমালের তাম্র-শাসন আলোচনা"। (খ) শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের রচিত "তন্ত্রের বিশেষত্ব"। (গ শ্রীমান্ বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক রচিত "বাঙ্গলায় ভাষান্তর।" ১৬। সমাগত সাহিত্যিকগণের বক্তৃতাদি। ১৭। বিবিধ। ১৮। সভাপতির মন্তব্য। ১৯। সভা-পতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

২০ জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩২১ বঙ্গাব্দ তারিখে অপরাহ্ণ ৫টার সময় রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের নবম বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। রঙ্গপুরের সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম এ; আই সি, এস; জজ শ্রীযুক্ত ইউসফ আই সি এস; সবজজ, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, জমিদার, উকীল, মোক্তার, ব্যবসায়ী, বিদ্যালয়ের ছাত্র প্রভৃতির সমাগমে পরিষদের সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য হারমোনিয়ম সহযোগে সভাস্থল মুখরিত করিয়া নিম্নলিখিত সঙ্গীতের দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রের চিত্ত-বিনোদন করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

যখন নয়ন আঁধার মগন মোহে ঢাকি আঁখি তারা;
গগন ভুবন তারকা তপন কোথা হয়ে যায় হারা;
সে ঘোর অন্ধ তমসা উজলি কাহার মূরতিখানি
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী।
প্রথম যখন নীরব কণ্ঠে ফুটিত না বাণী ভাষা
হৃদয়ে উঠিয়া মিটিয়া যাইত আকুল অযুত আশা।
কাহার মধুর-স্পর্শে হইত মুখর হৃদয়খানি
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী
শব্দে যাহার মুগ্ধ ধরণী ছন্দে রাগিণী ক্ষরে
শ্যামা-সারী-শুক গায় যার সুর ভাগীরথী কলস্বরে
অযুত ভক্তে হৃদয় রক্তে ধোয় যে চরণখানি
আমারবঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী
গৌড়-গর্ব্ব লুপ্ত আজিকে নাই সে অতীত মহিমা
নদীয়া গেছে তার সাথে গেছে বঙ্গ-প্রাণের গরিমা
কঙ্কালে আজ কে দেয় জীবনী শুনায়ে আশার বাণী
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী

গেছে ভেঙ্গে যদি সুখের স্বপন জাগি থাক্ শুধু স্মৃতি
টুটিতে এ মোর সে যদি বা গাহে নবীন প্রাণের গীতি;
অতীত কাহিনী মুগ্ধ মরমে গাহে অভয়-বাণী
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল রাণী
বহুদিন পরে ফিরিয়াছি সবে আবার আপন ঘরে.
জননী দাঁড়ায়ে ভগ্ন কুটীরে আশা-বরাভয় করে,
সাধনা মোদের মোক্ষ মোদের এস মা, জগত রাণি !
এস মা বঙ্গবাণি জননি অখিল জ্ঞানের রাণি ।

অতঃপর সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল বাহাদুর সমবেত বিদ্বজ্জনমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—

সমাগত সুধি ও বিদন্মণ্ডলি! আজ আমাদিগের এই ক্ষুদ্র শাখা-পরিষদের সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহাশয়ের অনিবার্য্য অনুপস্থিতি-নিবন্ধন এই দীনের উপর আপনাদিগের অভ্যর্থনার ভার পড়িয়াছে। বস্তুতঃ আমি এই বিষম ভার বহন করিতে অসমর্থ হইলেও এই ক্ষুদ্র শাখা-পরিষদের প্রতি আপনাদের উদার ও ঐকান্তিক স্নেহ ও অনুরাগ উপলব্ধি করিয়াই আমার ধৃষ্টতা প্রকাশের জন্য ক্ষমা ভিক্ষাকরতঃ আপনাদিগের নিকট এই সামান্য অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি।

আজ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের নবমবার্ষিক অধিবেশন-উপলক্ষে যে সকল সুধী ও মনস্বিগণ এই অসহ্য আতপ-তাপ অবহেলা এবং নানাবিধ অসুবিধা ও ক্লেশ অবাধে উপেক্ষা করিয়া এই ক্ষুদ্র পরিষদের কার্য্য-সাফল্যের নিমিত্ত এখানে অনুগ্রহপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও আদর প্রদর্শন করিতে আমরা চেষ্টা করিয়াও যে সমর্থ হইব সে আশা দুরাশামাত্র। আপনারা এখানে উপস্থিত হইয়া এই পরিষৎকে যেরূপ গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তজ্জন্য এই পরিষৎ আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা-হৃদয়ে ধন্যবাদ করিতেছেন। আশা করি, আপনাদের নিজগুণে আমাদের সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

সর্ব্বনিয়ন্তার একান্ত অনুকম্পায় প্রতি সাম্বৎসরিক উৎসবেই এপর্য্যন্ত আমরা উপযুক্ত কর্ণধার পাইতে সমর্থ হইয়াছি; কিন্তু গৌরবের সহিত বলিতে পারি, যে এবারকার কর্ণধার সংগ্রহে আমাদের সফলতা আশাতিরিক্ত হইয়াছে। সেই স্বনামধন্যপুরুষ আপনাদের সকলের নিকটেই বিশিষ্টরূপে পরিচিত। তাঁহাকে কর্ণধারস্বরূপে পাইয়া এই দীন পরিষৎ যে কিরূপ গৌরবান্বিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করা কঠিন।

বহু চেষ্টার পর মঙ্গলময়ের কৃপায় এই দীন পরিষৎ একটি ক্ষুদ্র আগার ও museum প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইয়াছে। উক্ত museum উদ্ঘাটন করাই এবারকার বাৎসরিক অধিবেশনের একটি প্রধান কার্য্য। উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তেই যে এই কার্য্যের ভার পড়িয়াছে;

তাহা আপনারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন। তাঁহার পদ-রজে এই ক্ষুদ্রাগার আজ ধন্য হইয়াছে।

আনন্দচিত্তে ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত এই পরিষদের পক্ষে আপনাদিগকে পুনরায় অভিবাদন ও অভ্যর্থনা করিতেছি। এক্ষণে আপনারা সভাপতি-নির্ব্বাচনপূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল মহোদয় প্রস্তাব করিলেন যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই অধিবেশনের সভাপতির পদ গ্রহণ করুন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি এল মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ও আনন্দে উহা পরিগৃহীত হয়। অনন্তর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি, আই, ই মহোদয় তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়ের সহিত বলিলেন—সাহিত্য-পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলি, অদ্য আপনারা আমার প্রতি যে সম্মানজনক কার্য্যভার প্রদান করিয়াছেন, আমাকে যেরূপ অচিন্তিত উপায়ে সম্মানিত করিয়াছেন, ইহার জন্য উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের সাধ্য আমার নাই। বলিতে কি, এইরূপ সম্মান অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক, আপনাদের প্রদত্ত সম্মানের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

অতঃপর স্থানীয় সুযোগ্য ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পরম বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম এ আই সি এস্ মহোদয় রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠিত চিত্রশালার দ্বারোদ্ঘাটনার্থ সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করিলে কুণ্ডীর অন্যতম ভূমাধিকারী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় উহার সমর্থন করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে চিত্রশালার দ্বারোদ্ঘাটন প্রস্তাব পরিগৃহীত হইলে পরিষদের কতিপয় ছাত্রসদস্য যন্ত্র-সহযোগে সুললিত তান-লয়ে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গান করেন।

নবীন প্রভাতে আলোক পরশে জাগিয়া উঠেছে প্রাণ।
তোমার দুয়ারে এসেছে ভক্ত কণ্ঠে আরতি-গান।
এসেছে ভরিয়া পূজার অর্ঘ্য মন্দার-ফুলহারে।
এনেছে ভক্তি দেহের শক্তি অঞ্জলি-উপচারে
মন্দির ওমা, কর মা, মুক্ত ধর এ ভক্তি-দান।
অতীতের স্মৃতি কুড়ায়ে রচেছি স্বপনের মধু ছবি
এ ঘোরা নিশীথে হেরিতেছি মাগো! নব গৌরব-রবি
শত বরষের ব্যাধি দূরে গেছে চরণ করিয়া ধ্যান!
শ্মশানে আবার রচিব স্বর্গ কঙ্কাল তাই কুড়ায়ে
তোমার চরণে এনেছি জননি! মোহের ভস্ম উড়ায়ে
নাই মা, হেথায় কপট-সাধনা মোহের আবেশ ভাণ

দু হাতে বিলায়ে মঙ্গল শিবে! এস মা কল্যাণকারিণি
তোমার আলয়ে এস যুগান্তের বহিয়া মহিমা-কাহিনী।
এস মা! জ্ঞান উজ্জ্বল-জ্যোতিতে অজ্ঞতা করি ম্লান
এস মা বিদ্যা, এস মা সিদ্ধি ভক্ত গাহিছে গান।

সঙ্গীত-অন্তে সভাপতি মহাশয় দ্বারোদ্ঘাটনরূপ শুভানুষ্ঠানের নান্দীরূপে জগতের প্রাচীনতম যুগে চিত্রশালার উৎপত্তি, উহার ক্রমোন্নতি ও সার্থকতা-সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা সভার মুখপত্রে নবম ভাগ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অনন্তর সভাপতি মহাশয় নবনির্ম্মিত চিত্রশালার রৌপ্যনির্ম্মিত কুঞ্চিকাবদ্ধ সুসজ্জিত দ্বারদেশে সদস্যবৃন্দসহ উপনীত হইলে সম্পাদক মহাশয় তাঁহার হস্তে রৌপ্যনির্ম্মিত চাবী প্রদান করেন এবং ঘন ঘন আনন্দ-ধ্বনি ও করতালির মধ্যে তিনি চিত্রশালার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন। সভাপতির অনুবর্ত্তী হইয়া সমবেত আবালবৃদ্ধ সকলেই বিশেষ যত্নপূর্ব্বক সমাহৃত ধাতুমূর্ত্তি, প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি, শিলালিপি, সুন্দর কারুকার্য্যসমন্বিত ইষ্টক ও মৃৎপাত্র, আলোক-চিত্র প্রভৃতি দর্শন করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম ছাত্রসদস্য শ্রীমান্ বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সংক্ষেপে চিত্রশালার সংগৃহীত প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি, মুদ্রা ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শনাদির পরিচয় তাঁহার লিখিত পরিচয়জ্ঞাপক বিবরণ সভার মুখপত্রের নবম ভাগ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

চিত্রশালার দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য শেষ করিয়া সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ সভাস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহামহোপাধ্যায় কবিসম্রাট্ পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ের কবিসম্রাট্ উপাধি প্রদানহেতু রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে এক অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এই অভিবন্দনার প্রসঙ্গতঃ বলিলেন, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদ্ কবিসম্রাট্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়কে এক অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাকে দুই একটি কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। কবিসম্রাট্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন সমগ্র রঙ্গপুর জেলায়—কেবল রঙ্গপুর জেলায় কেন, সমগ্র বঙ্গদেশে এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষে সুপরিচিত। সুতরাং তাঁহার পরিচয় প্রদান নিতান্তই ধৃষ্টতার পরিচায়ক ইহা ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক সভার রীতি-রক্ষার জন্য আমাকে দুই চারিটি কথা বলিতে হইবে। কবিসম্রাট্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়কে অনেকেই জানেন। তিনি যে কেবল শাস্ত্রীয় পণ্ডিত তাহা নহেন, রঙ্গপুরের অতীত ও বর্ত্তমান, প্রাচীন ও আধুনিক সর্ব্বকার্য্যের সহিত তাঁহার বিশেষভাবে সংস্রব আছে। স্থানীয় সমস্ত হিতানুষ্ঠানেরই তিনি অগ্রণী; সুতরাং কেবল সাহিত্য পরিষৎ কেন সমগ্র রঙ্গপুর জেলা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। রঙ্গপুরের অধিবাসিগণ তাঁহাকে পূর্ব্বাপর সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। তাঁহার

প্রতি সম্মান প্রদর্শন করায় তিনি নিজে কতদূর সম্মানিত হইয়াছেন বলিতে পারি না, তবে যাঁহারা তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চিত গৌরবলাভ করিয়াছেন। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদও এ বিষয়ে সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার ন্যায় সভাপতি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। কিন্তু একমাত্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বিকশিত হয় নাই; কি সাহিত্য, কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি সর্ব্বত্রই তিনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সংস্কৃত-শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের বিষয় সকলেই অবগত আছেন। তিনি বঙ্গভাষারও অক্লান্ত সেবক। যদি কোনও সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে দান করিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার অতুলনীয় কবিত্ব-প্রতিভা সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছে। কবিসম্রাট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয় সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত। কিছুদিন পূর্ব্বে কাশী-ধামে তত্রত্য সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর এক সভা হইয়াছিল। এই সভায় পণ্ডিতগণ একমত হইয়া তাঁহাকে "কবিসম্রাট" উপাধি প্রদান করেন। কাশী সমগ্র ভারতবর্ষের বিদ্যাপীঠ; তথাকার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া তাঁহাকে যে উপাধি প্রদান করিয়াছেন, সে উপাধি সমগ্র ভারতবর্ষের প্রদত্ত ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

কবিসম্রাট্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন সংস্কৃত ভাষায় যে সকল কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়াছেন, কাশীর বিদ্বজ্জন-সভায় সেই সকলের আলোচনাও হইয়াছিল। এই সকল পুস্তক যাঁহারা একবার পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন সেগুলি কত সরল ও কত মধুর। সৌন্দর্য্য ও সরলতায় ইহাদের মধ্যে যে কোনও কবিতা ভারতের প্রাচীন কবিদিগের কবিতার সহিত স্পর্দ্ধা করিতে পারে।

নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ মহামহোপাধ্যায় মহোদয়কে "পণ্ডিতরাজ" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। রাজ শব্দ চন্দ্রবাচক; সুতরাং আমরা পণ্ডিতরাজ না বলিয়া পণ্ডিতচন্দ্রও বলিতে পারি। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী-প্রদত্ত এই উপাধির মর্ম্ম ইহাই মনে হয়, একদিন যেখানে গৌরচন্দ্র সমুদিত হইয়া সমগ্র নবদ্বীপধাম ধর্ম্ম ও ভক্তির প্রভায় উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, আজ সেখানে পণ্ডিতচন্দ্র সমুদিত হইয়া জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য-প্রভাবে চতুর্দ্দিক সমুজ্জ্বল করিলেন।

ইহার পর স্বয়ং রাজরাজেশ্বর ভারতসম্রাট্ ইঁহার অসামান্য গুণের পরিচয় পাইয়া গৌরব-জনক "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা এই সকল উপাধি দান করিয়াছেন তাঁহারাও আপনাদিগের গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক সম্মানিত হইয়াছেন। কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে যে "কবিসম্রাট উপাধি প্রদান করিয়া কাব্যজগতে তাঁহার সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়াছেন, আজ আমরা তাহা স্মরণ করিয়া বিশেষভাবে গৌরব অনুভব করিতেছি। হৃদয়ের সামান্য কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ সাহিত্য-পরিষদের সদস্যবৃন্দ তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র প্রদানপূর্ব্বক অভিবন্দনা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। পরিষদের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় জীবনস্বরূপ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় উহা পাঠ করিবেন।

পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় অভিনন্দনপত্র পাঠপূর্ব্বক পূজনীয় কবিসম্রাটকে ভক্তি ও প্রণিপাত সহকারে তাহা প্রদান করেন। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

অতঃপর কবিসম্রাট্ মহোদয় তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়, ঔদার্য্য, সরলতা ও তেজস্বিতার সহিত প্রশস্তি-পত্রের নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন,—

মাননীয় সভাপতি, সমবেত সুধীবৃন্দ, শিশুকালে যখন আমার নামকরণ হইয়াছিল, জন্মের দশম দিবসে পিতা যখন নাম প্রদান করিয়াছিলেন, তখন জ্ঞান ছিল না, নামের অর্থ বুঝিতাম না। যখন অধিক বয়স হইল তখনও বুঝিতে পারিলাম না, পিতা কি ভাবিয়া "যাদবেশ্বর" নাম প্রদান করিলেন। বুঝিলাম উহা অর্থবিহীন ; কিন্তু অর্থবিহীন হইলেও পিতৃদত্ত উপাধি ফেলিতে পারি নাই। তারপর যখন বিদ্যাপীঠে গমন করিলাম, জানি না, কেন গুরুদেব স্বতঃই প্রীত হইয়া "তর্করত্ন" উপাধি প্রদান করিলেন। গুরুদেবকে কোনও দিন সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, তথাপি তিনি এই উপাধি প্রদান করিলেন। তখন কোনও টাইটেল প্রদানের রীতি বা পরীক্ষা প্রদানের বিধি ছিল না, তথাপি গুরুদেব এই উপাধি প্রদান করায় ভাবিলাম এ কি হইল ? বুঝিলাম শৈশবে অজ্ঞানাবস্থায় যে ভ্রম করিয়াছি, পরিণত বয়সে উহা পরিত্যাগ করিবার অধিকার নাই—বুঝিলাম পিতৃদত্ত উপাধি যাদবেশ্বরের ন্যায় ইহাও অর্থশূন্য। যখন পিতৃদত্ত উপাধি পরিত্যাগ করিতে পারি নাই, তখন গুরুদত্ত উপাধি পরিত্যাগ করা চলিবে না। ইহার পর শ্রীমান্ ভবানীপ্রসন্ন নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের প্রদত্ত "পণ্ডিতরাজ" উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন। কথায় বলে "কাণাছেলের নাম পদ্মলোচন" আমারও মনে হয়, নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী আমাকে নিতান্ত ছাত্রের ন্যায় স্নেহভাজন মনে করিয়া "বিদ্যাদিগ্‌গজ" কি তত্তুল্য একটা অর্থবিহীন উপাধি প্রদান করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে পরিণত বয়সে জ্ঞানবুদ্ধি সত্ত্বেও এই অর্থশূন্য উপাধি গ্রহণ করিলে কেন ? উত্তরে ইহাই বলিব, যখন পিতৃদত্ত উপাধি গ্রহণ করিয়াছি, যখন গুরুদত্ত উপাধি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিতে পারি নাই তখন কৈলাসচন্দ্র তর্করত্নের বাসভূমি, গদাধর ও শিরোমণি ভট্টাচার্য্যের লীলাক্ষেত্র, মিথিলার দর্পহারী ন্যায়শাস্ত্রমুখরিত পবিত্র তীর্থভূমি ভারতের গুরুপদবাচ্য নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর আদেশ অমান্য করি কিরূপে ? তার পর কাশী। কাশী বিশ্বনাথের স্থান—যত পাগলা-পাগলীর কাণ্ড। বৃদ্ধ পণ্ডিতেরা কাশীতে থাকিয়া মনে করিলেন, ইহার যখন বয়স অল্প, তখন আমাদের শ্রাদ্ধাদি বেশ করিতে পারিবে। তাই ধরিয়া বাঁধিয়া একটা উপাধি দিয়া দিলেন। বুঝিলাম, ইহাও পিতৃদত্ত উপাধি, পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। অনন্তর সম্রাট্-প্রদত্ত উপাধি। রাজরাজেশ্বর প্রদত্ত এই "মহামহোপাধ্যায়" উপাধির অর্থ জানি না। ম্যাজিষ্ট্রেট সম্ভবতঃ কমিশনরকে লিখিলেন "আমি ইঁহাকে জানি, ইনি বিদ্বান লোক।" কমিশনর ম্যাজিষ্ট্রেটের কথায় সমর্থন করিলেন। ছোটলাট উহাতে সায় দিলেন, সুতরাং আর কিছু বাকী থাকিল না। অবশ্য ইঁহারা কতদূর সংস্কৃত জানেন তাহা বিশদভাবে বিবেচনার বিষয়।

যাহা হউক এ বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার নাই। আপনারা আমার ন্যায় বৃদ্ধের মস্তকে গৌরবের মুকুট পরাইয়া কেন আমাকে বিড়ম্বিত করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু অর্থহীন হইলেও যখন এতগুলি উপাধি প্রত্যাহার করিতে পারি নাই, তখন আপনাদিগের প্রদত্ত উপহারও পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমার আর অধিক কিছু বক্তব্য নাই।

অতঃপর পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় নবম বর্ষের কার্য্য-বিবরণ হইতে সংক্ষেপে সভার কর্ম্ম-পরিচয় প্রদান করেন। ঐ কার্য্য-বিবরণ যথাসময়ে মুদ্রিত হইবে।

কার্য্য-বিবরণের আলোচনা-প্রসঙ্গে ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শীতলাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলেন যে, সম্পাদক মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে যে বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীর প্রয়োজনীয় অংশ পাঠ করিলেন, আপনারা উহা হইতে সাহিত্য-পরিষদের অবস্থা অবগত হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিতে অগ্রসর হওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতামাত্র। বিরাট হর্ম্ম্যনির্ম্মাণ-ব্যাপারে যেমন সামান্য ভারবাহী শ্রমজীবিরও প্রয়োজন আছে, সেইরূপ আমার ন্যায় অক্ষম ব্যক্তিরও দুই একটি কথা বলিবার অধিকার থাকিতে পারে, ইহা মনে করিয়া আমি নিতান্ত সঙ্কোচের সহিত অগ্রসর হইয়াছি। আপনারা সকলেই জানেন, স্থানীয় সাহিত্য-পরিষদের শুভ চেষ্টার ফলে রঙ্গপুরে ক্রমশঃ অধিকতর শিক্ষার বিস্তার হইতেছে। রঙ্গপুরে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমাজে বিশেষভাবে শিক্ষোন্নতি সাধিত হইয়াছে। মাতৃস্বরূপিণী দানশীলা মন্থনার ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা ভবসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী, ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী মিসেস্ দে ও আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যোৎসাহী সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী মিসেস্ গুপ্ত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, রঙ্গপুরবাসিগণ তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। শিক্ষাই সাহিত্যোন্নতির ভিত্তিস্বরূপ। রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারিগণ এ বিষয়ে যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা রঙ্গপুরবাসীর প্রভূত গৌরবের কথা। স্বর্গীয় দানশীল কাকিনাধিপতি রাজা মহিমারঞ্জনের শিক্ষা-বিস্তারের কথা মনে হইলে আমাদিগের হৃদয়ে রোমের সম্রাট্ অগষ্টাস সিজার অথবা ভারতেশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়ার চিত্র স্বতঃই উদিত হয়। টেপার বদান্য ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অন্নদামোহন রায়চৌধুরীর রঙ্গপুর কলেজ স্থাপনার্থ রাজোচিত দানের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়া রঙ্গপুরের অধিবাসিগণ বিপুল গৌরব অনুভব করিয়াছেন। আমি আশা করি, সমগ্র বঙ্গদেশের ভূস্বামিগণ তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ-পূর্ব্বক ধন্য হইবেন। পরিষদের বিগত বর্ষের কার্য্য-বিবরণ সম্পূর্ণ আশাপ্রদ; উহা গ্রহণার্থ সানন্দে আমি প্রস্তাব করিতেছি।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সভাপতি মহাশয়ের সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক এই প্রসঙ্গে বলেন যে, রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ উত্তরোত্তর যেরূপ কর্ম্মশীলতা প্রদর্শন করিতেছেন তাহা প্রকৃতই আশাসকারী। এই প্রসঙ্গে তিনি মূল সভার সহিত এই সভার সম্বন্ধ রক্ষা-

বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিলে সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সন্তোষজনক উত্তর দানে তাঁহার অলীক সন্দেহের অপনয়ন করেন।

খান্ মৌলবী তসলিম্ উদ্দীন আহাম্মদ বি এল বাহাদুর কার্য্য-বিবরণ গ্রহণার্থ প্রস্তাবের সমর্থন করিতে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,—শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয় আমাকে গত বৎসরের কার্য্য-বিবরণ সমর্থন করিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের সদস্যদিগের মধ্যে যদি কাহাকে অপরাধী নির্ণয় করিতে হয়, তবে সর্ব্বপ্রথমে আমাকেই অপরাধী নির্দ্দেশ করিতে হইবে।" কারণ বিগত একবৎসর কালের মধ্যে আমি পরিষদের জন্য কিছুই করিতে পারি নাই। অতঃপর সাহিত্য সম্বন্ধে মহম্মদ পয়গম্বরের কয়েকটি উক্তির উল্লেখ করিয়া খান্ বাহাদুর প্রাগুক্ত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করেন। সানন্দে ও সর্ব্বসম্মতিতে উহা পরিগৃহীত ও সভাপতি কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশমত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই সভার সহায়ক ও ছাত্র-সদস্যরূপে গৃহীত হন।

সহায়ক সদস্য { শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
　　　　　　　" কেশবলাল বসু

ছাত্রসদস্য— " প্রবোধচন্দ্র সান্যাল বি এ

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

সদস্য	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীবিশ্বম্ভর নাগ ষ্টেশনমাষ্টার	শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	শ্রীরায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল বাহাদুর
শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	"

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশমত নিম্নলিখিত সদস্যগণ ১৩২১ বঙ্গাব্দের জন্য রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যকারী নিযুক্ত হউন।

সভাপতি কবিসম্রাট্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন

সহঃ সভাপতি {
" যুক্ত শরৎকুমার রায় এম, এ,
" শরদিন্দুনারায়ণ রায়সাহেব এম এ প্রাক্ত
" অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল
" রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ বাহাদুর

পত্রিকাধ্যক্ষ " পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

কোষাধ্যক্ষ " দি রঙ্গপুর-ব্যাঙ্ক-লিমিটেড

চিত্রশালাধ্যক্ষ " জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাধ্যক্ষ	শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু
ছাত্রাধ্যক্ষ	„ পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ
	„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
	„ এককড়ি স্মৃতিতীর্থ
সহঃ সম্পাদক	„ কবিরাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন
	„ মদনগোপাল নিয়োগী
	„ কালীকান্ত বিশ্বাস
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক	„ আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই
ঐ সহকারী	„ দীননাথ বাগচী বি, এল
	„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল

এই প্রস্তাব উত্থিত হইলে কবিসম্রাট্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ মহোদয় বিনয় সহকারে বলিলেন যে, তাঁহার বয়স অধিক হইয়াছে; পরন্তু অনেক সময়ে তাঁহাকে কাশী ও অন্যান্য স্থানে থাকিতে হয় সুতরাং তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত না করিয়া রঙ্গপুরের সর্ব্বজনপ্রিয় বিদ্যোৎসাহী ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম এ, আই, সি, এস মহোদয়কে সভাপতি নিযুক্ত করিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে। পণ্ডিতরাজ মহোদয়ের এই সংশোধিত প্রস্তাব শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে সদস্য-দিগের সম্মতিক্রমে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এইরূপে কবিসম্রাট্ মহোদয়ের স্থলে রঙ্গপুরের সুযোগ্য কালেক্টর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম এ, আই সি, এস মহোদয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের জন্য সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

অনন্তর সম্পাদক মহাশয় সদস্যগণের ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত সমিতির সদস্যগণের নিম্ন-লিখিত নাম-তালিকা পাঠ করিলেন—

১। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম এ, পি, আর এস
২। „ পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম, এ
৩। „ কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন কাব্যতীর্থ শাস্ত্রী এম, এ
৪। „ পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ
৫। „ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এমএ, বিএল
৬। „ চন্দ্রমোহন ঘোষ
৭। „ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এম, এ
৮। শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার জমিদার
৯। „ শীতলাকান্ত গাঙ্গুলী এম, এ
১০। „ পঞ্চানন সরকার এম, এ বি এল
১১। „ রায় মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী বাহাদুর
১২। „ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি, আর এস
১৩। „ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী
১৪। „ সৈয়দ আবদুল ফতাহ সাহেব
১৫। „ বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি এল
১৬। „ পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী

১৭। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী রায় এম এ, বিএল
১৮। " বসন্তকুমার লাহিড়ী
১৯। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি এ
২০। " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক ও তাঁহার সহকারীদ্বয় ব্যতীত অন্য ১৫ জন কর্ম্মচারী ও সদস্য-দিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত ২০ জন সদস্য লইয়া ১৩২১ বঙ্গাব্দের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হয়। ইহার পর সম্পাদক মহাশয় ঘোষণা করেন যে, এই সভার অন্যতম ছাত্র-সদস্য শ্রীমান শ্যামাপদ বাগছী নৈতিক ও আর্থিক উন্নতিবিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া শ্রীলশ্রীযুক্ত মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কর্ত্তৃক প্রদত্ত সুবর্ণপদক এবং শ্রীমান্ কালীপদ বাগছী রাজা রামমোহন রায়ের স্বদেশ-হিতৈষণা ও রঙ্গপুরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীযুক্ত নবাবজাদা এ এফ এম আবদুল আলী এম এ মহোদয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত ১৫৲ টাকা মূল্যের রৌপ্য পদক লাভ করিবার অধিকারী হইয়াছেন। পদক দুইটি প্রস্তুত হইয়া না আসায় বর্ত্তমানে বিতরণ করা সম্ভবপর হইল না।

সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে আই সি মহোদয় গভর্ণমেণ্ট-পক্ষ হইতে গবেষণামূলক সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য ১০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিগতবর্ষে কেহই এই পুরস্কার লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

সাহিত্য-পরিষদের সহকারী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ৫৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। ঐ ৫৲ টাকা মূল্যের পুস্তক ক্রয় করিয়া নিম্নলিখিত আবৃত্তির জন্য নিম্নলিখিত ছাত্রগণকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আবৃত্তির জন্য পুরস্কার

চাষার অহঙ্কার	শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার সরকার ,, কামিনীকুমার সরকার
দশাবতার-স্তোত্র ও ভারতবর্ষ	,, প্রবোধকুমার ঘোষ " ইন্দুভূষণ সরকার
নূতন বছর	" সতীশচন্দ্র কর্ম্মকার " অনিলকুমার সেন

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত তিনটি প্রবন্ধ পাঠের জন্য উপস্থিত করা হইয়াছিল।

১। বনমালদেবের তাম্রশাসন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম এ
২। বাঙ্গালায় ভাষান্তর " বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৩। তন্ত্রের বিশেষত্ব ,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ

প্রবন্ধত্রয়ের মধ্যে শ্রীমান্ বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্বলিখিত "বাঙ্গালায় ভাষান্তর" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম এ মহাশয়ের রচিত বনমাল-

দেবের তাম্রশাসন শীর্ষক গবেষণামূলক প্রবন্ধের সারাংশ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করেন। অপর প্রবন্ধটি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

অতঃপর সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহোদয় বলিলেন,—"রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের নবম সাম্বৎসরিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে রঙ্গপুরে আগমন করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে সত্য সত্যই আনন্দ হইতেছে। পরিষদের পত্রিকাদি পাঠ করিয়া পরিষদের কার্য্যকারিতা-সম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণা হইয়াছিল, রঙ্গপুরে আসিয়া সেই ধারণা আরও বেশী হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ ভবিষ্যতেও যে অধিকতর উন্নতি লাভে সমর্থ হইবেন, তাহা আশা করা যাইতে পারে।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের সহিত মূল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধ-নির্ণয় লইয়া একটু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আমার মনে হয়, মূল পরিষদের সহিত চিঠিপত্রের আদান-প্রদানে রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে আপনাকে শাখা বলিয়া স্বীকার করা ভাল। তবে ইহাও ঠিক, অনেক সময় শাখার যখন উন্নতি হয়, তখন মূলের সহিত সম্বন্ধ অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু তখন মূলের একটু অবনতি হইয়া থাকে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় এসিয়াটিক্ সোসাইটি স্থাপিত হয়। ইহার কতিপয় সভ্য যখন কার্য্যকালের অবসানে স্বদেশে গমন করেন, তখন তাঁহারা বিলাতে ইহার এক শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন। কালক্রমে ইঁহারা আপনাদিগকে "রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি" বলিয়া ঘোষণা করেন এবং মূল সোসাইটির সহিত সমস্ত সম্বন্ধ অস্বীকার করেন। ইহার পর বোম্বাই, সিংহল, সিঙ্গাপুর, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাইএর লোকেরা তাঁহাদিগের সভার নাম দিলেন "বোম্বাই ব্রাঞ্চ অব্ দি রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটি" মান্দ্রাজের লোকেরা নাম দিলেন, "মান্দ্রাজ ব্রাঞ্চ অব্ দি রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটি" ইত্যাদি। কালক্রমে ইংলণ্ডের শাখা সভা কলিকাতার সভাকে পত্র লিখিবার সময় লিখিতে লাগিলেন,—"রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ ক্যালকাটা" এইরূপে বিলাতে শাখা-সভার যত উন্নতি হইতে লাগিল, আমাদিগের ততই অবনতি হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে মূল এসিয়াটিক্ সোসাইটির নাম হইল, "দি এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গল" কার্য্যতঃ বোম্বাই, মান্দ্রাজ, সিংহল, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদিগের কার্য্যক্ষেত্র তত্তৎ স্থানেই সন্নিবদ্ধ আছে। বোম্বাইএর রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটিকে "রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বোম্বাই" মান্দ্রাজের "রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ মান্দ্রাজ" ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন,—রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের আর্থিক অবস্থা যেরূপ উন্নত তাহা রঙ্গপুরের পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। এমন কি সমগ্র বঙ্গদেশ রঙ্গপুরের কার্য্যকারিতা ও সফলতায় গৌরব অনুভব করিতে পারেন। যাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় স্থানীয় সাহিত্য-পরিষদের অনুষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে যোগদান করেন, তাহার জন্ত চেষ্টা করা

প্রয়োজন। মূল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদস্য সংখ্যা আড়াই হাজারের অধিক হইবে না, কিন্তু রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ ইতি মধ্যেই চারিশতাধিক সদস্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এই চারিশতের মধ্যে বড় জোর ৮।১০ জন কাজের লোক পাওয়া যাইতে পারে। যেখানে বিশেষ কর্ম্মোৎসাহী লোক বিদ্যমান আছেন, সেখানে একশতের মধ্যে ৪।৫ জনের অধিক কর্ম্মনিষ্ঠ লোক পাইবার আশা করা যাইতে পারে না। আজকাল নানারূপ অভাব অনাটনের মধ্যে প্রবল জীবন সংগ্রামের ফলে লোকের অবসরও বড় কম হইয়াছে। এইজন্য পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে যত্নপর হওয়া প্রয়োজন।

স্থানীয় ধনী-সন্তানগণ পরিষদে অর্থ-সাহায্য করিয়া পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, ইহা খুব আশার কথা; কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অন্য উপায়েও পরিষদের উপকার করিতে পারেন। তাঁহারা যদি আপনাদিগের সন্তানদিগকে পরিষদের কার্য্যে নিযুক্ত রাখেন, তবে তাঁহারা একদিকে যেমন কার্য্যও শিখিবেন সেইরূপ আনন্দও অনুভব করিবেন।

সাহিত্য-পরিষদের, সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের ছেলেদিগের উপরে একটা আকর্ষণ আছে। ছাত্র-সদস্যগণ ইহার অধীনে প্রকৃত কার্য্যকর বিষয়সমূহ শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন।

ইতিহাস-সম্পর্কে এখন যথেষ্ট কাজ করিবার আছে। লোকে এখন কাব্যের অপেক্ষা ইতিহাসই অধিক চাহিতেছে। এই ইতিহাস-সম্পর্কে কত প্রাচীন তথ্য-সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন আছে। এই প্রসঙ্গে দুই একটি সামান্য উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে।

মহাভারতের কাল প্রকৃত ১০০০ হইতে ১৪০০ বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু এই সময়টা একেবারে ৪০০০ হইতে ৫০০০ বৎসরে উঠিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

আর একটি দৃষ্টান্ত বাঙ্গালার গন্ধবণিক-সম্প্রদায়। গন্ধবণিক-সম্প্রদায়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি জানিতে পারিলাম যে, উহাদিগের মধ্যে ছত্রিক, শঙ্খ, রাউত ও দেশ-আশ্রম এই চারি শ্রেণী বিদ্যমান আছে। এখন এই সকল সম্প্রদায়ের অর্থ কি? ছত্রিক বলিতে Miscellaneous অর্থাৎ সকল রকমেরই লোক বুঝায়। শঙ্খ প্রকৃত পক্ষে সঙ্ঘ। সেনাদিগকে রাউত বলা হইত। রাউত শব্দের প্রকৃত অর্থ General। যাহারা পাড়াগাঁয়ে ফিরি করিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত, তাহাদিগকে দেশাশ্রম বলা হইত। এইরূপে ইহাদিগের চারি শ্রেণীর নামকরণ হইতে ইহাদিগের সমাজিক বিবরণ ও আচার-ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

প্রকৃত কথা এই যে, ইতিহাস উদ্ধার-সম্বন্ধে যদি উৎকট আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে অপরের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন হয় না, চোখ আপনাআপনি ফুটিয়া যায়। অবশ্য যাহাদের চোখ ফুটিয়াছে, তাঁহারা অপরকে কিছু কিছু দিতে পারেন। বাস্তবিক সাহিত্য-ক্ষেত্রে যত অধিক লোক হইবে, তত দ্রুত লোকের চক্ষু ফুটিবে।

এই ইতিহাস-সংগ্রহ-বিষয়ে অনেকেই সাহায্য করিতে পারেন। যাঁহারা জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহারাও প্রাচীন কাগজপত্রের মধ্য হইতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কার করিতে পারেন।

"তন্ত্রের বিশেষত্ব" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে পাঠের জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি যে পাঠ করা হয় নাই, ইহা ভালই হইয়াছে। অধুনা দেশে তন্ত্রের আলোচনা যত কম হয়, ততই মঙ্গল বলিতে হইবে। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে তন্ত্রের দ্বারা দেশের যে, মহা অপকার হইয়াছে, বোধ হয় তাহার অপেক্ষা আর কিছু অধিক অপকার হয় নাই। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জনষ্টন নামে এক সাহেব কলিকাতা আগমন করিয়া এক সভা করেন। ইংরেজী ভাষায় যে সকল উৎকৃষ্ট পুস্তক, সেই সকল অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য তৎকালে চেষ্টা করিতেছিলেন। Godhed Hot-house নামে একখানি বহি সে সময়ে আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। আমি এই পুস্তকখানি অর্দ্ধমূল্যে প্রকাশিত করিবার জন্য অনুরোধ করায় তিনি বলিয়াছিলেন—বিগত শতাব্দীতে এই বহিখানি পড়িয়া পাশ্চাত্যদেশে যত লোক আত্মহত্যা করিয়াছে, বোধ হয় আর কোন কারণে এত অধিক আত্মহত্যা করে নাই। তন্ত্রপাঠ ও তন্ত্র-আলোচনা যত কম হইবে, ততই মঙ্গল জানিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম, এ, মহাশয়ের লিখিত "বনমালের তাম্রশাসন" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন, এতাবৎকাল আমাদের দেশের সাহিত্যসেবিগণ তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারকল্পে বিশেষভাবে সফলতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সভাপতি মহাশয় বলেন - সময় ও অবস্থানুসারে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র। অবস্থা বিবেচনায় তাঁহাদিগের নিকট হইতে অধিক আশা করা যাইতে পারে না।

শ্রীমান্ বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের "ভাষান্তর" প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বাঙ্গালা ভাষায় আর একটি উৎপাত জন্মিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইংরাজী সাহিত্যের একটা মোহিনী শক্তি আছে। আমাদের দেশে যখন ইংরেজী ভাষা ও ইংরাজী সাহিত্যের প্রচলন হয়, তখন এই মোহিনীশক্তির আকর্ষণে অনেকেই ইংরাজীতে চিন্তা করিতেন, এখনও অনেকেই ইংরাজীতে ভাবিয়া থাকেন। বিদেশীয় ভাষায় চিন্তা করিতে শিখিয়াছি বলিয়া আমাদিগের তর্জ্জমায় অনেক বিদেশী শব্দের আমদানী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফলে খুব বিভ্রাট ঘটিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঐ বিষয়ে ভাষাকে সংযত ও উন্নত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা লইতেছেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদপ্রসঙ্গে কবিসম্রাট্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নিকটে রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের কৃতজ্ঞতা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মনীষিগণ রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের প্রারম্ভ

হইতে ইহাকে সযত্নে গড়িয়া তুলিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সভাপতি মহাশয় যে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের নবম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া ও সভার চিত্রশালার দ্বারোদ্‌ঘাটন দ্বারা সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার নবম সাম্বৎসরিক অধিবেশনের কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।	সভাপতি।

দশম বর্ষ

প্রথম মাসিক অধিবেশন

শনিবার, ৬ই আষাঢ়, ১৩২১, ২০ জুন, ১৯১৪,

সময়—অপরাহ্ণ ৫টা

সভাপতি মহাশয় ও তৎসহকারিগণের অনুপস্থিতে শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সাহা মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় অদ্যকার সভায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সভাপতি

কবিসম্রাট্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য ব্যাকরণতীর্থ	„ কালীকান্ত বিশ্বাস, সহকারী সম্পাদক
	„ পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার ঐ
„ ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ	„ এককড়ি স্মৃতিতীর্থ সহকারী সম্পাদক
„ সিদ্ধেশ্বর সাহা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয়	„ ললিতমোহন গোস্বামী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, ছাত্রাধ্যক্ষ
„ বৈকুণ্ঠচন্দ্র সেন	„ কেশবলাল বসু গ্রন্থাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য

১। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গত নবম সাম্বৎসরিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ, উকীল, নিলফামারী।
শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস	সম্পাদক	শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় বি, এ, পুলিশ অফিস, রঙ্গপুর।

৩। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই মহোদয়-প্রদত্ত "রামপাল-চরিত" নামক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের জন্য এই সভা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। এই গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারভুক্ত হইল।

৪। (ক) রঙ্গপুর ধর্ম্মসভার কর্ত্তৃপক্ষ পরিষদসংশ্লিষ্ট চিত্রশালায় কষ্টিপ্রস্তরনির্ম্মিত যে সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি ও মনসামূর্ত্তি উপহার প্রদান করিয়াছেন, তাহা সাদরে গৃহীত ও সভার কর্ত্তৃপক্ষগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

(খ) শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর কর্ত্তৃক সভার চিত্রশালার উপহৃত গ্রীস্-দেশীয় ((Indo Greek) রৌপ্যমুদ্রা, বৌদ্ধতুলিকায় অঙ্কিত চিত্রপট ও মৎস্যাবতার-মূর্ত্তিযুক্ত প্রাচীন দেউলের ইষ্টক ধন্যবাদ পুরঃসর গৃহীত হইল।

উপহৃত পুস্তক ও চিত্রাদি সভায় প্রদর্শিত হইল।

৫। শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু "বঙ্গদর্শন"-সম্পাদক ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে শোকপ্রকাশার্থ নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপিত করেন ;—

"বঙ্গদর্শন"-সম্পাদক ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অকালমৃত্যুর ফলে বঙ্গসাহিত্যের যে প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, এই সভা তাহার জন্য আন্তরিক দুঃখ ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। "উল্লিখিত প্রস্তাবের একখণ্ড প্রতিলিপি পরলোকগত শৈলেশবাবুর পরিবারবর্গের নিকট প্রেরণ করা হউক।"

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবলাল বসু উল্লিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন,—কিঞ্চিদূন এক বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্য-সংশ্রবে শ্রদ্ধেয় পরলোকগত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ হয়। এই অত্যল্পকালের মধ্যে তাঁহার কর্ম্মোৎসাহ, সাহিত্যানুরাগ, চরিত্রের ঔদার্য্য ও অমায়িকতা সম্বন্ধে যে সামান্য পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, এইখানে তাহার উল্লেখ করিব।

শ্রদ্ধেয় পরলোকগত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার যে ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন, অল্পকালপূর্ব্বে রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের যে নবম সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল, এই অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল। আমার দক্ষিণপার্শ্বোপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় সভাপতি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় যখন কলিকাতায় গমন করেন, তখন

তিনি অধিবেশনের নির্দ্ধারিত সময় অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু করাল কাল সাম্বৎসরিক অধিবেশনের পূর্ব্বদিবস তাঁহাকে ইহলোক ও প্রিয় পরিজনের বক্ষ হইতে কাড়িয়া লইল, তাঁহার আশা ফলবতী হইল না।

শ্রদ্ধেয় শৈলেশ বাবু অমর সাহিত্যসেবী বঙ্কিমচন্দ্রকে কিরূপ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভক্তির নেত্রে অবলোকন করিতেন, তৎসম্পাদিত বঙ্গদর্শন তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যাঁহারা কিছুকালের জন্যও শৈলেশবাবুর সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তিনি কিরূপ যত্নসহকারে "বঙ্গদর্শনের" জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিতেন, এই জন্য তাঁহাকে অবস্থাতিরিক্ত অর্থব্যয় করিতে হইত। বহুল চিত্র-পরিশোভিত সাময়িক সাহিত্য-প্লাবিত বঙ্গদেশে বঙ্গদর্শনের প্রাচীন গৌরব রক্ষা করিয়া ইহাকে শিক্ষিত সমাজের আদরণীয় করিবার জন্য শৈলেশচন্দ্র বিশেষ-ভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

শৈলেশচন্দ্র দরিদ্র সাহিত্যসেবীর পালক ছিলেন। সৎ সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তিনি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

তিনি প্রকৃতই অমায়িক ছিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিয়মিত প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে তিনি ছোট-বড় সকলের সহিত অবাধে সাক্ষাৎপূর্ব্বক প্রত্যেককে যথাযোগ্য উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার রোগের প্রথমাবস্থায় আমি তাঁহার সহিত একদা সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। সে সময়েও তিনি কোনও কোনও প্রয়োজনীয় বিষয়ে যেরূপ সদুপদেশ প্রদান করেন, তাহা এখনও আমার মনে সুস্পষ্টভাবে জাগরুক আছে। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের ও স্থানীয় জমিদার সভার বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের আকাঙ্ক্ষা তখনও তিনি পত্রযোগে সাহিত্য-পরিষদের ও জমিদার-সভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়কে অবগত করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

বৈষয়িক বিষয়ে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া তাঁহাকে অনেকগুলি জমিদারীর তত্ত্বাবধান ও উপদেশাদি প্রদান করিতে হইত। এই জন্য তাঁহাকে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে হইত। প্রাতঃকালে নয়টার সময় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া তিনি যে বাহির হইতেন, তাহার পর কখন যে ফিরিতে পারিতেন, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না, অনেক দিবস প্রত্যূষে বাহির হইয়া বেলা ২।৩টার সময় ফিরিয়া স্নানাহার করিয়াছেন, একাধিক দিবস রাত্রি ৮।৯টার পূর্ব্বে ফিরিতে পারেন নাই। কর্ম্মে তাঁহার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা ছিল। কি সাহিত্য, কি বৈষয়িক কার্য্য সর্ব্বত্র তাঁহার এই কর্ম্মনিষ্ঠা প্রকাশিত হইত।

তিনি অনেকগুলি শুভকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন. তাঁহার পরলোক-গমনের পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় জমিদারী ট্রেণিং কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। অধুনা জমিদারী-কার্য্যে অভিজ্ঞ সুদক্ষ লোকের বিশেষ অভাব না হইলেও তাঁহার এইরূপ ধারণা হইয়াছিল, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় জমিদারী পরিচালনেও নিয়মিত শিক্ষা প্রদান করিলে ইহাতে দেশের ভূস্বামিগণের উপকার ও আধুনিক ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণের অন্ন-সমস্যা কিয়ৎপরিমাণে নিরাকৃত

হইতে পারিবে। জমিদার-সন্তানগণ যাহাতে স্ব স্ব জমিদারী পরিচালনে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারেন, এই জন্য তিনি বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বহু টাকা ব্যয় করিয়া ছাত্রগণের বাসস্থানের জন্য এক অট্টালিকা ভাড়া লইয়াছিলেন। কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীপ্রমুখ সদাশয় ব্যক্তিগণ জমিদারী কলেজের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও এই কলেজ স্থায়ীত্ব লাভ করিতে পারে নাই। দেশের ভূস্বামিগণ উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে স্ব স্ব জমিদারীতে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলে শৈলেশচন্দ্রের প্রয়াস ব্যর্থ হইত না। শৈলেশচন্দ্র নিজ মুখেই বলিয়াছেন এই কলেজের জন্য তাঁহাকে অনুমান সার্দ্ধ এক সহস্র মুদ্রা ক্ষতিস্বীকার করিতে হইয়াছে।

পরলোকগত শৈলেশচন্দ্রের আর একটি শুভানুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। বাঙ্গালাদেশে অধুনা বহু সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালার ভূস্বামিগণের ও গৃহস্থবর্গের বিশেষভাবে উপযোগী করিয়া একখানিও সাময়িক পত্র এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শৈলেশচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের এই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইঁহারই সংশ্রবে শৈলেশবাবুর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে এই পত্রের সম্পাদন ভার অংশতঃ ন্যস্ত হইয়াছিল। কতিপয় অনিবার্য্য কারণে অনুষ্ঠানপত্র প্রচার ব্যতীত তিনি ইহা প্রকাশিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিরূপ মহদুদ্দেশ্য লইয়া শৈলেশচন্দ্র এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, "বিষয়ীর" সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান প্রস্তাব হইতে তাহা সকলেই অবগত হইতে পারিবেন।

ইহলোকে তাঁহার সমস্ত আশাই অপূর্ণ রহিয়া গেল। পরলোকে তিনি অনাবিল শান্তির অধিকারী হউন।

অতঃপর বাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী উল্লিখিত প্রস্তাবের সমর্থন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

পরলোকগত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অকালমৃত্যুজনিত শোকসূচক প্রস্তাবের সমর্থন-প্রসঙ্গে রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক বাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী বলেন, স্বর্গীয় শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা কেশবলাল বসু মহাশয় যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহার উপর অধিক কিছু বলিবার নাই। ব্যক্তিগতভাবে শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমার একজন শ্রদ্ধেয় হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। রঙ্গপুরে সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠাকালে আমি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম। তিনি তৎকালে আমাকে যে সকল উপদেশাদি দানে সাহায্য করিয়াছিলেন, সাহিত্য-পরিষদের গঠনকল্পে সেই সকল আমার খুব সহায় হইয়াছিল। ইহার পর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সংশ্রবে, কিম্বা অন্য যে কোন কারণে যখনই যেরূপ সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি আগ্রহের সহিত সাহায্য করিয়াছেন।

শৈলেশচন্দ্রের আর একটি শুভানুষ্ঠানের কথা আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন। তাঁহার

প্রারব্ধ "বিষয়ী" পত্র প্রকাশিত হইলে দেশের একটী প্রকৃত হিতানুষ্ঠান সাধিত হইত অধুনা আমরা ইতিহাস ও জনপ্রসিদ্ধ বর্ত্তমান ও অতীত যুগের মহাত্মগণের চরিতাঙ্কনে নিরত থাকি; কিন্তু ইঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট গতি অতিক্রম করিয়া যাঁহারা জীবনে সামান্য অবস্থার মধ্যে অবস্থান করিয়া অধিকতর মহত্ব প্রদর্শনের সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা অনেকস্থলে আলোচিত হয় না। শৈলেশবাবুর প্রয়াস সফল হইলে এই সকল বিষয়ের অভাব সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত হইত।

শ্রদ্ধেয় মজুমদার মহাশয় জমিদার-সভার হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁহার নবপ্রারব্ধ সাময়িক পত্রের ও জমিদারী কলেজের সংশ্রবে তিনি পরিষদের সাম্বৎসরিক অধিবেশনের সময় রঙ্গপুরে আগমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ইচ্ছা ফলবতী হইল না। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তিবিধান করুন।

অতঃপর ৺সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরলোক-গমনে বাঙ্গালার সঙ্গীত শাস্ত্রের ও পরিষদের অন্যতম সদস্য ৺আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় তাহার উল্লেখ করিয়া শোক প্রকাশ করেন।

সৌরীন্দ্রমোহনের জীবনী-প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রবাবু বলেন, তিনি বাঙ্গালাদেশের ও ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন লুপ্তপ্রায় বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার ও সংস্কার করিয়া কলাশিল্পের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। হারমনিয়ামে এদেশীয় সঙ্গীতের উপযোগী করিয়া তিনিই সুর-লয় সংযোজিত করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে বাঙ্গালায় সঙ্গীতশাস্ত্রের ও (বাদ্য) যন্ত্রবিদ্যার প্রকৃত অনিষ্ট হইল সন্দেহ নাই।

৬। আসামের ডিপুটী কমিশনারের হেডক্লার্ক বাবু উমেশচন্দ্র দে মহাশয়ের অনুপস্থিতি নিবন্ধন বাবু কেশবলাল বসু তাঁহার লিখিত শঙ্করদেব প্রবন্ধ পাঠ করেন।

মহামহোপাধ্যায় কবিসম্রাট্ পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "শঙ্করদেব" সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, কথিত আছে, একসময়ে শঙ্করদেব আসাম হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। রাজা নীলাম্বর তাঁহাকে কামতাপুরে স্থান প্রদান করেন, অবশ্য বিতাড়িত শঙ্করদেব ও আমাদিগের আলোচ্য শঙ্করদেব এক ব্যক্তি কিনা, তাহা বলা সম্ভবপর নহে। রাজা নীলাম্বরের সহিত পাঠান নৃপতি হোসেনসার যুদ্ধের কথা উল্লেখ আছে। শঙ্করদেবের আবির্ভাব-কাল ইহারও পূর্ব্বে হইলে তখন বাঙ্গালাদেশে পাঠান-রাজত্বই ছিল, এইরূপ অনুমিত হয়। সুতরাং তৎকালে নদীয়া হইতে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের আগমন ও হিন্দু-প্রাধান্যের আরোপণ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

আর এক কথা এই যে, বৈষ্ণবগ্রন্থে অদ্বৈতাচার্য্যের এক শিষ্য শঙ্করদেবের উল্লেখ আছে। অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য ও আসামের শঙ্করদেব যে একই ব্যক্তি, তাহা অনুমান করিবার

অদ্বৈতাচার্য্য জ্ঞানবাদী ছিলেন। তবে ইহা নিশ্চয় যে, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সংসর্গে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধহেতু কিম্বা অন্য কি কারণে যে অদ্বৈতাচার্য্য এবং শঙ্করদেব প্রভৃতি নবদ্বীপ হইতে চলিয়া যান তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত শ্রীচৈতন্যের যে পুনরায় মিলন হইয়াছিল, বৈষ্ণবগ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথক্ষেত্র হইতে শঙ্করদেব গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত আনয়ন করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্করদেবের আলোচনার উত্তরভাগে লেখক বলিয়াছেন যে, তিনি সমগ্র মহাভারত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। গীতাত মহাভারতেরই অংশ-বিশেষ, সুতরাং মহাভারতের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গীতা পাঠ করিয়া থাকিলে পুনরায় জগন্নাথক্ষেত্র হইতে গীতা আনয়ন করিয়াছিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

আলোচ্য প্রবন্ধ হইতে আমরা আর এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, আসামরাজ্য তৎকালে গৌড়েশ্বরের অধীন ছিল, এবং বাঙ্গালা ভাষা ও অসমীয়া ভাষার বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না। সুতরাং প্রাচীনকালে গৌড়রাজ্য যে বহুদূর বিস্তৃত ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে মহাশয় বিশেষ শ্রম-স্বীকারপূর্ব্বক শঙ্করদেব সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র।

পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের আলোচনা-অন্তে রাত্রি অনুমান নয় ঘটিকার সময় অধিবেশনের কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীহৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ
সভাপতি

দশম বার্ষিক দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

রবিবার, ৩১শে শ্রাবণ ১৩২১, ১৬ আগষ্ট, ১৯১৪, সময়—অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ সভাপতি
" যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
" ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ
" একক‌ড়ি স্মৃতিতীর্থ সহঃ সম্পাদক
" মাখনলাল রায় ছাত্র-সম্পাদক
" অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ সম্পাদক ও অন্যান্য।

আলোচ্য-বিষয়

১। গত প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন ৩। পুথি ও পুস্তক-উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীমান চারুচন্দ্র সরকার ছাত্রসদস্য কর্ত্তৃক উপহৃত বিষ্ণুমূর্ত্তি। ৫। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের সত্যনারায়ণ। ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

নির্দ্ধারণ

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। ২। এই অধিবেশনে কোনও সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই। ৩। ধন্যবাদপুরঃসর নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল।

উপহারদাতার নাম	পুস্তকের নাম
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বক্সী	সংস্কৃত মহাভারত ২ খণ্ডে সম্পূর্ণ
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	শ্লোকমালা
শ্রীযাদবচন্দ্র দাস	শান্তিকণা

৪। শ্রীমান্ চারুচন্দ্র সরকার ছাত্রসদস্য কর্ত্তৃক উপহৃত প্রস্তর নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রদর্শিত ও ধন্যবাদ পুরঃসর সভার চিত্রশালায় গৃহীত হইল। বিষ্ণুমূর্ত্তি-সংগ্রাহক ছাত্র-সদস্য শ্রীমান চারুচন্দ্র সরকার ঐ মূর্ত্তির সঙ্গে "রাঙ্গামাটী বা কর্ণসুবর্ণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ" শীর্ষক প্রবন্ধে ঐ মূর্ত্তির আলোচনা প্রসঙ্গে রাঙ্গামাটী বা কর্ণ-সুবর্ণের অভিন্নতা বিষয়ে আলোচনা দ্বারা বিশেষ অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রবন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে রঙ্গপুর কালীধাম চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন—বিষ্ণুমূর্ত্তি-সংগ্রাহক ও উপরের লিখিত প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র এবং তাঁহার এই অনুসন্ধিৎসা ছাত্রসদস্যগণের অনুকরণীয়। এই প্রবন্ধে তিনি হণ্টার সাহেবের গ্রন্থ, ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের গ্রন্থ, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থ ও বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণাল প্রভৃতি হইতে রাঙ্গামাটীর বিবরণ সংগ্রহ করিয়া ঐ বিষয় আলোচনার বিশেষ সুবিধা ঘটাইয়াছেন। আমরা সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং আশা করি, তিনি ঐ বিষয়ের আরও আলোচনা করিয়া আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন। প্রবন্ধের ভাষা অতি সুন্দর ও সরল হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তিনি নানা প্রবাদেরও আলোচনা করিয়াছেন এবং "বারেন্দ্র ঢাকুর" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কবিতা উদ্ধৃত করিয়া কর্ণসুবর্ণই যে কাণসোনা তাহা স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন

"শুন সবে দেব-বংশ করি নিবেদন।
কাণসোনায় দেব হইল বারেন্দ্র গমন॥"

এবং চীন-পরিব্রাজক হুয়েন সাং প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে আলোচনা করিয়া রাঙ্গামাটীই যে কর্ণ-সুবর্ণ তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। যে মূর্ত্তিটি প্রদর্শিত হইল তাহার গঠন-প্রণালী অতিসুন্দর চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। দুইখানি হস্ত ও নাসিকার অগ্রভাগ ভগ্ন, গলায় যজ্ঞসূত্র আছে, মূর্ত্তিটি ভগ্ন হওয়ায় সৌন্দর্য্যের কতক হানি ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের নানাস্থানে কত মূর্ত্তিই যে, এরূপ লোক-লোচনের অন্তরালে ধ্বংসের মুখে পতিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহারা ঐ সকল মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া রক্ষিত হওয়ার জন্য পরিষৎকে অর্পণ করিতেছেন তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—শ্রীমান্ চারুচন্দ্র সরকার ছাত্রসদস্য যেরূপ উৎসাহ সহকারে প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বাদি সঙ্কলন ও মূর্ত্তি সংগ্রহ-কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাহাতে সভা আশা করেন যে, তাঁহার নিকট হইতে অনেক প্রাচীন পুথি ও মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবেন। আমাদের অনেক ছাত্রসদস্য আছেন, তাঁহারা যদি প্রত্যেকে শ্রীমান্ চারুচন্দ্র সরকারের মত কিছু কিছু সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে অচিরেই চিত্রশালা নানা ঐতিহাসিক নিদর্শনে পরিপূর্ণ হইবে। আমি ছাত্রসদস্যগণকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন এ বিষয়ে মনোযোগী হন।

৫। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের "সত্যনারায়ণ" শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হইল। এই প্রবন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ-রচয়িতা শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় বিশেষ অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি ঢাকা, ফরিদপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলা, আসাম, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও উড়িষ্যায় কিরূপভাবে সত্যনারায়ণের পূজা হইয়া থাকে প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সত্যনারায়ণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পঞ্চানন বি. এল, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্ত-বারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বিখ্যাত ঐতি-হাসিকগণের মতও বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আদ্যন্ত ভুজঙ্গপ্রয়াত ও তোটক ছন্দে রচিত সত্যনারায়ণের পাঁচালী ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। আমরা ঘোষাল মহাশয়ের সংগৃহীত পাঁচালী মুদ্রিত দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ মহাশয় বলিলেন—বরিশালের খ্যাতনামা পণ্ডিত ৺কাশীশ্বর তর্কবাগীশ মহাশয় বলিতেন "শিরসা নীয়তে ইতি "শীর্ণি" এটি সংস্কৃত শব্দ। এখনও সত্যনারায়ণের প্রসাদ মস্তকে ধারণ করিয়া ভক্ষণ করিবার রীতি আছে। উক্ত প্রাচীন পণ্ডিত মহাশয়ের বাক্য অসমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখক নানা তত্ত্বের অবতারণা করিয়া বিশেষ গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ আলোচনা দ্বারা সময়ে প্রকৃত তত্ত্বের নির্ণয় হইতে

পারে। নানাস্থানের পূজা-পদ্ধতি এবং সত্যনারায়ণ-সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মতেরও আলোচনা করিয়াছেন। বৈদিক দেবতা "নাসত্য" যে সত্যনারায়ণ, তাহা আমার উপলব্ধি হয় না। নাসত্য সত্যনারায়ণরূপে পরিণত হওয়ার মত সমীচীন নহে। আশা করি, সুধীবর্গ এবিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করিবেন। আমার কতকটা বিশ্বাস এই যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব-স্থাপনের জন্য সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের সিন্নী বিতরণের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল।

৬। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় "আরতি" ও "দুর্মুখ" সম্পাদক "বাঘাতেঁতুল" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ময়মনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ লেখক ৺রজনীকান্ত চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশক প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীহৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ	শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
সভাপতি	সহকারী সম্পাদক

দশম বর্ষ তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

রবিবার ১লা আশ্বিন, ১৩২১, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪,

স্থান—সভার কার্য্যালয়, সময় অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সভাপতি

- „ চন্দ্রমোহন ঘোষ
- „ পণ্ডিত এককড়ি স্মৃতিতীর্থ } সহকারী সম্পাদক
- „ পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার } সহকারী সম্পাদক
- „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য

আলোচ্য-বিষয়

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক স্বর্গীয় কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত ১৭৮০ শকাব্দের "প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বাবশিষ্ট" নামক পুথি। ৫। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সুযোগ্য সভাপতি বঙ্গদেশের মহামান্য গভর্ণর শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর কর্ত্তৃক উক্ত সোসাইটির

১৯১৪ অব্দের সাম্বৎসরিক অভিভাষণে এ সভা সম্বন্ধে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ হেতু তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা। ৬। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের রচিত "বঙ্গের পালরাজগণ"। ৭। বিবিধ।

সভায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভার কার্য্য স্থগিত রাখা হইল।

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী — সভাপতি
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী — সম্পাদক

দশম বর্ষ—স্থগিত তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

রবিবার, ২২ কার্ত্তিক (১৩২১) ৮ই নভেম্বর (১৯১৪) সময় অপরাহ্ণ ৪টা

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সভাপতি

যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্
ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ
চন্দ্রমোহন ঘোষ
মদনগোপাল নিয়োগী
জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ, আই-সি-এস সভার স্থায়ী সভাপতি
শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত
নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী
কেশবলাল বসু গ্রন্থাধ্যক্ষ
অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ সম্পাদক
সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক
ও অন্যান্য

আলোচ্য বিষয়

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক স্বর্গীয় কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত ১১৮০ শকাব্দের "প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বাবশিষ্ট" নামক পুথি। ৫। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সুযোগ্য সভাপতি বঙ্গদেশের মহামান্য গভর্ণর শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর কর্ত্তৃক উক্ত সোসাইটির ১৯১৪ অব্দের সাম্বৎসরিক অভিভাষণে এ সভা সম্বন্ধে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ হেতু তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা। ৬। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের রচিত "বঙ্গের পালরাজগণ"। ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ

সভাপতি ও তৎসহকারিগণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় অদ্য দিবসীয় অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ যথারীতি গৃহীত হইল।

২। নিম্নোক্ত ব্যক্তি সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সদস্য	প্রস্তাব	সমর্থক
শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ ছোট কুঠী, পূর্ণিয়া	শ্রীকেশবলাল বসু	সম্পাদক

৩। ধন্যবাদ পুরঃসর নিম্নলিখিত গ্রন্থ সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল।

উপহৃত গ্রন্থ	উপহার-দাতার নাম
সমসাময়িক ভারত	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ,
রত্নবোধ	" রামনন্দন ভট্টাচার্য্য দর্শনরত্ন
প্রাচীন পুঁথির বিবরণ	" সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

৪। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংগৃহীত ময়মনসিংহের পণ্ডিত ৺কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের রচিত ১৭৮০ শকের প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বাবশিষ্ট গ্রন্থ আলোচনা সহ উপস্থিত করা হইল। এই আলোচনা অন্য অধিবেশনে প্রবন্ধরূপে পঠিত হইবে। সংগ্রাহককে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

৫। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সুযোগ্য সভাপতি বঙ্গদেশের মহামান্য গভর্ণর শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর কর্ত্তৃক উক্ত সভায় ১৯১৪ অব্দের সাম্বৎসরিক অভিভাষণে এই সভা-সম্বন্ধে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ হেতু সভা তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। লাট বাহাদুরের নিকটে সভার এই নির্দ্ধারণের অনুলিপি যথারীতি প্রেরণ করা হউক।

৬। শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের "বঙ্গের পালরাজগণ" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের সময়ে সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত আই, সি, এস্ মহোদয় সভায় উপস্থিত হন।

প্রবন্ধপাঠের পরে তৎসম্বন্ধে মতামত আহূত হইলে শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—লেখক পালরাজদিগকে ক্ষত্রিয় না বলিয়া কোনও সঙ্করজাতি বলিয়াছেন; কিন্তু তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। তৎকালে আসাম প্রভৃতি স্থানে ক্ষত্রিয়ের অবস্থিতির বিষয় অবগত হওয়া যায়। রাজাদিগের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ বিরল নহে। গুজরাট প্রভৃতিতে

আজও উহা দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের মাণিকচন্দ্র, ভবচন্দ্র, প্রভৃতিকে লেখক পৃথক এক চন্দ্রবংশীয় রাজা বলিয়াছেন; কিন্তু তাহা বোধ হয় না। ইঁহারা পালবংশোদ্ভব। ঐ বংশের শেষ রাজার নাম পাল রাজা। বিক্রমপুরে সেনরাজগণের রাজধানীর অবস্থানসম্বন্ধে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। গৌড় রাজধানী থাকা সত্বেও ঐ স্থানে দ্বিতীয় রাজধানীর সত্তা অসম্ভব নহে। বর্ত্তমানেও বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। যোগী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন—

শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠে এ সভা অনেক দিন বঞ্চিত ছিল। বহু সভায় লেখকের অনেক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে বেশ উপলব্ধি হয় যে, তিনি ঐতিহাসিক বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন এবং শিলা-লিপি ও তাম্রশাসন প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপকরণের বহু সন্ধান রাখেন। কোনও বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলেও এই প্রকার বহু উপকরণ একত্র সংগৃহীত হইলে কাল-ক্রমে পরিষদের লক্ষ্য-কার্য্য যথেষ্ট অগ্রসর হইবে আমরা এরূপ আশা করি। এজন্য প্রবন্ধ-লেখককে সভা বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। কতকগুলি জটিল প্রশ্ন অনেক কাল হইতে আলোচিত হইতেছে। পালবংশের আলোচনা তাহার অন্যতম। কোনও গ্রন্থ, শিলালিপি বা মুদ্রাতে স্পষ্টরূপে কোনও উল্লেখ না পাওয়া পর্য্যন্ত এ সকল বিষয় অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আলোচনা করিলে এক এক জন যে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। তবে অনুমানরূপ ঐ প্রকার সিদ্ধান্তকে প্রবন্ধকর্ত্তাগণ অনেক সময়ে স্থিরসিদ্ধান্তরূপে বিন্যস্ত করেন, তাহা সাধারণ পাঠক ও শ্রোতার পক্ষে অনেক সময়ে অনিষ্ট উৎপাদন করে। পালবংশীয় রাজগণ কোন্ জাতীয় ছিলেন তাহা নির্ণয় করিবার জন্য আরও প্রয়াস করা কর্ত্তব্য। নামের শেষে "পাল" শব্দটি যে বংশ-পরিচায়ক তাহাতেও সন্দেহ আছে। নামগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এই "পাল" শব্দটি ঐ সকল নামের একাংশ। তবে একাংশের শেষ বলিয়া সকলের নামের সহিত "পাল" শব্দটি যোজিত হইয়া থাকিতে পারে। আজকালকার বঙ্গদেশ প্রচলিত নামেও এরূপ পরিদৃষ্ট হয়। এক পরিবারের এক জনের নাম ব্রজবল্লভ, তৎপুত্র গোপীবল্লভ, তৎপুত্র রাজবল্লভ ইত্যাদি দেখিয়া যদি অনুমান করা হয় যে, ইঁহারা বল্লভবংশীয়, তবে তাহা ভ্রমসঙ্কুল হইবে সন্দেহ নাই। দেবপাল, বিগ্রহ পাল, মহীপাল, ভূপাল, গোপাল ইত্যাদির পক্ষেও যে সেরূপ হয় নাই তাহা কে জানে? দেবপাল, মহীপাল ইত্যাদির পরে তাঁহাদের বংশ-পরিচায়ক অন্য একটি অংশ অবশ্যই ছিল। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের আজকালও দেখা যায় যে, নামের উপাধিসহ সম্পূর্ণ অংশ বলা হয় না। তদ্রূপ ঐ সমস্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামও সেইরূপে অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে। সুতরাং এ সকল বিষয়ে বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইলে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিরাপদ নহে।

প্রাচীনকালে বঙ্গদেশে মুদ্রার ব্যবহার ছিল না এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। মাণিকচন্দ্র,

গোপীচন্দ্র, ভবচন্দ্র প্রভৃতির পূর্ব্ব যুক্তি অনুসারে "চন্দ্র" শব্দটি বংশবাচক নহে। উপাধি-ব্যঞ্জক "পাল" শব্দ বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—তৈলিক এবং কুম্ভকারগণের নামের শেষে উপাধিব্যঞ্জক "পাল" শব্দের ব্যবহার আছে। কায়স্থের মধ্যেও "পাল" উপাধি কচিৎ দেখা যায়। এই পাল উপাধি কোথা হইতে আসিল তাহার বিচার করা আবশ্যক। উপসংহারে লেখককে গবেষণার জন্য ধন্যবাদ বিজ্ঞাপন করিয়া বক্তব্য শেষ করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিবার পর রাত্রি আট ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীহৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ
সভাপতি

দশম বর্ষ, চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

রবিবার, ২০শে অগ্রহায়ণ (১৩২১) ৬ই ডিসেম্বর (১৯১৪)

সময় অপরাহ্ণ ৫টা

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয় নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ সভাপতি
" " ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ পত্রিকাধ্যক্ষ
" " ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ
" " এককড়ি স্মৃতিতীর্থ সহকারী সম্পাদক
" " অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার ঐ
" " কালীকান্ত বিশ্বাস ঐ
" " কেশবলাল বসু গ্রন্থাধ্যক্ষ
" " নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কুচবিহার ষ্টেট্
" " মৌলবী হাফেজউল্ল্যা
" " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য

আলোচ্য বিষয়

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন,—কুণ্ডীর প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির বরাহমূর্ত্তিযুক্ত ইষ্টক। ৫। প্রবন্ধ,—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম্. এ মহাশয়ের সচিত্র

রত্নপালের তাম্রশাসন। ৬। শোক প্রকাশ (ক) মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন (খ) মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন (গ) অধ্যাপক কালীপদ বসু এম্, এ মহাশয়গণের পরলোক-গমনে। ৭। রাজসাহীতে আহূত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতি-গঠন-সংবাদ-জ্ঞাপন। ৮। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। ২। শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি, এ সবডেপুটী কলেক্টার কারমগঞ্জ (শ্রীহট্ট) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়া এ সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। ইঁহার পরিচয়-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় তাঁহার "পদ্মাপুরাণ" সম্বন্ধে আলোচনা-প্রবন্ধের উল্লেখ করিলেন। এরূপ সাহিত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে সদস্যরূপে লইয়া সভা গৌরবান্বিত হইলেন। ৩। শ্রীযুক্ত কবিরাজ ব্রজেন্দ্রনাথ শর্ম্মা অধিকারী ভাঙ্গনী, পোষ্ট মিঠাপুকুর হইতে মাহিগঞ্জ পদ্মাবতী প্রেসে ১২৯৩ সালে মুদ্রিত স্বরচিত "বিবিধ সঙ্গীত-লহরী" গ্রন্থ সভার গ্রন্থাগারে উপহার পাঠাইয়াছেন। ধন্যবাদপুরঃসর এই স্থানীয় লেখকের গ্রন্থ সাদরে গৃহীত হইল। ৪। কুণ্ডীর প্রাচীন দোলমঞ্চের বরাহমূর্ত্তিযুক্ত ইষ্টক সম্পাদক কর্ত্তৃক সভার চিত্রশালায় উপহৃত হইল। সাদরে তাঁহার এই উপহার গৃহীত ও সদস্যদিগকে প্রদর্শিত হইল। ৫। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্বর্গারোহণে সভার শোক-প্রকাশক প্রস্তাব সম্পাদক মহাশয় উত্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিলেন।

এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ মহাশয় সমর্থন-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, ন্যায়রত্ন মহাশয় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তদ্রচিত গ্রন্থের নাম যথা:—১। অদ্বৈতবাদ খণ্ডন, ২। মায়াবাদ নিরসন, ৩। দীধিতি কুসুমানতাবাদ, ৪। গদাধর ব্যাপ্তিবিকার, ৫। তত্ত্ববোধ, ৬। রাজরাজেশ্বরী স্তোত্র, ৭। গঙ্গাস্তোত্র, ৮। মোহভঞ্জন দশক, ৯। রসরত্ন, ১০। শক্তিবাদ-রহস্য।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ইঁহার বিস্তৃত জীবনী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিতেছেন এ সংবাদ পাইয়াছি। এরূপ মনস্বীর অভাবে কেবল বঙ্গের নহে সমগ্র ভারতের সম্যক্ ক্ষতি হইল। এই সকল পণ্ডিতের জীবনী পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। সাময়িক পত্রের আলোচনা সময়ের সহিতই লুপ্ত হইবে।

ঢাকা, বিক্রমপুরনিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশক প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে, ইনি বঙ্গভাষায় সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-সমাজে বঙ্গভাষার চর্চ্চা বিরল, কিন্তু ইঁহাতে

তৎপরতা লক্ষিত হয়। ইঁহার চেষ্টায় ঢাকায় সারস্বত-সমাজ ও বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইঁহার অভাবে পূর্ব্ববঙ্গের বিশিষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

যশোহর, হরিশঙ্করপুরনিবাসী অধ্যাপক কালীপদ বসু এম্, এ মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গের বিশিষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। ইনি গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। শিশুপাঠ্য গণিত গ্রন্থ ইহার পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় সুন্দরভাবে রচিত হয় নাই।

সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক প্রাগুক্ত মহাত্মাদ্বয়ের মৃত্যুতে উত্থাপিত শোক-প্রকাশক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

৬। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের রাজসাহীতে আহূত অষ্টম অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির গঠন-সংবাদ-বিজ্ঞাপন-প্রসঙ্গে ঐ সমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর আচার্য্য মহাশয়ের পত্র পঠিত হইল।

৭। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম্, এ মহাশয়ের "রত্নপালের তাম্রশাসন" প্রবন্ধ পঠিত হইল।

এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত আহূত হইলে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, কামরূপ-শাসনাবলীর ধারাবাহিক আলোচনা দ্বারা লেখক এ সভার গৌরববৃদ্ধি করিতেছেন। আসাম-ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান প্রধানতঃ এই সকল শাসনাবলী ও আহোম রাজমুদ্রার উপরেই নির্ভর করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী ঐ সকল শাসন ও মুদ্রার লিপি উদ্ধার করিয়া এই বিষয়ে আমাদিগের প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু লিপির উদ্ধারে তাঁহাদিগের যে সকল ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়াছিল তাহার যথাযথ আলোচনা এ যাবৎ কেহ করেন নাই। আসামের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস-রচয়িতা মিঃ ই, এ, গেইট মহোদয়ের গ্রন্থ যখন বাহির হয়, তখন আমি ঐ গ্রন্থপাঠমাত্রই কামরূপের সীমা নির্দ্দেশে তাঁহার একটি বিষম ভ্রম লক্ষ্য করিয়া মল্লিখিত "কামরূপ" নিবন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। শ্রদ্ধাভাজন বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ঐ গ্রন্থের নানা ভ্রম প্রদর্শন করিয়া একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে শাসনাবলীর পাঠোদ্ধারেও ডাক্তার হর্ণলি মহোদয়ের যে যে স্থলে ভ্রম হইয়াছিল, তাহা তিনি প্রদর্শন-পূর্ব্বক আসাম ইতিহাসের বিশুদ্ধি সাধনে সহায়তা করিতেছেন। ইঁহার ঐ শ্রম সার্থক হইবে সন্দেহ নাই।

সভাপতি মহাশয় সম্পাদকের উল্লিখিত মন্তব্য সমর্থন করিয়া লেখককে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং প্রবন্ধ মুদ্রিত হইলে উহার যথাযথ সমালোচনার সময় আসিবে ব্যক্ত করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রজনী প্রায় সাত ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীশীতলাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি

দশম বর্ষ—পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

রবিবার, ১৯শে পৌষ (১৩২১) ৩রা জানুয়ারী (১৯১৫)

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত শীতলাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারসিয়ার
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় চিত্রশালাধ্যক্ষ
„ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্ এম্ এস্
„ গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত
„ কেশবলাল বসু গ্রন্থাধ্যক্ষ
„ ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট
„ পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ-ছাত্রাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ সম্পাদক
„ নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কুচবিহার ষ্টেট্
„ বৈকুণ্ঠনাথ সেন ম্যানেজার বামনডাঙ্গা বড়তরফ
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য

আলোচ্য বিষয়

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে বিনামূল্যে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতে প্রকাশিত বিবরণী প্রদানের জন্য এ সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের ব্যবস্থা। ৫। শোক প্রকাশ—(ক) এই সভার অন্যতম সদস্য ৺মধুসূদন রায় বি, এল্, (খ) সাহিত্য-সংহিতার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ, বি এল্, এফ্, আর্, জি, এস্; (গ) পাকপ্রণালী প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোক-গমনে। ৬। প্রবন্ধ—রায়সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনমোহন সেহানবীশ মহাশয়ে "স্ত্রী-শিক্ষা"। ৭। বিবিধ।

সভাপতি এবং তৎ সহকারিগণের অনুপস্থিতে শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্ব সম্মতিতে শ্রীযুক্ত শীতলা-কান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহাশয় অত্র দিবসীয় অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

নির্দ্ধারণ

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও যথারীতি গৃহীত হইল।

২। এই অধিবেশনে কোনও সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

৩। ধন্যবাদ পুরঃসর নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ, প্রণীত	যশোহর খুলনার ইতিহাস প্রথমখণ্ড
" শেখ সাহ আবদুল্লা প্রণীত	নীতি সংগ্রহ
" পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম,এ প্রণীত	সমাজসেবক পুস্তকাবলী ১ম খণ্ড বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি নিরাস
ঐ	ঐ ৩য় খণ্ড হিন্দুবিবাহ সংস্কার
" কালীচরণ সেন বি, এল্ প্রণীত	ঐ ঈশ্বরের স্বরূপ
" মৌলভী মহম্মদ আলি সাহেব প্রণীত	ইষ্টদেব, স্ত্রী স্বাধীনতা মহম্মদীলাঠী, দালায়েলে কা ফি ফি রদ্দেলা মজ-হাবি, সমছোল বারা হিন।

৪। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের প্রধান সচিবকে এ সভায় গ্রন্থাগারে বিনামূল্যে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতে প্রকাশিত বিবরণী প্রদানের নিমিত্ত এ সভা হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিতে গৃহীত হইল।

৫। নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের মৃত্যুতে এ সভা শোক প্রকাশ করিতেছেন—

(ক) এই সভায় অন্যতম সদস্য ৺মধুসূদন রায় বি, এল্ (খ) সাহিত্য-সংহিতার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও নানাগ্রন্থ রচয়িতা ৺নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল্ (গ) পাক-প্রণালী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। ইনি এই বিভাগে বঙ্গ-ভাষায় আদি গ্রন্থকার বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। (ঘ) "স্বরাজ" সম্পাদক "কর্ম্মফল" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা ৺কিশোরীমোহন রায় (ঙ) কবি গুণাকর নবীনচন্দ্র দাস ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। ইহার জীবনী প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় একটি নিবন্ধ পাঠ করিলেন—তাহার সার যথা—বিগত সোমবার প্রাতঃকালে ৬২ বৎসর বয়সে কবি গুণাকর নবীনচন্দ্র দাসের পরলোক গমনে দীনা চট্টল জননী একটি দুর্লভ রত্ন হারাইলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কবিগুণাকর, পূর্ব্ব বঙ্গের সারস্বত সমাজ কাব্যরত্নাকর এবং চট্টল ধর্ম্মমণ্ডলী বিদ্যাপতি উপাধি দান করিয়াছিলেন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, চরিত্র-বল ও অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রাণতা তাঁহাকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রদান করিয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ ভাবে ব্যুৎপন্ন অধ্যাপক Mr. Percival ও মিঃ, পি, কে, লাহিড়ী এবং কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র একই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতেন এবং পরস্পরের মধ্যে সাহিত্য চর্চ্চার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। বাল্যাবধি তিনি ইংরাজীর ন্যায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায়ও চর্চ্চা করিতেন। নবীনচন্দ্র দাস ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর এক সময়ে বিভাকর পত্রে তাঁহাদিগের কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান ও কাব্য জগতে সুরুচি ও সদ্ভাবের সঞ্চার করেন। স্বদেশপ্রাণ ভ্রাতৃযুগল চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সর্ব্ব প্রথম "শারদ" যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও "পূর্ব্ব প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। নবীনবাবু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হওয়ার পরেই শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী "পূর্ব্ব প্রতিধ্বনির" সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। উচ্চ রাজপদে

উন্নীত হইয়াও তিনি সাহিত্য-সেবা হইতে বিরত হন নাই। রঘুবংশ, শিশুপালবধ, কিরাতা-র্জ্জুনীয় প্রভৃতি তাঁহাকে কাব্য-জগতে চিরকালের জন্য অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার রাজ-ভক্তি ও গুণগ্রামে প্রীত হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ব্যবস্থাপক-সভায় সদস্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হইয়া তিনি সাধারণ পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন এবং আহার-বিহার সর্ব্ববিষয়ে অসামান্য সংযমের পরিচয় প্রদান করিতেন। তিনি অমায়িক ও বিনয়ী ছিলেন। বিগত তিন বৎসর কাল তিনি চট্টগ্রাম-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির গুরুভার বহন করিয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয় রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-সম্বন্ধে মতামত আহূত হইলে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার "শিক্ষা" নামক গ্রন্থে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান লেখকের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনায় ঐ গ্রন্থ সাহায্য করিবে ইহা আমার বিশ্বাস। লেখকের প্রবন্ধ উপাদেয় হইয়াছে এবং এতদ্বিষয়ে শিক্ষিত সমাজের চিন্তা করা আবশ্যক।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিলেন এবং স্ত্রী-শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে সকলকেই চিন্তা করিয়া প্রবন্ধ লেখার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রবন্ধ-লেখক স্ত্রী-শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিলে সভায় সাদরে তাহার আলোচনা হইতে পারে।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীহৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ
সভাপতি

দশম বর্ষ—ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

রবিবার, ২৪ মাঘ (১৩২১) ৭ ফেব্রুয়ারী (১৯১৫)

সময় অপরাহ্ণ ৫॥০ টা

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ সভাপতি

শ্রীযুক্ত কবি-সম্রাট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন
" ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট
" মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার
" যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী ডাক্তার

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ-কবিরঞ্জন
" পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
" নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কোচবিহার ষ্টেট্
" পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী
কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
" বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন-বিদ্যানিধি
(রায়কালী, বগুড়া)

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
" অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
চিত্রশালাধ্যক্ষ
" পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল্
" চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারসিয়ার
" কেশবলাল বসু
" প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য

আলোচ্য বিষয়

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—পরলোকগত ৺তারাশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয়ের সংগৃহীত ১৬ খানা প্রাচীন পুথি। ৫। প্রবন্ধ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের রচিত "বঙ্গে স্মৃতি চর্চ্চা"। ৬। রাজসাহীতে আহূত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে যোগদানার্থ প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন। ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল।

২। এই সভায় কোনও গ্রন্থ উপহৃত হয় নাই।

৩। পরলোকগত ৺তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য তর্করত্ন মহাশয়ের আলয়ে প্রাপ্ত পুথিগুলি সভায় প্রদর্শিত ও গ্রন্থাগারে সাদরে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থ গৃহীত হইল।

৪। নিম্নলিখিত সাহিত্যিকদিগের মৃত্যুতে সভা শোক-প্রকাশ করিতেছেন।
ত্রিপুরা-সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতি ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ বিদ্যাভূষণ
ঢাকা সারস্বত-পত্রের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক উমেশচন্দ্র বসু
বর্দ্ধমান দেনুড়নিবাসী নানা বৈষ্ণবগ্রন্থ-প্রণেতা অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী

৫।* রাজসাহী উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম, এ, বার-আট-ল মহাশয়ের সভাপতিত্বে বরণ-সংবাদ ঘোষিত হইল।

ঐ সম্মিলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমস্ত সদস্যকে অনুরোধ করা হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিনিধিরূপে সম্মিলনে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন—*

* যাঁহারা সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন কেবল মাত্র তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত কবিসম্রাট্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন

" অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার	শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	" হেমন্তকুমার দাসগুপ্ত
" মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
" কেশবলাল বসু	

৬। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সদস্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ড্রেণেজ ওভারসিয়ার হাওড়া মিউনিসিপালিটি ৬৪ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা	সম্পাদক	শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
" শরচ্চন্দ্র দে সদর স্কুল সবইনস্পেক্টার নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর	"	"
" ললিতকুমার নিয়োগী এম, এ, হেডমাষ্টার, কৈলাসরঞ্জন-স্কুল-রঙ্গপুর	"	"
" মৌলবী মহম্মদ নবীবকস ডিষ্ট্রীক্ট ডেপুটী ইনস্পেক্টার অব স্কুলস্—রঙ্গপুর	"	"
" যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী এল্ এম্ এস্ পাঁচবিবি, বগুড়া	"	"

৭। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "বঙ্গে স্মৃতি-চর্চ্চা" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন—

প্রবন্ধ-সম্বন্ধে মতামত আহূত হইলে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ মহাশয় বলিলেন—

মেধাতিথিকে মৈথিল বলিয়াছেন এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। পদাঙ্কদূত-রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণ বগুড়ানিবাসী। মহিমবাবু "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। কাশীরাম বাচস্পতি ও রাধামোহন গোস্বামী গোপাল ন্যায়রত্নের ছাত্র ছিলেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ওরফে উদীচ্য ভট্টাচার্য্য 'অধিকরণ কৌমুদী' প্রণেতা উত্তরবঙ্গ-নিবাসী বলিয়া আমাদের ধারণা। মধুসূদন স্মৃতিরত্ন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের বংশধর। ইঁহার নিবাস আধুনিক 'বগুড়া জেলা, প্রাচীন রঙ্গপুর জেলার মধ্যে ছিল।

প্রবন্ধ উপাদেয় হইয়াছে। আমরা ইঁহার চেষ্টায় বহু অধ্যাপকের জীবনী অবগত হইতে পারিলাম।

অনন্তর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পরে রাত্রি ৭॥০ টার সময় সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক	শ্রীহৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ সভাপতি

দশম বর্ষ—সপ্তম মাসিক অধিবেশন

রবিবার, ১৪ই চৈত্র (১৩২১) ২৮ মার্চ্চ (১৯১৫)

সময়—অপরাহ্ণ ৭৷৷০টা

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ সভাপতি

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার
" রাধারমণ মজুমদার
" হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় বি, এল্ (নায়েব বাহারবন্দ)
" ললিতকুমার নিয়োগী এম, এ,
" নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ,
" কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্,
" দীননাথ বাগ্‌ছী বি, এল্
" নগেন্দ্রনাথ সরকার ছাত্রসদস্য
" প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
" চিত্রশালাধ্যক্ষ
কেশবলাল বসু গ্রন্থাধ্যক্ষ
ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ
মৌলবী হাফেজ উল্লা
রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার
মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
চুণীলাল দত্ত ম্যানেজার তুষভাণ্ডার-ষ্টেট

শ্রীযুক্ত এককড়ি স্মৃতিতীর্থ }
" অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার } সহঃ সম্পাদক
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য

আলোচ্য বিষয়

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বক্সী জমিদার মহাশয় কর্ত্তৃক উপহৃত প্রাচীন ৪টি রৌপ্য ও ২টি তাম্রমুদ্রা (খ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক উপহৃত দিনাজপুর ঘুঘুডাঙ্গায় প্রাপ্ত প্রাচীন শিবমন্দিরের কারুকার্য্য বিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড। (গ) মাহিগঞ্জের সব-ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক উপহৃত হস্তলিখিত প্রাচীন দশখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ। ৫। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত খান্ তসলিম উদ্দীন আহাম্মদ বাহাদুর বি, এল্ রচিত "পীর, সত্যপীর, পীরবয়হক্, বড়পীর"। (খ) সাদুল্লাপুর থানার সব-ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত মুনসী মেহেরবকস্ মহাশয়ের সংগৃহীত ১১৯০ সালের রঙ্গপুর বর্দ্ধন-কুঠীর ঐতিহাসিক ঘটনা মূলক সমসাময়িক কবি কৃষ্ণহরি দাস রচিত প্রাচীন কবিতা। ৬। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিতে সভাপতি ও তৎসহকারিগণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ মহোদয় অদ্যকার সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

সদস্য	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত চুণীলাল দত্ত ম্যানেজার তুষভাণ্ডার-ষ্টেট্, রঙ্গপুর	সম্পাদক	শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল
" কালিদাস রায় বি, এ, এঃ হেড্‌মাষ্টার উলিপুর রঙ্গপুর	"	"

৩। নিম্নলিখিত গ্রন্থ উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদপুরঃসর গৃহীত হইল—

গ্রন্থের নাম	উপহারদাতৃগণের নাম
ঋণ-পরিশোধ, রাজপুত-কাহিনী	শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার সেন
বিষাদ-সিন্ধু	" মীর এব্রাহিম হোসেন
স্বাস্থ্যরক্ষা	" রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ
জীবন-চিত্র, আর্য্যকাহিনী	" বঙ্কুবিহারী ধর
আশেকে রসুল, ভাঙ্গাপ্রাণ	" মোহম্মদ দাদআলী
রাণীভবানী, বেলুনে পাঁচসপ্তাহ ৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ	" রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ,
প্রাকৃত প্রকাশ	" গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ

৪। (ক) ধন্যবাদ পুরঃসর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বক্‌সী জমীদার মহাশয়ের উপহৃত ৪টি রৌপ্য ও ২টি তাম্র মুদ্রা প্রদর্শিত ও সভার চিত্রশালায় রক্ষার নিমিত্ত গৃহীত হইল।

(খ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক উপহৃত দিনাজপুর জেলায় ঘুঘুডাঙ্গায় প্রাপ্ত শিবমন্দিরের কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড সভায় চিত্রশালার জন্য সাদরে গৃহীত হইল। (গ) মাহিগঞ্জের সব-ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন মিত্র মহাশয়ের উপহৃত দশখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি সভায় প্রদর্শিত এবং গ্রন্থাগারে রক্ষার জন্য সাদরে গৃহীত হইল। এই সকল পুথির পাঠোদ্ধারের জন্য চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয়কে অনুরোধ করা হইল। সংগ্রাহককে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপরে অর্পিত হইল।

অতঃপর রঙ্গপুর ইতিহাস-প্রণয়ন-বিভাগের সহকারী শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু মহাশয় সাদুল্লাপুর থানার সব-ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত মুন্সী মেহেরবকস সাহেবের সংগৃহীত "সত্যপীর" গ্রন্থপ্রণেতা তৎসমসাময়িক কবি কৃষ্ণহরি দাস রচিত ১১৯০ সালে রঙ্গপুর বর্দ্ধনকুঠীর ঐতিহাসিক-

ঘটনামূলক প্রাচীন কবিতা পাঠ করিলেন। এই কবিতার ভাব ও বর্ণনাচাতুর্য্যে সদস্যগণ মুগ্ধ হইলেন। পল্লীকবি কৃষ্ণহরি দাসের জন্ম রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত মহীপুর গ্রামে। এই পল্লীকবির রচিত "সত্যপীর" গ্রন্থ আজও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। রঙ্গপুর-পরিষৎ উহা সংগ্রহ করিয়াছেন ও সত্বরেই প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন, সম্পাদক মহাশয় ইহাও ব্যক্ত করিলেন।

সভার কার্য্য এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে ঝটিকা ও বৃষ্টির অচির আগমন-আশঙ্কা করিয়া সভাপতি মহাশয়ের আদেশ ক্রমে সভায় কার্য্য শেষ করিয়া সদস্যগণ স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই কারণে শ্রীযুক্ত মৌলবীখান তস্‌লিম উদ্দীন আহম্মদ বাহাদুর বি, এল্‌ মহোদয়ের "পীর, সত্যপীর, পীর বরহক, বড়পীর" প্রবন্ধটি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল এবং আগামী কোনও অধিবেশনে পঠিত হইবে এরূপ নির্দ্ধারিত হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত
সভাপতি

পরিশিষ্ট

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ হইতে পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ
কবি-সম্রাট্—শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়কে
প্রদত্ত অভিনন্দনা।

স্বস্তি শ্রীভগবৎ পদপঙ্কজ পূজনোপচিত পুণ্যপুঞ্জ পবিত্রীকৃতান্তঃকরণ নিরবধি
বিত্তাবস্থ বিশ্রাণন সমুপার্জ্জিতোর্জ্জিতযশোমরালাবলিকবলিত
বলি-দধীচিসক্থিযশোমৃণালজালদূরাগত বিদ্যার্থি-নিবহ
গীয়মানাবদাতকীর্ত্তিকলাপপণ্ডিতকুলতিলক
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়েষু কবি-সম্রাট্‌সু
সাহিত্য-পরিষদাং রঙ্গপুরাবনীভাজাং বদ্ধকরসম্পুটানাং
সসম্মান প্রণতয়ো সংস্রমজস্রং বিজ্ঞাপ্যন্তে।

যাঁহার উপহৃত **রত্নকোষ** দেববাণীর অঙ্গ-শোভার অপূর্ব্ব উপকরণ; **অন্নপূর্ণাস্তোত্র, গঙ্গাদর্শন** ভাবাবেশে ভক্তজনের পরম রমণীয় ধন, যাদবেশ্বরের **সুভদ্রাহরণের** কাব্যা-হরণচাতুর্য্য অনির্ব্বচনীয়; **অশ্রুবিন্দু, অশ্রুবিসর্জ্জন** পাষাণ হইতেও অম্বু-আকর্ষণে সক্ষম; **প্রশান্ত কুসুম** মালিকার গ্রন্থন-কৌশলে বিমুগ্ধা বাগ্‌বাদিনী **চন্দ্রদূত** মুখে নিয়ত যাঁহার অনন্য সাধারণত্বের **সংশয় নিরসন** করিতেছেন—

তাঁহার উপায়নযোগ্য বাক্যপুষ্প পরিষত্তরু পল্লবে অপ্রাপ্য।

যাঁহার তীক্ষ্ণ মনীষার অলৌকিক প্রতিভা অনন্ত অসীম শাস্ত্রাকরের গভীরতম গুহাগত অপ্রকাশিত অপ্রতর্ক্য মনীষিগণেরও দুরধিগম্য সূক্ষ্মপদার্থনিচয় লোকলোচনসমীপে স্বরূপে প্রকাশিত করিয়া পুনরপি প্রতিফলিত কিরণ-সংযোগে সংসারগৃহ-ভিত্তিবিলগ্ন কত অপূর্ব্ব নব নব আলেখ্য উদ্‌ভাসিত করিয়া যুগপৎ লৌকিক ও পারমার্থিক তত্ত্বের প্রকাশকরূপে জগৎকে বিস্মিত করিয়াছে—

সেই অনন্যসাধারণ প্রতিভার পূজার উপকরণ-সংগ্রহ এ দীন পরিষদের সাধ্য নহে। যাঁহার পণ্ডিতরাজ উপাধি নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলীর অশেষ গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক। রাজরাজেশ্বর-প্রদত্ত পদবী যাঁহাতে সার্থকতা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে; ভারতবর্ষের বুধগণ সর্ব্ববিদ্যা-নিকেতন গঙ্গোর্ম্মি-সংসেবিত অসি-বরুণার পবিত্র ক্ষেত্রে বিশ্বসম্রাটের চরণান্তিকে যাঁহাকে কবি-সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিদ্যারাজ্যের অতুল গৌরব ও মহিমা বর্দ্ধিত করিয়াছেন—

তাঁহার সেই অসাধারণ মহামহিমান্বিত গৌরবের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা ক্ষুদ্র পরিষদের পক্ষে সম্ভবাতিরিক্ত। তবে তিনি পরিষদের সভ্য, পরিষৎ তাঁহার নেতৃত্বে

পরিচালিত, তাঁহার বাক্যামৃতে পরিপুষ্ট ; পরিষদের এ গৌরব ও সৌভাগ্য সর্ব্বজন স্পৃহণীয়, তাই উত্তরবঙ্গাধিষ্ঠিত রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ স্বকীয় মহান্ ভাগ্যোদয়ের এই ক্ষুদ্র লিপি কবি সম্রাটের করকমলে উপন্যস্ত করিয়া কৃতার্থম্মন্য।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি স্বরূপে

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—সম্পাদক

১৩১১ বঙ্গাব্দ

২০শে জ্যৈষ্ঠ

বিজ্ঞাপন

বঙ্গীয় অধ্যাপক-জীবনী।

রঙ্গপুর-কালীধাম-চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নবদ্বীপ সমাজের স্মৃতিশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য অধ্যাপক-সদস্য বিবিধ মাসিকপত্রের লেখক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্র চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের অভিমত অনুসারে বঙ্গীয় পণ্ডিতগণের জীবন-চরিত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পরিষদ হইতে এই গ্রন্থ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। প্রথম খণ্ড শীঘ্রই মুদ্রণ আরম্ভ হইবে। অতএব রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের পাঠক, অনুগ্রাহক, সকলকেই জানাইতেছি, তাঁহারা যেন স্ব স্ব পরিচিত সাহিত্য-সেবী অধ্যাপকবৃন্দের জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে লিখিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট বঙ্গীয়-অধ্যাপক জীবনী কার্য্যালয়ে রঙ্গপুর কালীধাম-চতুষ্পাঠী ঠিকানায় অবিলম্বে পাঠাইয়া দেন।

১। জন্ম-মৃত্যুর সন তারিখ। ২। স্বরচিত গ্রন্থাদির বিবরণ। ৩। পিতামাতার নাম, বাসস্থান ইত্যাদি। ৪। কোন সভায় বিচার করিয়াছেন কি না? করিলে কি ফল হইয়াছে। অর্থাৎ আলোচ্য অধ্যাপকের জয় বা পরাজয় ঘটিয়াছে, এই সকল বৃত্তান্ত সংক্ষেপে লিখিয়া পাঠাইলেই যথেষ্ট হইবে। মৃত ও জীবিত উভয় অধ্যাপকের জীবনীই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার—সহকারী সম্পাদক,
রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদ।

১। যশোহর খুলনার ইতিহাস—(১ম খণ্ড—প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত। ইহাতে অতি প্রাচীন যুগ হইতে পাঠান আমলের শেষ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। ৪৬৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ৪৫ খানি হাফ্‌টোন ছবি ও ম্যাপ আছে। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৲ তিন টাকা। প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী-চাটার্জ্জি কোং ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার। ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে ও কলিকাতার অন্যান্য দোকানে প্রাপ্তব্য।

২। স্বাস্থ্যরক্ষা—ইউরোপীয়-যুদ্ধে আহত এবং রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সাহায্যের জন্য মেদিনীপুর জমিদারী কোং'র ডাক্তার শ্রীরাজেন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত। পুস্তকের সমস্ত উপস্বত্ব রিলিফ-ফণ্ডে প্রদান করিবেন। মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থকার ও গুরুদাস চ্যাটার্জ্জির নিকট প্রাপ্তব্য।

৩। বিষাদ-সিন্ধু—স্বনামখ্যাত ও সর্ব্বজনপ্রশংসিত মীর মশাররফ্ হোসেন মহম্মদ প্রণীত 'বিষাদ-সিন্ধু' উপাধি-পরীক্ষার পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালীমাত্রেরই এই পুস্তকপাঠে বিশেষ জ্ঞানোপার্জ্জন হইবে। মূল্য বাঁধাই ৩৲, কভার যোড়া ২৷৽ ডাক-ব্যয় স্বতন্ত্র। মীর ইব্রাহিম হোসেন ৩৪ নং জাননগর রোড, ইটালি।